প্রকাশক :
শ্রীরাই মোহন আচার্য্য
সি, আই, টি, বিল্ডিংস,
ব্লক নং ৩, ফ্ল্যাট নং ৩২
কলিকাতা-১০

প্রথম সংস্করণ—১১০০
শ্রীশ্রীমাতৃ জন্মোৎসব তিথি, ১৯৬০

মুদ্রাকর :
শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ চৌধুরী
দাস প্রেস
৩২, ভূপেন্দ্র বোস এভিনিউ
কলিকাতা-৪

সূচী

প্রকাশকের নিবেদন

'দেশ' পত্রিকার সম্পাদক থাকাকালীন শ্রীশ্রীগুরুদেবের এই অমূল্য প্রবন্ধাবলী ধারাবাহিকভাবে এই বইয়ের শিরোনামা নিয়ে ১৩৫৬ সালে উক্ত পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এর পর থেকে প্রবন্ধগুলিকে পুস্তকাকারে প্রকাশিত করবার জন্য অনেকদিন যাবৎ অনেকের অনুরোধে আমরা এই সংকল্পে ব্রতী হই। বিশেষ করে 'শ্রীসুদর্শনের' সম্পাদক পরম বৈষ্ণব শ্রীশিশিরকুমার ব্রহ্মচারী মহারাজ ও 'প্রবর্ত্তক' সম্পাদক ভক্ত সাধক শ্রীযুক্ত রাধারমণ চৌধুরী মহাশয়ের আগ্রহাতিশয্যই আমাদেরকে এ কাজে বিশেষভাবে উৎসাহিত করে। আমাদের গুরুভাইবোনদের সংকল্পিত এই প্রস্তাব শ্রীশ্রীগুরুদেবের নিকট উত্থাপন করা হলে, তাঁর কাছ থেকে আমরা এ সম্বন্ধে মোটেই সায় পেলাম না বরং এতে তিনি অনিচ্ছা বা আপত্তিই প্রকাশ করলেন। বললেন, কখন কি বলেছি না বলেছি তা আর প্রকাশ করে কি হবে? ও আর প্রকাশ না হওয়াই ভাল। পরে অবশ্য আমাদের একান্ত অনুরোধে এবং ব্রহ্মচারিজী ও শ্রীযুত রাধারমণদা, এর দ্বারা নাম মাহাত্ম্য প্রচারের সাহায্য হবে, এই যুক্তির অবতারণা করায় তিনি সম্মত হন এবং আমরা কাজে ব্রতী হই। মোটকথা এই বই প্রকাশের সূচনা হইতে সমাপ্তি পর্য্যন্ত ব্রহ্মচারিজীর সর্বতোময় প্রযত্ন ও রাধারমণদার সাগ্রহ তত্ত্বাবধানে বইখানি প্রকাশ করা সম্ভব হল। এই মনীষীদ্বয়ের অকুণ্ঠ সাহায্য ব্যতীত এ কাজে অগ্রসর হওয়া আমাদের সাধ্য ছিল না। এ ক্ষেত্রে শ্রীশ্রীগুরুদেবের ইচ্ছাক্রমে পূর্ব্ব প্রকাশিত প্রবন্ধগুলির কিছু পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন করা হয়েছে।

শ্রীশ্রীগুরুদেবের ধারাবাহিক জীবনী এ নয়। তাঁর জীবনের একটি মাত্র বিশেষ ঘটনাকে অবলম্বন করেই এই বইয়ের সৃষ্টি। তিনি কথা-প্রসঙ্গে নিজ জীবনের যে সব ঘটনাবলী আমাদের কাছে প্রকাশ করেন তাতে ইচ্ছা হয় প্রতিটি ঘটনাই প্রকাশ করি, সকলের সামনে তুলে ধরি। এমনই বিচিত্র তাঁর জীবন—এমনই অদ্ভুত এই মানুষটি। কিন্তু তাঁর এই সরল সুন্দর প্রকাশ-ভঙ্গিমাটি এমনই অসাধারণ যে তেমন করে প্রকাশ করার শক্তি আমাদের কই!

তাঁর মুখেই শুনি "প্রেমের দৃষ্টিতে হয় স্বরূপ. প্রকাশ"—এমন কত কথাই তাঁর মুখ থেকে যখন উচ্চারিত হয় তখন তা যেমন জীবন্ত ও সত্য হয়ে ফুটে ওঠে, সে প্রেমের দৃষ্টিই বা আমাদের কই ?

বাংলা তথা ভারতের সাধন জগতে শ্রীগুরুদেব স্বনামেই স্বপ্রকাশ। 'বঙ্কিম সেন' নামটি সর্ব্বজন পরিচিত। তাঁর সান্নিধ্যে এসে কেউ বঞ্চিত হয়েছে কিনা জানি না—এমন বহু ভাগ্যবানকে দেখেছি যিনি তাঁর কাছে একবার এসেছেন তিনিই এই দুরন্ত ভক্তের ফুটন্ত মাধুর্য্যটি বুকে করে নিয়ে গেছেন। তাঁর সম্বন্ধে পণ্ডিতপ্রবর সুসাহিত্যিক ৺খগেন্দ্র নাথ মিত্র বলতেন, "বঙ্কিম সেন Encyclopaedia of Indica." বৈষ্ণবাচার্য্য রসিকমোহন বিদ্যাভূষণ বলতেন "বঙ্কিম শ্রুতিধর"। 'পথের-পাঁচালী'র প্রথিতনামা বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন—'বঙ্কিমদা বুনো ফুল, টবের চারা নয়।'

ভগবৎ কথা-প্রসঙ্গে সর্ব্ব-শাস্ত্রের সিদ্ধান্তস্বরূপে শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণের ছন্দোবদ্ধ শ্লোকগুলি তাঁর মুখে অনর্গল উৎসারিত হয়। তাঁর ভাষা যেমন জীবন্ত তেমনি আগ্নেয়বীর্য্য বিস্তারকারী। তাঁর অনুভূতি সর্ব্বাবগাহী এবং সার্ব্বজনীন, তাঁর সংবেদন সর্ব্বাতিশায়ী। যখন দেখি, শ্রোতৃমণ্ডলী নির্ব্বাক হয়ে যায় তাঁর কথা শুনতে শুনতে, বিস্ময়ে বিমুগ্ধ দৃষ্টি তাঁদের নিমেষ-হারায় তাঁর মুখের পানে চেয়ে থেকে, তখন আমার মনে পড়ে তাঁরই কণ্ঠস্বরে শোনা সেই কথাটি—"সবাকার উপদেষ্টা বৈষ্ণব ঠাকুর, নয়নে শ্রবণে মনে বচন মধুর"—এমনই বুঝি হয় সে দৃষ্টি ভক্তের বচনের মাঝে ভগবানের আকর্ষণে। মনে ভাবি কি আছে এই মানুষটির ভিতরে, "দেখিবার কিছু নাই, তথাপি শোভন।"

সাংবাদিক হিসাবে শ্রীশ্রীগুরুদেবের যথার্থ পরিচয় অনেকের কাছেই অজ্ঞাত। তাঁর লেখার ধারা বা রচনা শৈলীর সঙ্গে যাঁরা পরিচিত তাঁরাই তাঁকে ধরতে পারেন। সে সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলবো। এদেশের সভ্যতা এবং সংস্কৃতিগত দার্শনিক বৈশিষ্ট্যের সহিত তীব্র স্বদেশ-প্রেমের প্রদীপ্তিযুক্ত তাঁর লেখাগুলি বাংলার অগ্নিযুগের স্মৃতি আমাদের অন্তরে জাগিয়ে তোলে। মনে পড়ে যায় বিপিনচন্দ্র, উপাধ্যায়, এঁদের কথা।

তাঁর লেখায় সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে তাঁর গুরু—পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের সুস্পষ্ট প্রভাবের পরিচয় পাওয়া যায়।

পুস্তকের 'প্রাক্ কথন' লিখেছেন পরম ভাগবত শ্রীদিলীপকুমার রায়। 'বৈষ্ণব চিনিতে নারে দেবের শকতি।' বৈষ্ণব যিনি তিনিই বৈষ্ণবকে চেনেন। দিলীপকুমার পরম বৈষ্ণব এবং সাধক পুরুষ। আমার গুরুদেবের পরিচয় দানে তিনিই যোগ্য অধিকারী। তাঁর মত বৈষ্ণবের কৃপা পেয়ে আমরা কৃতার্থ হয়েছি।

১৩৫৬ সালের ঘটনার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত শ্রীশ্রীগুরুদেবের সংক্ষিপ্ত কর্ম্মজীবনের কিছু কিছু ইতিহাস নীচে দেওয়া গেল। বর্ত্তমান পূর্ব্ব পাকিস্তানের ময়মনসিংহ জেলার অন্তর্গত টাঙ্গাইল মহকুমার নিকট ঘারিন্দা গ্রামে ১২৯৯ সালের ১লা পৌষ সকাল সাড়ে চারটের সময় তিনি জন্মগ্রহণ করেন। পিতা পরম ভাগবত জগচ্চন্দ্র সেন। মাতা ভক্তিমতী চন্দ্রপ্রভা দেবী। ছোটবেলা থেকে নানা দুঃখকষ্টের ভিতর দিয়ে তাঁকে চলতে হয়েছে। ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করার কয়েক মাস পরেই তাঁর পিতৃদেব ইহলোক ত্যাগ করেন। তখন থেকে সমস্ত সংসারের বোঝা তাঁর উপর পড়ে। এই অবস্থাতেই তিনি কলেজে ভর্ত্তি হন। কিন্তু আর্থিক অস্বচ্ছলতায় পড়া চালান অসাধ্য হয়। পরে তিনি যশোর জেলার অন্তর্গত মাগুরা হাইস্কুলে শিক্ষকতার কাজ করেন। এখানে শিক্ষকতা করতে এসে তাঁর কর্ম্মজগৎ শুধু স্কুলের সীমায় বাঁধা রইল না, সে ছড়িয়ে গেল তার আশে পাশের গ্রামগুলোতে; ছোট-বড় সবার ঘরে সবার প্রাণে। কেমন করে এই তরুণ যুবক জুড়ে বসল সবার মন! পীড়িতের শয্যাপাশে, মুমূর্ষুর বিদায়ক্ষণে কতবার ডাক পড়েছে এই তরুণ যুবকটির। প্রার্থনা আসে অমুকে শেষবারের মত একটিবার দেখতে চান ঐ বঙ্কিমকে। একটিবার নাম শুনতে চান তাঁর মুখে। কতবার ছুটেছেন মুমূর্ষুর আহ্বানে শেষবারের মত দর্শন দিতে। কত মুমূর্ষু শেষ নিঃশ্বাস ফেলেছে বঙ্কিমের মুখে নাম শুনে পরম স্বস্তিতে। এ সময় তিনি রোগীর সেবায় মনপ্রাণ ঢেলে দিতেন। তিনি যখন সেবায় রত থাকতেন, সে সময় নামের একটি গীতিধারা তাঁর অন্তরে অবিরামভাবে বেজে চলত। দিব্য জীবনে তাঁর এই জাগরণের সম্বন্ধে তিনি তাঁর ছেলেবেলায় লিখেছিলেন—'বংশীদূতীবিরুতিরভিতো লুম্পতিমতিমুচ্চৈঃ। প্রোচ্চন্মুদমদকল

দল দলনাৎ দুর্ব্বলোহহং' অর্থাৎ বংশীদূতীর সঙ্গীত লহরী চারিদিক থেকে ঘিরে ফেলে আমার মনকে লুফে নিচ্ছে। সেই ধ্বনি থেকে বিচ্ছুরিত উন্মাদনাময় আনন্দের দাপটে আমি দুর্ব্বল হয়ে পড়ছি। তিনি যখন কেদারপুরে শিক্ষক ছিলেন, সেই সময় তিনি স্বর্গীয় রামপ্রাণ গুপ্ত মহাশয়ের কাছে থাকতেন। গুপ্ত মহাশয়ের গৃহে অবস্থানকালে গুরুদেবের পরিদৃষ্ট একটি স্বপ্নের বিবরণ আমাদের গুরুভগ্নী শ্রীযুতা অন্নপূর্ণা দত্ত তাঁর সম্পাদিত 'ভক্তি-ভারতী' গ্রন্থে গুরুদেবের নিজের মুখের ভাষায় প্রকাশ করেছেন। এই ঘটনাটির সঙ্গে আলোচ্য গ্রন্থের সম্বন্ধ রয়েছে, এজন্য সেটি উল্লেখ করলাম। শ্রীশ্রীগুরুদেব বলেছেন, তিনি স্বপ্নে দেখেন যে তিনি হাঁসপাতালে নীত হয়েছেন। সেখানে লোহার খাটের উপর শুয়ে আছেন। তাঁর নাকে আইডোফরম বা হাঁসপাতালের কোন দ্রাবকের গন্ধ আসছিল। সাধারণতঃ হাঁসপাতালে এ রকম একটা গন্ধ পাওয়া যায়। এ অবস্থায় তিনি সচকিত হয়ে ওঠেন। পরে দেখতে পান যে তাঁর ডান পায়ে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা রয়েছে। ব্যাণ্ডেজের ওপর একটু একটু রক্তের ছোপ দেখা যাচ্ছিল। তাঁর পা কাটা গেছে তিনি বুঝতে পারেন। সঙ্গে সঙ্গে মনে একটা দারুণ অস্বস্তির ভাব জাগে। কিন্তু উদ্বেগের এ অবস্থা মাত্র কয়েক মুহূর্ত্তের জন্য; সঙ্গে সঙ্গে একটি আলোকের রেখা ঝিলিক দিয়ে ওঠে। সে আলোকে তিনি জ্যোতির্ম্ময় এক মহাপুরুষের মূর্ত্তি দেখতে পান—দেখতে পান দিব্য-মূর্ত্তির মুখ মধুর হাসিতে উজ্জ্বল। তিনি ডান হাত তুলে তাঁকে আশ্বস্ত করছিলেন। তারপরই শ্রীগুরুদেব সমস্ত অঙ্গে একটি স্নিগ্ধ শীতল স্পর্শ অনুভব করেন। এর পর তাঁর ঘুম ভেঙ্গে যায়। ঘুম ভাঙ্গবার পরও তাঁর একটা আবিষ্ট অবস্থা থাকে। দু'তিন দিন পর্য্যন্ত তাঁর এ অবস্থা ছিল। একটা শান্ত শুভ্র, স্নিগ্ধোজ্জ্বল জ্যোতির্ম্ময় পরিবেশ তিনি নিজের চারদিকে উপলব্ধি করেন।

পরে শ্রীশ্রীগুরুদেব এ বিষয়ের কথা প্রসিদ্ধ সাংবাদিক সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদারের দাদা শ্রদ্ধেয় শৌর্য্যেন্দ্রনাথ মজুমদার মহাশয়কে জানিয়েছিলেন। তিনি উত্তরে জানিয়েছিলেন যে, মহাপুরুষের স্বপ্ন কখনো মিথ্যা হয় না। দেব-স্বপ্ন সার্থক। সুতরাং ভবিষ্যৎ জীবনে এ ব্যাপার ঘটবে কিন্তু সেজন্য উদ্বেগের কোন কারণই নেই। তিনি চিঠিতে এই রকমই জানিয়েছিলেন

যে. তিনি গুরুদেবের চিঠিখানা একজন সিদ্ধ মহাত্মাকে দেখিয়েছিলেন, তিনি শ্রীশ্রীগুরুদেবের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের সম্বন্ধে আশা প্রকাশ করেছিলেন এবং আনন্দের ভাবও ব্যক্ত করেছিলেন।

শ্রীশ্রীগুরুদেব পরে কিছুদিনের জন্য রেলী ব্রাদার্সের পাটের অফিসে চাকরী নেন। এ কাজ তিনি করতে পারেন নি। মিথ্যার প্রতিবেশ এড়ানোর জন্য তাঁকে পদত্যাগপত্র দাখিল করে চলে আসতে হয়।

এরপরে তিনি 'বেঙ্গলী' অফিসে মাসিক ২০৲ টাকা বেতনে কপি-হোল্ডারের কাজে ভর্ত্তি হন। এখানেই ইংরেজী ১৯১৭ সাল থেকে তাঁর সাংবাদিক জীবনের সূচনা ঘটে। নিয়মিতভাবে তখন থেকে বাঙালীতে তাঁর লেখা বের হতে থাকে। পরে তিনি 'বাঙ্গালী' পত্রিকার সহকারী সম্পাদক নিযুক্ত হন। তিনি 'সার্ভেণ্ট' পত্রিকাতেও কাজ করেছিলেন। তারপর অধুনালুপ্ত বাংলা দৈনিক 'হিন্দুস্থান' পত্রিকার সম্পাদকতা করেন। ১৯২৬ সালে তিনি 'আনন্দবাজার' পত্রিকায় যোগ দেন। এখানেই তাঁর সাংবাদিক জীবনের সর্ব্বাঙ্গীণ বিকাশ ঘটে। ইহার মাত্র চার বছর পূর্ব্বে 'আনন্দবাজার' পত্রিকা প্রতিষ্ঠিত হয়। 'দেশ' পত্রিকা প্রবর্ত্তিত হওয়ার কয়েক মাস পর থেকেই তিনি সম্পাদক পদে বৃত হন। প্রায় এই সময় থেকেই তাঁর জীবন আধ্যাত্মিকতার একটি সুপরিস্ফুট ধারা ধ'রে এগিয়ে চলে। তখন থেকেই তিনি প্রতিদিন সকালে বাগবাজারে গোলাবাড়ীর ঘাটে ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করতে থাকেন।

১৯৪৪ সাল থেকে তাঁর সাধনার ধারা সাংবাদিকতার বাহ্যিক আবরণ ছেড়ে ভগবৎ-প্রীতির পথে সাধারণের মাঝে ছড়িয়ে পড়ে। কিন্তু তাঁর ভাবটি বরাবরই প্রচ্ছন্ন। প্রথম প্রথম তাঁর কাছে গেলে তাঁকে বুঝে ওঠা কঠিন হয়। কিন্তু কিছু সময় তাঁর সঙ্গ করতে পারলে তবে তাঁর ভিতরের ভাবটি ধরা পড়ে। আমাদের মত বিষয়ী জীবের পক্ষে তাঁর মতো প্রেমোন্মাদ সাধকের সঙ্গ করা কিছু কঠিন। আমরা বাইরের আড়ম্বরকেই বড় বলে বুঝি। কিন্তু শ্রীশ্রীগুরুদেবের কাছে এর লেশ মাত্রও পাওয়া যায় না। সাধারণ মানুষের চেয়েও অতি সাধারণ তিনি, এমনই তাঁর ভাবটি। তাই তাঁর সঙ্গ করতে গেলে প্রথমটা কেমন কেমন মনে হয়। তাঁর আত্মীয়তার সংবেদন এমনই আকস্মিক উদ্দীপ্তি পায় যে, সহজে ভিতরের ভাবটি বুঝে

ওঠা যায় না। কিন্তু সঙ্গ করলে মজতে হবেই এমনি তাঁর আত্মিকতা। সহজ-সরল একান্ত স্বাভাবিক আত্মীয়তাময় তাঁর পরিবেশের আকর্ষণ এমনই যে একবার তাঁকে ধরতে পারলে আর ছাড়া সহজ নয়। অবলীলাক্রমে গলে গিয়ে তিনি প্রতিটি মানুষের সঙ্গে মিশে যান। ছোট, বড় সকলকেই তিনি সহজভাবে আপন করে ফেলেন। গুরুদেবের সঙ্গ-প্রসঙ্গে সর্ব্ব-সম্বন্ধে তাঁর চরিত্রগত বলিষ্ঠ আত্মভাবের এই বৈভব এবং তাঁর নিজবীর্য্যের এই মাধুর্য্য বলতে হয় অনন্যসাধারণ। তাঁর বিচার করতে গিয়ে তাঁকে স্বীকার করে ফেলতে হয়। তাঁর নিন্দা করতে গিয়ে তাঁর বন্দনা-গীতি ভিতর থেকে বেজে ওঠে। প্রেম তাঁর তপ্ত, তীব্র এবং তীক্ষ্ণ। তাঁর মতবাদ আধুনিক এবং উদার। তিনি শাক্ত কি বৈষ্ণব এ বিচার করা ভার। ভগবানের যে কোন নামেই তার দেহে কম্প, অশ্রু, পুলকের সঞ্চার হয়। নামে প্রেমে মাখামাখি তার আচরণ। নাম শুনলেই তিনি পাগল হয়ে ওঠেন, তার ভাব দেখে অনেকেরই মনে হওয়া স্বাভাবিক—একি কাণ্ড! পুস্তকের আলোচ্য প্রবন্ধগুলি তাঁর সেই প্রেমের মাধুরী ও চাতুরী বিস্তার করেছে। এর পরিবেশনে আমার মত অযোগ্য ব্যক্তি অধিকার পেয়েছে। কলিপাবনাবতার মহাপ্রভুরই এ কৃপা। 'ক্বাহং জিতোস্মি গুরুণা গুরু গৌরবেন!' নমস্কার, ভূমিতে লুটিয়ে পড়ে নমস্কার করি প্রেমের ঠাকুর মহাপ্রভুকে। নমস্কার তার ভক্তজনকে—'জয়তু জগন্মঙ্গলং হরের্নাম'।

পরিশেষে এই বইয়ের চূড়ান্ত রূপদানে যাঁদের দান অপরিহার্য্য, তাঁরা হলেন আমার গুরুভ্রাতা সর্ব্বশ্রী জয় নারায়ণ কাপুর, মৃণাল রঞ্জন পোদ্দার এবং কমল কুমার সামন্ত। তাঁদের কাজ তাঁরা করেছেন, গুরুভাইবোনদের তরফ থেকে তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়েই আমি খালাস।

শ্রীগুরু চরণাশ্রিত
শ্রীরাই মোহন আচার্য্য

প্রাক্ কথন

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেন মহাশয়ের নাম আমি প্রথম শুনি আমার এক কৃষ্ণভক্ত বন্ধুর কাছে। তিনিই আমাকে বলেছিলেন সেন মহাশয়ের ট্রাম থেকে প'ড়ে গিয়ে পঙ্গু হবার কথা। পা কাটা-পড়ার ফলে পঙ্গু তো এমন অনেকেই হয়, কিন্তু এক মহাভাগ্যবান্ ভক্তই নিম্নাঙ্গে পঙ্গু হবার ফলে উর্ধ্বাঙ্গে লাভ করেন নব দৃষ্টিশক্তির পাখা। পরম ভাগবত শ্রীরামদাসের কাছে শুনেছিলাম এক অন্ধ সাধুর কথা। সাধু মন্দিরে এসে ভজন শুনছিলেন পরমানন্দে। শ্রীরামদাসের সঙ্গী ছিলেন এক ডাক্তার। তিনি সাধুর চোখ দেখে বলেন, অস্ত্রোপচার করলে তিনি দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেতে পারেন। তাতে সাধু উত্তর দেন দিব্য হাসি হেসে যে, তিনি অন্ধ হবার পরে ভিতরে এমন কিছু দেখতে পেয়েছেন যার পরে তিনি আর বাইরের দৃষ্টির কাঙাল নন। সাধু অন্ধই রইলেন—চক্ষুরত্বং পরং ধনং—এমন ধনও চাইলেন না! সনাতনের পরশমণি পাবার কাহিনীও কে না পড়েছে রবীন্দ্রনাথের "কথা ও কাহিনী"-তে? বৃন্দাবনে সনাতন তাঁর রিক্ত কুটিরে একা ব'সে ইষ্টনাম জপ করছেন এমন সময়ে এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ তাঁর পায়ে এসে ধর্ণা দিলেন: শিব স্বপ্নে তাঁকে বলেছেন:

যাও যমুনার তীর, সনাতন গোস্বামীর ধরো দুটি পায়।
তাঁরে পিতা বলি মেনো, তাঁরি হাতে আছে জেনো ধনের উপায়।

সনাতন প্রমাদ গণলেন: ধন! তিনি অকিঞ্চন বৈষ্ণব ভিক্ষাজীবী, ধনের ব্যবস্থা করবেন কোত্থেকে? ভাবতে ভাবতে হঠাৎ মনে পড়ল: বটে বটে, কিছুদিন আগে হঠাৎ নদীতীরে একটি পরশ মাণিক কুড়িয়ে পেয়েছিলেন। বললেন ব্রাহ্মণকে:

যদি কভু লাগে দানে সেই ভেবে ওইখানে পুঁতেছি বালুতে;
নিয়ে যাও হে ঠাকুর, দুঃখ তব হবে দূর ছুঁতে নাহি ছুঁতে।

ব্রাহ্মণ পরশ-মাণিক নিয়ে নিজের লোহার মাছুলিতে ছোঁওয়াতেই মাছুলি সোনা হ'য়ে গেল! তখন ব্রাহ্মণের চৈতন্য হ'ল, তিনি সনাতনের পায়ে প'ড়ে সাশ্রুনেত্রে বললেন :

"যে-ধনে হইয়া ধনী মণিরে মানো না মণি তাহারি খানিক
মাগি আমি নত শিরে"—এত বলি নদীতীরে ফেলিল মাণিক।

খুব স্পষ্ট মনে আছে আজো—প্রায় পঞ্চাশ বৎসর আগে আমার কিশোর মন কী রকম অভিভূত হয়েছিল এই কবিতাটি প'ড়ে। মনে হয়েছিল—সত্যিই কি নামজপে মানুষ এমন আনন্দের সম্পদ পায় যার পাশে স্পর্শ-মণিকেও মনে হয় নগণ্য ?

তারপর নানা সাধু সন্ত ভক্ত—সর্বশেষে ঋষিগুরু মহাকবি শ্রীঅরবিন্দের সংস্পর্শ পেয়ে—সংশয় মোচন হয়েছিল, মন মানতে আর বাধা পায়নি যে, ঠাকুরের করুণা অঘটনঘটনপটীয়সী—যার স্পর্শে বুদ্ধি যুক্তি ছেড়ে ভক্তির কাছে দরবার করে—কামনা ইন্দ্রিয়-সুখকে পাশ কাটিয়ে চলে প্রেমের সুরভিসারে : এক কথায়, মর্ত্য জীবন হয়ে ওঠে দিব্য জীবন—সঙ্গে সঙ্গে শাশ্বত পরমানন্দের স্বাদ পেয়ে ক্ষণায়ু ইন্দ্রিয়সুখকে মনে হয় বিস্বাদ।

কয়েক বৎসর আগে কলকাতায় পরম ভাগবত শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেন মহাশয়কে দর্শন করতে যাই গভীর ঔৎসুক্য তথা শ্রদ্ধা নিয়ে। গিয়ে দেখি তিনি কাটা পা নিয়ে একটি ছেঁড়া মাদুরে ব'সে। ইন্দিরা ও আমাকে বসিয়ে তিনি কথার পর কথা ব'লে চললেন উজিয়ে উঠে—সে কী নির্বারিত আনন্দ-উচ্ছ্বাস—যার বাদী সুর ছিল ধর্মের বাণী, ভক্তির সুধাঝংকার! তিনি একটি প্রশ্নও করলেন না আমাদের—শুধু উচ্ছ্বসিত আবেগে নানা উপমায়, উৎপ্রেক্ষায়, কথিকায় আনন্দ-জ্ঞাপন যে, ভক্তের দেখা পেলেন! আমি মনে মনে তাঁকে প্রণাম ক'রে মুখে শুধু বললাম : "ভক্ত নই, তবে ভক্তিকামী বটে—তাই আশীর্বাদ করুন যেন সার্থক ভক্ত হ'তে পারি—আপনার মতন।"

সেন মহাশয় তখন একটি বাণী দিলেন। একদা কোনো এক সাধু তাঁর দু তিনটি শিষ্যকে পাঠিয়েছিলেন তাঁর কাছে। সেন মহাশয়ের উচ্ছ্বসিত নানা কথা শুনে তারা তাঁর ভাব ধরতে না পেরে ফিরে গিয়ে তাদের গুরুকে বলে : "কার কাছে পাঠিয়েছিলেন আমাদের ? বদ্ধ পাগল!" সেন মহাশয় আমাকে বলেছিলেন যে একথা শুনে তিনি উল্লসিত হ'য়ে ঠাকুরকে নিবেদন

করেছিলেন: "এইই তো চাই ঠাকুর! লোকের কাছে যেন আমার ভক্ত নাম না রটে—কে জানে কোন্‌ ছলে অভিমান উঁকি দেবে 'আমি ভক্ত' ব'লে? 'পাগল' এই উপাধিই আমার মঞ্জুর কোরো বাঞ্ছাকল্পতরু!"

পিতৃদেবের একটি গান মনে পড়ে গিয়েছিল:

পাগলকে যে পাগল ভাবে
(এখন) সে পাগল কি ঐ পাগল পাগল
একদিন সেটা বোঝা যাবে।
নয় কে পাগল ভুবন 'পরে?
কেউ বা পাগল মানের তরে,
কেউ বা পাগল রূপের লাগি',
কেউ বা পাগল ধনলোভে।
নিমাই সন্ন্যাসী ছিল জ্ঞানের পাগল হ'য়ে শুনি,
জ্ঞানের পাগল হ'য়ে বুদ্ধ রাজ্য ছেড়ে হ'ল মুনি।
ব্রহ্মা পাগল ধ্যান করি',
পরের জন্যে পাগল হরি,
ভাবে পাগল শ্মশান ভূমে
বেড়ায় ভোলা উদাসভাবে।

সেন মহাশয় এই সূত্রে আর একটি কথা বলেছিলেন: যে, প্রতিষ্ঠা হ'ল শূকরী বিষ্ঠা। সব ছেড়েছুড়ে ফকির হ'লেও মানুষের মনের কোণে ঘুপ্‌টি মেরে লুকিয়ে থাকে প্রতিষ্ঠার রকমারি সূক্ষ্ম কামনা। ঠিক এই কথাই শ্রীরমণ মহর্ষির শ্রীমুখেও শুনেছিলাম ষোলো বৎসর পূর্বে তাঁর আশ্রমে। মহর্ষি বলেছিলেন: "এক খাঁটি শেঠপুত্র ধনজন প্রাসাদ স্ত্রীপুত্র ছেড়ে গভীর অরণ্যে একটি কুটিয়াতে দীর্ঘকাল সাধনা করেন। একদা সেখানে তাঁর এক সংসারী বন্ধু শিকার করতে এসে তাঁকে ধ্যানস্থ দেখে মুগ্ধ হ'য়ে অপেক্ষা করেন। সাধকের ধ্যান ভাঙলে বন্ধু তাঁকে প্রণাম করে উচ্ছ্বসিত হ'য়ে বলেন: 'আহা ভাই, কত দুঃখই না তুমি বরণ করেছ ঠাকুরের জন্যে! ধন্য তুমি!' শুনে মৌনী ত্যাগী মুখে কিছু বললেন না বটে, কিন্তু মনে মনে একটু খুসি হয়েছিলেন" ব'লে মহর্ষি আমার দিকে চেয়ে মৃদু হেসে বললেন: "ভগবান্‌ পাবার তার দেরি আছে এখনো।"

সেন মহাশয় তাঁর ভক্তিপূত জীবনে উপলব্ধি করেছেন একটি 'লাখ' কথার এক কথা—যা কৃষ্ণ বলেছিলেন রুক্মিণীকে—ভাগবতে :

নিষ্কিঞ্চনা বয়ং শশ্বৎ নিষ্কিঞ্চনজনপ্রিয়াঃ।

তস্মাৎ প্রায়েন ন হ্যাঢ্যা মাং ভজন্তি সুমধ্যমে!

অর্থাৎ

কিছুই নাই আমার—দীন অকিঞ্চনই শুধু আমারে চায়।

ধনী ও মানী সহজে রাণী, তাই আমার আসে না কাছে হায়!

সেন মহাশয় তাঁর একনিষ্ঠ সাধক জীবনে এই কথাটিকে গভীরভাবে উপলব্ধি করেছেন—মারাঠী সাধুশিরোমণি তুকারামের ম'ত। শিবাজি তাঁর "অভঙ্গ" কীর্তন শুনে মুগ্ধ হ'য়ে তাঁর কুটিরে এসে যখন তাঁকে ভেট দিতে চেয়েছিলেন তখন তুকারাম গাইলেন তাঁর একটি বিখ্যাত অভঙ্গ : "তুমচেঁ য়ের বিত্ত ধন তেঁ মজ মৃত্তীকে সমান"—অর্থাৎ টাকা মাটি মাটি টাকা। অপিচঃ "মান দম্ভ চেষ্টা হেঁ তো শূকরাচী বিষ্ঠা"—একেবারে সেন মহাশয়ের উপলব্ধ মংবাণী। যে-সাধু সত্যিই ঠাকুরের কাছ থেকে পেয়েছেন অপরূপ মণির মণি প্রেমকৌস্তুভ—তাঁর কাছে কি আর কোনো মণি মান পেতে পারে? তুকারামও তাই শিবাজির কাছে গেয়েছিলেন একটি অভঙ্গে :

ছত্র দীপ বাজী চাহি না মহারাজ
ধনমানের নহি প্রার্থী আমি।
আমার বরণীয় শুধু শ্রীনাথ আজ,
দিয়েছি তাঁরি পায়ে প্রাণ প্রণামী।

অবিকল সেন মহাশয়ের প্রাণের কথা। তিনি ঠাকুরের কাছ থেকে যে-প্রেমরস পেয়েছেন তার পাশে যশমান ধনজন প্রতিষ্ঠা তাঁর কাছে সত্যিই হয়ে গেছে শূকরী বিষ্ঠা। তাইতো এই আশ্চর্য ভক্তটি একটি ছোট্ট ঘরে দিনের পর দিন গদিয়ান হয়ে আছেন ছেঁড়া মাদুরে—যে আনন্দাসনের পরম মহিমার পাশে জাঁকালো ময়ূর-সিংহাসনও মনে হয় ছায়ার ছায়া।

তাঁকে প্রণাম ক'রে উঠে, বাইরে বেরিয়ে আসতেই ইন্দিরা উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলল: সে দেখেছে তাঁর হৃদয়ে কৃষ্ণ আসীন! এর পর আর কী বলবার থাকতে পারে? যে-প্রেমের ভক্তির টানে তিনি সাক্ষাৎ ঠাকুরকে টেনে এনেছেন—পেয়েছেন তাঁর প্রাণমন্দিরে নিত্য-অতিথি-রূপে, সে-রূপামণির পাশে পরশমণি? ধনমান প্রতিষ্ঠা? পরম ভক্তের কাছে শুধু রাজারাজড়ার নয় ধনীমানী গুণীজ্ঞানীর মূল্যায়নও হয় শুধু এক নিক্তিতে—তাঁরা ভগবানের কত কাছে পৌঁছেছেন।

প্রহ্লাদ বলেছিলেন হিরণ্যকশিপুকে:

তৎকর্ম যন্ন বন্ধায় সা বিদ্যা যা বিমুক্তয়ে।
আয়াসায়াপরং কর্ম বিদ্যান্যা শিল্পনৈপুণম্॥

বিষ্ণুপু: ১।১৯।৪১

অর্থাৎ

সে-ই কর্ম গাঁথে না যে নিত্যনব বন্ধনের পাশ,
সে-ই বিদ্যা মুক্তিপথে যে আলোর দিশারি ধরায়,
আর সব কর্ম—শুধু আয়াসের ক্ষণিক বিলাস,
আর সব বিদ্যা—শুধু শিল্পের নিপুণ কীর্তি হায়!

সেন মহাশয় এই কথাটিই নানাভাবে ফলিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বলেছেন তাঁর "জীবন-মৃত্যুর সন্ধিস্থলে"-র নানা আত্ম-আবিষ্কারে—সরল ভাবোচ্ছ্বাসে অঢেল অমূল্য উপলব্ধিরই ছবি এঁকেছেন সহজ স্মৃতিচারণ ভঙ্গিতে—মনোজ্ঞ তুলিতে। সে ছবিগুলির মধ্যে প্রায়ই ফুটে উঠেছে তাঁর এই মহৎ উপলব্ধি—ভাগবতের ভাষায়—"ময়ি ভক্তির্হি ভূতানাম্ অমৃতত্বায় কল্পতে"—অর্থাৎ ভগবানে ভক্তি হ'লেই জীব অমৃত হয়। কিন্তু না, আরো একটু জুড়ে দিতে হবে: "জীবন মৃত্যুর সন্ধিস্থলে"-র ছত্রে ছত্রে সেন-মহাশয় ফলিয়ে তুলেছেন যে-অমৃতলাভের সার্থকতার বাণী—তার মধ্যে শুধু ভক্তির সুধা-ঝংকারই নয় সেই সঙ্গে মেলে ভক্তিডুবুরির জালে আহৃত ভগবানের নানা মণিরত্ন—নানা ঔপনিষদিক সত্যের অম্লান আভা যার আলোয় কাটে মনের কালি, প্রাণের গ্লানি। তাই মনে হয় "জীবন মৃত্যুর সন্ধিস্থলে"-র নানা

ভাবধারায় অবগাহন ক'রে বহু সন্ধানী ভক্ত, অমৃতের সাধক ও আনন্দের প্রেমপথিক শুধু যে স্নিগ্ধ হবেন তাই নয়, তাঁর প্রেমলব্ধ জ্ঞানের নানা দিশারই পাবেন পাথের পাথেয়। এককথায়, যাঁরা স্বধর্মে জিজ্ঞাসু তাঁরা সেন মহাশয়ের নানা অনুভূতি ও মৃত্যুঞ্জয়নের নির্দেশপথে দেখতে পাবেন —ভক্তির অঞ্জনে ভক্তের চোখে জীবন কী রঙে ফুটে ওঠে; তাঁর নানা আনন্দানুভূতির ঝংকারে শুনতে পাবেন—ঠাকুরের সেই ঘরছাড়া বাঁশির মূর্ছনা যার ডাকে প্রেমের হুরভিসারী সব ছেড়ে ধায় তাঁর রাঙা পায়ে শরণ নিতে; সর্বোপরি, কিছুটা স্বাদ পাবেন সেন মহাশয়ের সেই অপরূপ উপলব্ধির—যার প্রসাদে তাঁর কাটা পা-র যন্ত্রণাও রূপান্তরিত হয়েছিল প্রেমের পরমানন্দে। গঙ্গাপূজা গঙ্গাজলে—তাঁরই উক্তি উদ্ধৃত ক'রে তাঁর বন্দনা শেষ করি (জীবন-মৃত্যুর সন্ধিস্থলে, ৪৭ পৃষ্ঠা) :

"প্রেমের যে-পথ সে-পথে আঘাতে আঘাতে অন্তর-রস উপচাইয়া উঠিয়া থাকে—আঘাত আপ্যায়নের রকমফের হইয়া দাঁড়ায়।"

পিতৃদেবের একটি কীর্তনগানে আছে: "সে কে? মধুর দাসত্ব যার, লীলাময় কারাগার, শৃঙ্খল নূপুর হ'য়ে বাজে!" এ-মধুর দাসত্বে-র দীক্ষাদাতা কেবল একটি গুরু—প্রেম, শুধু সেই পারে ঘটাতে এ-অঘটন, নিশার বুক চিরে উষার পথ কাটতে, রুদ্রের শূলাঘাতে তাঁর দক্ষিণ মুখের আশীর্বাদ বহন ক'রে আনতে। তাই তো অঙ্গহানির মাধ্যমেই ভক্ত পায় পরম বাণীর চিরাশ্বাস—রাজপথে ট্রামের নিচে প'ড়ে পা কাটা পড়ার মুহূর্তে (১৫ পৃষ্ঠা) :

"বিদ্যুতের ঝলকে পলকের মধ্যে অখণ্ড ভগবৎপ্রেমের মাধুর্য সেদিন আমার মনের উপর দিয়া খেলিয়া গিয়াছিল।...ঘর বাড়ী আমি সব ভুলিয়া গেলাম। আত্মীয় স্বজনের কথা আমার মনেই হয় নাই। আনন্দের এমন ব্যাপ্তিশীল স্বাচ্ছন্দ্যে আমার সব ভয় ভাঙিয়া গেল।"...

এর পরে আরো চমৎকার বর্ণনা আছে (১২১ পৃষ্ঠা) :

"ভয় নাই, ভয় নাই এইরূপ ধ্বনি দূর হইতে অস্ফুট ভাষায় শোনা যাইতেছিল। সেই সঙ্গে পদধ্বনি ও চন্দ্রালোকের ছন্দে ছন্দে আমার মনের মূলে স্নিগ্ধ রসের কোমল এবং উজ্জ্বল প্রভাবে স্পর্শ করিতেছিল।..

চারিদিকে নাম শুনিতে পাইলাম এবং শ্রুতির মূলে ইষ্টতত্ত্ব প্রমূর্ত্ত হইয়া উঠিল। রাজপথ জুড়িয়া নামই নরনারীর ভিতর দিয়া পরিস্ফূর্ত্ত হইতেছে, যেদিকে তাকাই নাম।…

"একজন ভুজাওয়ালী মা জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিয়াছিলেন—বাবা, ভগবান তোমাকে রক্ষা করিয়াছেন। বলিলাম, মা রক্ষা করিয়া তাঁহার উপায় আছে কি? এমন কোন্ জায়গা আছে যেখানে আমার রক্ষার দায় তাঁহার উপর নাই? তাঁহার কৃপারই জয় দাও মা। তাঁহার নাম গাও। সেই নাম আমাকে শুনাও। দুঃখ করিবার কিছুই নাই। প্রেমময় দেবতার কৃপার সুধাধারা আমার জীবনকে ছাপাইয়া ফেলিতেছে, আমাকে ভাসাইয়া দিতেছে প্রেমের মাধুরী। আমার জীবনের সকল দৈন্য আজ দূর হইল। আমি ধন্য হইলাম। আমার কাটা পাখানা হাতে তুলিয়া লইয়া আমি কৌতূহলের সঙ্গে দেখিতে লাগিলাম। মনে হইল যে একটা খেলা, আর কিছুই নয়। আমার পা কাটিয়াছে—এ বোধ একটুও নাই। একবার মনে হইল এ কি আমারই পা? ভিতর হইতে কাহার মৃদু মধুর হাসি আমার চিত্তকে উদ্ভাসিত করিল। কে বলিল, এতে তোমার কি? গঙ্গার ধারে কেহ মাটি কাটিলে তোমার ক্ষতিবৃদ্ধি কোথায়? সত্যই তো, এ তো কেবল কৃপারই আস্বাদন, সর্ব্বাত্ম-স্বপন—লীলারই স্ফূরণ। আমাকে লইয়া প্রেমের দেবতারই খেলা। আমার প্রাণ, আমার দেহ এ তো তাঁহারই দান। সব দানই তাঁহার প্রাণময়। প্রেমের সম্বন্ধ ছাড়া তাঁহার দান নাই। ভক্তের সঙ্গে সম্বন্ধের সুযোগ একবার লাভ হইলে ভক্ত-প্রিয় দেবতার প্রাণময় সব দানে চিদানন্দের ছন্দই ফুটিয়া উঠে; দেহের অভিমান তখন আর থাকে না। ভক্ত-প্রসাদজ ভাবের এমনই শক্তি এবং বৈষ্ণবাপরাধ না থাকিলে এই ভাব প্রেমে পরিস্ফূর্ত্তি লাভ করে। ভগবান্ নিজে আসিয়া জীবকে সংসার-সাগর হইতে উদ্ধার করিয়া লন। ব্যক্তভাবে ভগবৎ-সাধনার ইহাই রহস্য। ভক্তি-সাধনার পথেই জীব সাক্ষাৎ-সম্পর্কে ভগবানের শ্রীবিগ্রহের প্রেম-প্রভাবিত এমন ব্যক্তভাবের প্রভাব উপলব্ধি করিতে পারে। শ্রবণ-কীর্ত্তন অর্থাৎ নাম-সাধনাই কলিযুগে ভক্তিলাভের একমাত্র উপায়।"

প্রার্থনা করি সেন মহাশয় যেন তাঁর ধন্য জীবনের পুণ্য স্পর্শে বহু অধন্যকে নামসাধনায় দীক্ষা দিয়ে এ-নাস্তিক্যের যুগে আস্তিক্যের পরম বাণী

ঝংকারিত ক'রে তুলতে পারেন তাঁর ভক্তি প্রেমের কীর্তন মাধুর্যে—যে অমৃতমধুর স্বাদ পেতে না পেতে জীবনে মানুষ সব কামনা বাসনার নাগপাশ থেকে মুক্তি পায় চিরকালের জন্যে, বলতে পারে প্রাণোপলব্ধ দীপ্ত আনন্দের নিত্য সাক্ষ্যে (অধ্যাত্ম রামায়ণ) :

ন কাংক্ষে বিজয়ং রাম ! ন চ দার সুখাদিকম্।
ভক্তিমেব সদা কাংক্ষে ত্বয়ি বন্ধবিমোচনীম্॥

চাই না হে দেব, জয় গৌরব সংসারসুখ এ-বসুধায়,
সববন্ধনমুক্তিদাত্রী ভক্তিই সদা এ-প্রাণ চায়।

ইতি—
শ্রীদিলীপ কুমার রায়
হরিকৃষ্ণ মন্দির
পুনা ৫

১৩৫৬ সালের ৫ই আষাঢ় ট্রাম হইতে নামিতে গিয়া আমি গুরুতররূপে আহত হই। মেডিকেল কলেজের প্রিন্স-অব-ওয়েলস্ হাসপাতালে লইয়া যাইবার পর আমার ডান পায়ের গোড়ালির উপর পর্য্যন্ত কাটিয়া ফেলিতে হয়। আহত হইয়া হাসপাতালে যাইবার পর হইতে আমার সাহস, ধৈর্য্য এবং মনের বলের সম্বন্ধে আমি অনেক কিছুই শুনিয়াছি। প্রকৃতপক্ষে আমার নিজের সম্বন্ধে আমি যাহা জানি, অন্যে তাহা জানেন না, এবং জানা সম্ভবও নয়; তথাপি যাঁহারা আমার সম্বন্ধে ঐসব কথা বলিয়াছেন—তাঁহাদের উক্তি একেবারে মূল্যহীন বলিবার সাহসও আমার নাই। ডাঃ ইন্দ্রনারায়ণ সেনগুপ্ত বর্ষীয়ান্, কৃতবিদ্য এবং নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি। বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে তাঁহার ত্যাগ এবং দুঃখবরণ অসামান্য। আমি আহত হইবার ৭।৮ মিনিটের মধ্যে তিনি ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন এবং 'আনন্দবাজারের' বিশিষ্ট সহকর্ম্মীদের সঙ্গে অস্ত্রোপচার পর্য্যন্ত তিনি আমার পার্শ্বে ছিলেন। বস্তুতঃ অস্ত্রোপচারের সম্মতি-পত্রে তিনি প্রথম স্বাক্ষর করেন। তারপর অস্ত্রোপচার-কক্ষের ভিতর আমার স্বাক্ষর গৃহীত হয়। ডাক্তার প্রভাতচন্দ্র সান্ন্যালের সহৃদয় অনুকম্পায় এবং চিকিৎসার নৈপুণ্যে আমার জীবন রক্ষা পায়। ডাক্তার সান্ন্যাল অস্ত্রোপচারের সময় নিজে দাঁড়াইয়া থাকিয়া সব বিষয়ে লক্ষ্য রাখিয়াছিলেন। রেসিডেণ্ট-সার্জ্জেন ডাক্তার মুরারিমোহন মুখোপাধ্যায় আমাকে অস্ত্রোপচার করেন। মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষ আমার অগ্রজপ্রতিম শ্রদ্ধাবান্ ডাক্তার দীনেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের স্নেহ ও সমাদর, সিনিয়র হাউস্-সার্জ্জেন শ্রীযুক্ত ভবানীচরণ ঘোষের অকৃত্রিম আত্মীয়তা এবং চরিত্র-মাধুর্য্য, হাউস-সার্জ্জেন শ্রীযুক্ত সরোজ নিয়োগীর সাদর শুশ্রূষা, এবং যত্ন, ওয়ার্ড-মাষ্টার শ্রীযুক্ত কমলাপতি ঘোষ মহাশয়ের সহৃদয়তা এবং সেবার ভাবে সতত উদ্দীপ্ত কর্ত্তব্য-পরায়ণতা আমি জীবনে কখনই ভুলিতে পারিব না। শিক্ষায়, দীক্ষায় এবং সাধনায় ইঁহারা প্রত্যেকেই বাংলাদেশের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি। ইঁহাদের কথার কোন মূল্য নাই, ইহা কেমন করিয়া বলিতে পারি? তবে এইটুকু আমার পক্ষে বলা সম্ভব যে, তাঁহারা আমার ভিতর যে সব গুণ লক্ষ্য করিয়াছেন, প্রকৃতপক্ষে সে সব গুণের জন্য আমার গর্ব্ব করিবার কিছুই নাই।

সত্য কথা বলিতে কি, আমি অত্যন্ত ভীরু এবং দুর্ব্বল প্রকৃতির লোক। দীর্ঘ দিন হৃদ্‌রোগে আমি ক্ষীণজীবী। ইহার উপর স্নায়বিক অবসাদ আমাকে একরকম আড়ষ্ট করিয়া রাখিয়াছে। ভয় আমার এত বেশী যে, সময় সময় আমি নিজেই সে কথা চিন্তা করিয়া লজ্জা পাই। আমার এই উক্তির ভিতরে বিনয় কিছুই নাই। কবিরাজ বিমলানন্দ তর্কতীর্থ মহাশয় সুদীর্ঘ চারি বৎসর কাল আমার চিকিৎসা করেন, সে প্রায় ১৫।১৬ বৎসরের কথা। তাঁহার যত্নে এবং অসাধারণ চিকিৎসা-নৈপুণ্যে সে যাত্রায় আমি রক্ষা পাই। ভয় আমার কত বেশী কবিরাজ মহাশয় সে সম্বন্ধে সাক্ষ্য দিতে পারিবেন। বহরমপুর-নিবাসী অবসরপ্রাপ্ত সিভিল সার্জ্জন অম্বিকাচরণ দত্তগুপ্ত মহাশয় একবার আমাকে রোগশয্যা হইতে একরকম টানিয়া বাহিরে লইয়া আসেন। তাঁহার চেষ্টা না হইলে আমি সম্ভবতঃ মাথা তুলিতেই সাহস পাইতাম না। অম্বিকাবাবু জীবিত থাকিলে আমার এই অসামান্য মানসিক দুর্ব্বলতার কথা তিনিও বলিতে পারিতেন।

এইরূপ ভয় এবং দুর্ব্বলতা সত্ত্বেও আমি যদি কিছু সাহসের কাজ করিয়া থাকি, তবে আবেগের বশেই তাহা অনেকটা করিয়াছি। প্রকৃতপক্ষে প্রাণের এই আবেগ ভাঙ্গিয়া অনেক দিন চলিয়াছি। যখন আমার কর্ম্মজীবন আরম্ভ হয় তখন এইভাবে চলা অনেকটা সম্ভবও হইত। সাংবাদিকতা তখনকার দিনে আজকালকার মত মুখ্যতঃ বৃত্তিকরী ছিল না। স্বদেশ-সেবাই সাংবাদিকতায় প্রাপ্য ছিল এবং এই স্বদেশ-সেবাকেই আমরা তখনকার দিনের সাংবাদিকেরা ভগবানের সেবা বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলাম। এই সেবার ভিতরে যে যাহার সামর্থ্যমত নিজের নিজের শক্তি নিঃশেষ করিয়া দিয়া আমরা আনন্দ বোধ করিয়াছি। বাস্তবিক পক্ষে প্রতিদিনের কাজ শেষ করিয়া আসিবার পর যদি শ্রান্তিতে একেবারে অবসন্ন হইয়া না পড়িতাম, তবে কেমন যেন একটা অস্বস্তি বোধ হইত; মনে হইত কতই যেন অপরাধ করিয়াছি।

এইরূপ আবেগ কর্ম্মে ঐকান্তিকতা আনিয়া দিয়াছে। কিন্তু সেই ঐকান্তিকতায় জীবনে অভয়ত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় না বলিয়াই আমার বিশ্বাস। কারণ ঐকান্তিকতার বশে সাময়িকভাবে স্বার্থচিন্তা ভুলিয়া গেলেও পরে তাহা দেখা দেয়। আদর্শের আনুগত্যের পরিবর্ত্তে নিজের কৃতিত্বের হিসাবটি চোখের

কাছে জাগিয়া থাকে ; সুতরাং মনে উদ্বেগ আসে, হৃদয়ে দুর্ব্বলতা জাগে। মানসিক বলের উদার প্রতিবেশের অভাবে জীবনের সর্ব্বাঙ্গীণ উন্মেষ ঘটে না।

স্বদেশসেবা এবং স্বদেশপ্রেমের পথে জীবনে কেহ অভয়ত্ব লাভ করিতে পারেন নাই, এমন কথা বলিব না। বাঙলার স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাস মৃত্যুঞ্জয়ী বীরদের আত্মদানের মহিমায় উজ্জ্বল হইয়া রহিয়াছে। মৃত্যু-দণ্ডাদেশ লাভ করিবার পর কানাইলালের ওজন বাড়িয়াছিল ইহা অনেকেই শুনিয়াছেন। বাঙলা দেশের এইরূপ একজন মৃত্যুঞ্জয়ী সন্তানকে দেখিবার সৌভাগ্য আমারও হইয়াছিল। অসহযোগ আন্দোলন সম্পর্কে আমি যখন জেলে ছিলাম, দীনেশ গুপ্ত মৃত্যু-দণ্ডাদেশ প্রাপ্ত হইয়া তখন কারাগারে গমন করেন। আমরা দ্বিতলে যেখানে থাকিতাম, তথা হইতে তাঁহার কক্ষ দেখা যাইত। মৃত্যু-দণ্ডাদেশ লাভ করিবার পর বাঙলার এই বীর সন্তানের মুখের হাসি সমধিক উজ্জ্বল হইয়া উঠে এবং তাঁহার সমগ্র দেহে একটা অপূর্ব্ব লাবণ্য লক্ষিত হইতে থাকে। মৃত্যুকে ইঁহারা জয় করিয়াছেন, এই কথা বলা যায়। আচার্য্য অশ্বঘোষ বলিয়াছেন,—"ন মৃত্যোঃ সমং ভয়ং পৃথিব্যাং"।

রামায়ণে দেখিতে পাই, শ্রীরামচন্দ্র ভরতকে বলিতেছেন—ফল পাকিলে যেমন তাহার পক্ষে পতনের অপেক্ষা আর কোন ভয় নাই, মানুষের পক্ষে ঠিক সেইরূপ ; মৃত্যুর চেয়ে বড় ভয় আর কিছুই নাই। কোন কোন ক্ষেত্রে নাম, যশ এবং প্রতিষ্ঠার একটা সাময়িক উত্তেজনায় মরণের ভয়কে ফাঁকি দিয়া ফেলিবার চেষ্টা চলিতে পারে ; কিন্তু মনের অবচেতন-স্তরে ভয় গিয়া দানা বাঁধে এবং দুর্ব্বলতা মনকে অবসন্ন করিয়া ফেলে। মন একেবারে দমিয়া যায়। যুক্তি-বুদ্ধির দ্বারা তাহা চাঙ্গা করিয়া তোলা সম্ভব হয় না। শ্রীমদ্ভাগবতে দেখিতে পাই, ঋষভদেব মনোধর্ম্মের বিশ্লেষণ করিয়া বলিতেছেন—

"পরাভবস্তাবদবোধজাতো
যাবন্ন জিজ্ঞাসত আত্মতত্ত্বম্।
যাবৎ ক্রিয়াস্তাবদিদং মনো বৈ
কর্ম্মাত্মকং যেন শরীরবন্ধঃ॥"

'যে পর্য্যন্ত আত্মজ্ঞান লাভ না হইবে, অর্থাৎ জীবনে প্রেম ও মৈত্রীর পরিপূর্ণ প্রতিষ্ঠা না ঘটিবে, সে পর্য্যন্ত মনের পরাভব ঘটিবেই। পারিপার্শ্বিক অবস্থায় মন দমিয়া যাইবেই।'

স্বদেশসেবার পথে উজ্জ্বল অভয়ত্বের যাঁহারা অধিকারী হইয়াছেন, এই মর্ত্ত্যজীবনের নিত্য সত্যের সঙ্গে যুক্ত হইয়া যাঁহারা অমৃতত্বের সন্ধান লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা আমাদের নমস্য। ফলতঃ রাজনৈতিকতা এখানে আধ্যাত্মিকতায় পরিপূর্ণতা লাভ করে, হিংসা, বিদ্বেষ অতিক্রম করিয়া সাধকের জীবনে প্রেমের পরম মহিমার উন্মেষ হয়।

প্রেমের মাধুরী এবং চাতুরীতে সাধক যন্ত্রের মত চালিত হইয়া থাকেন। তিনি অভীষ্টের পায়ে নিজেকে অঞ্জলি দিয়া কৃতার্থতা লাভ করেন। বাহিরের বিচারে সর্ব্বাত্ম-মাধুর্য্য ইঁহাদের জীবনে পরিস্ফূর্ত্ত দেখা না গেলেও ইঁহারা অন্তঃসুখী এবং অন্তরালোকে ইঁহারা উন্নত জীবনে অধিষ্ঠিত হইয়া থাকেন। সংসার ছাড়িয়া এবং বাহিরে বৈরাগ্যোচিত বেশ অবলম্বন করিয়া এই অবস্থা লাভ করা সহজ নয়। ভাগবত বলিয়াছেন—

"ভয়ং প্রমত্তস্য বনেষ্বপি স্যাৎ
যতঃ স আস্তে সহষট্‌সপত্নঃ।
জিতেন্দ্রিয়স্যাত্মরতের্ব্বুধস্য
গৃহাশ্রমঃ কিং নু করোত্যবদ্যম্।"

এই অবস্থার একটা বিপরীত দিকও আছে। যাঁহারা যুদ্ধে গিয়াছিলেন এমন সব সৈনিকের অনেকের মনের বল, অদ্ভুত সাহস এবং সহিষ্ণুতার কথা আমরা শুনিতে পাই; কিন্তু এ বস্তু নিতান্তই বাহিরের। এগুলির মধ্যে প্রকৃত মানসিক বলের পরিচয় কিছুই নাই। হিংসা-বিদ্বেষের আলোড়নে এবং যুদ্ধের প্রতিবেশের উত্তেজনায় ইঁহাদের মনোবুদ্ধি অভিভূত হইয়া পড়ে। এই অবস্থায় মনের সম্প্রসারণ ঘটিতে পারে না। পক্ষান্তরে মন অন্ধ আবেগে আচ্ছন্ন হয়। তাহার ফলে উদার আনন্দের ছন্দে উন্নত জীবনের স্পর্শ পাওয়া সম্ভব হয় না। ইহা অন্ধকার, আলোকের অবস্থা ইহা নয়।

আমার সাংবাদিক জীবনে স্বদেশপ্রেমের প্রেরণায় খুব উন্নত স্তরে আমি পৌঁছিতে পারি নাই। উত্তেজনার পথে অন্ধতার আড়ম্বরে না পড়িলেও উদার আলোকের স্পর্শ আমি পাই নাই; সুতরাং মরণের ভয় এবং তৎসম্পর্কিত দৈহিক স্বার্থের চিন্তা সব সময়েই আমার মন এবং বুদ্ধিকে আড়ষ্ট করিয়া রাখিয়াছে। শুধু প্রাণের একটা আবেগ ছিল এবং সে বস্তু এখনও

আছে। প্রকৃতপক্ষে দুর্ঘটনার দিন আমি যখন অফিসে যাইবার জন্য বাহির হই, এমন একটা আবেগই আমার মনের ভিতর ছিল। চন্দননগরের গণভোটের ফল ঐদিন সকাল বেলাকার কাগজে প্রকাশিত হয়। বলা বাহুল্য, ভারত-রাষ্ট্রে যোগদানের পক্ষে চন্দননগর একরকম অবিসংবাদিত ভাবেই অভিমত জ্ঞাপন করে। ভোটের ফল যে এরূপ হইবে আমি পূর্ব্বেই তাহা অনুমান করিয়া লইয়াছিলাম এবং সেই অনুসারে কাগজে কিছু লেখাও দিয়াছিলাম। ভোটের ফল প্রকাশিত হইবার পর স্বভাবতঃই আমার আনন্দ হয়। আমার লেখাটি ভাল করিয়া দেখিবার এবং প্রয়োজন হইলে কিছু কিছু পরিবর্ত্তন করিয়া দিবার জন্য আমার মনে প্রবল একটা আগ্রহ জাগে। এই আগ্রহ আমার অন্তর জুড়িয়া ছিল। অফিসের কাছে ট্রাম হইতে নামিতে গিয়া আমি ট্রামের নীচে পড়িয়া গেলাম।

কিন্তু বিস্ময়ের বিষয় এই যে, ট্রামের নীচে পড়িয়া গেলেও এতটা ব্যাপার যে ঘটিয়া গেল আমি তাহা ভাল করিয়া বুঝিতে পারি নাই। আমার ডান পা'খানার পাতার প্রায় মধ্যভাগের উপর দিয়া ট্রামের চাকা গড়াইয়া যায়। এই অবস্থায় ট্রামের গতিবেগে আমি কিছুদূর পর্য্যন্ত নীত হই। ইহার পর দুই হাতে পিছনের দিকে ভর করিয়া আমি লাইনের ধারে বসিয়া পড়িলাম। একটি ভুজাওয়ালী মা কাঁদিতে কাঁদিতে আমাকে কোলে জড়াইয়া ধরেন এবং দুঃখ করিতে থাকেন। আমি তাঁহাকে সান্ত্বনা দান করি। পা'খানা তখনও ট্রামের নীচে পড়িয়া আছে। কিন্তু এতবড় একটা আঘাতে বিশেষ ব্যথা অনুভব করিলাম না। কেহ যেন জোরে পা'খানি একটু টিপিয়া দিয়াছে, বড় জোর এইটুকু মনে হইল।

ট্রামের গতিবেগ তখন থামিয়া গিয়াছে। যাত্রীরা কেহ কেহ নামিয়া আমার নিকট আসিলেন।

সকলের মুখে প্রশ্ন সেই একই ধরনের—কেমন করিয়া পড়িলেন? ট্রামে উঠিতেছিলেন, কি নামিতেছিলেন, কোথায় যাইতেছিলেন ইত্যাদি। এইরূপ প্রশ্নকারীদের মধ্যে বাঙ্গালী খুবই কম, অধিকাংশই হিন্দুস্থানী অথচ ট্রামখানা বাঙ্গালী আরোহীতেই ভর্ত্তি ছিল। আমি তাঁহাদের আগ্রহের নিবৃত্তি করিয়া বলিলাম, সে সব কথা পরে হইবে, আগে আপনারা সকলে ট্রাম হইতে নামুন এবং ট্রামটা অপর দিকে ঠেলিয়া কাৎ করুন; আমি পা'খানা টানিয়া বাহির

করিয়া লই। তাঁহারা আমার অনুরোধ রক্ষা করিলেন। আমি পা'খানা বাহির করিয়া আনিলাম। হাত দিয়া দেখিলাম পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলের নীচুর দিক হইতে কনিষ্ঠাঙ্গুলীর শেষ দিক পর্য্যন্ত কাটিয়া ফাঁক হইয়া গিয়াছে। পায়ের পাতার মোটা হাড়খানা কেহ যেন করাত দিয়া কাটিয়া দিয়াছে। এসব সত্ত্বেও আমার দুর্ব্বলতা বোধ ছিল না কিংবা গুরুতর কোন উদ্বেগও আমার মনে জন্মে নাই। মনে হয়, পাঁচ ছয় মিনিটের মধ্যে এই ব্যাপার ঘটিয়া যায়। ইহার পর আমি একজন ভদ্রলোককে ১নং বর্ম্মণ ষ্ট্রীটে আনন্দবাজার অফিসে খবর দিতে বলি। আমার সহকর্ম্মীরা এই সংবাদ পাইয়া ছুটিয়া আসেন। পা'খানা চাকার নীচে পড়িয়া কাটিয়া গেল, তবুও আমি গুরুতর ব্যথা অনুভব করিলাম না, কিংবা এতবড় একটা বিপর্য্যয়ে প্রচুর রক্তপাতে এবং সমগ্র দক্ষিণ অঙ্গ ক্ষত-বিক্ষত হওয়াতেও অবসন্ন হইয়া পড়িলাম না, ইহাতে তাঁহারা বিস্মিত হইলেন। শুধু অপরের কাছেই ইহা বিস্ময়ের বিষয় নয়, আমার নিজের কাছেও ইহা বিস্ময়েরই বস্তু। যোগের একটা শক্তি আছে আমি জানি। যোগ-প্রক্রিয়ার সাহায্যে শরীরের অংশ বিশেষ হইতে মনকে সরাইয়া লইয়া যাওয়া যায়। এই অবস্থায় শরীরের যে অংশ হইতে মনকে সরাইয়া লওয়া হয়, তাহাতে ব্যথা বা যাতনার কোন অনুভব থাকে না। এইরূপ যৌগিক ক্ষমতা-সম্পন্ন পুরুষ এদেশে কেহ কেহ ছিলেন এবং এখনও হয়ত আছেন। আমি নিজেও এই রকম দুই একজন পুরুষকে দেখিয়াছি। কিন্তু জীবনে আমি কোন-দিন তেমন যোগ প্রক্রিয়ার চর্চ্চা করি নাই; করিলেও আমার পক্ষে এক্ষেত্রে তাহা প্রয়োগ করা সম্ভব হইত বলিয়া মনে হয় না। কারণ সঙ্কল্পের প্রভাবের দ্বারাই এইরূপ যৌগিক প্রক্রিয়া নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে। মনকে স্থির করিয়া পরে সরাইয়া আনিতে হয়, কিন্তু আমার পক্ষে ব্যাপারটি আকস্মিকভাবে ঘটে। সুতরাং সঙ্কল্পের প্রভাবে মনকে নিয়ন্ত্রিত করার অবসর সে ক্ষেত্রে ছিল না। যাঁহারা জড়-বিজ্ঞানকে বড় বলিয়া বোঝেন, তাঁহারা কেহ কেহ হয়ত বলিবেন, প্রবল আঘাতে আমার দেহের স্নায়ুতন্তুগুলি অসাড় হইয়া পড়িয়াছিল, সেইজন্যই আমি ব্যথা অনুভব করি নাই। কিন্তু এ ক্ষেত্রেও বিবেচ্য বিষয় দাঁড়ায় যে, স্নায়ুতন্তুজালকে অতিক্রম না করিয়া আঘাত আসিতে পারে নাই। আঘাত যখন আসিয়াছিল তখন স্নায়ুতন্তুর উপরে তাহার বেদনামূলক প্রতি-ক্রিয়া হইবে ইহাই স্বাভাবিক। শুধু তাহাই নয়, স্নায়ুতন্তুগুলি অভিভূত হইয়া

পড়াতে বেদনার তীব্রতা অনুভব না হইলেও মনের চাঞ্চল্য না ঘটিবার কোনই কারণ নাই। প্রকৃত পক্ষে মনের ক্রিয়াই এ ক্ষেত্রে মুখ্য। মন এমনই বস্তু যে, তাহার ঘাঁটি একবার যদি নড়িয়া উঠে,তবে সহজে তাহাকে সামলাইয়া লওয়া যায় না। সে যদি একবার বেয়াড়া হয় তবে যুক্তি-বুদ্ধির গোঁজামিলেও তাহার সহিত সখ্য স্থাপন করিয়া কাজ হাসিল করা সম্ভব নয়। ট্রামের চাকার তলে পড়িয়া যাহার পা' কাটিয়া দুইখানা হইয়া গিয়াছে, সে ব্যক্তি সেই অবস্থায় মনকে চাঙ্গা করিয়া তুলিয়া বীরত্ব দেখাইতে বসিবে, ইহা উপহাসেরই কথা। বাস্তবিক পক্ষে আমি তেমন কোন মহাব্রতে ব্রতী ছিলাম না; সুতরাং বাহবা পাইবার সুযোগ লুফিয়া লইবার অভিপ্রায়ও আমার জাগে নাই। আবার এমন কথাও শুনিয়াছি যে, অস্ত্রোপচার করিবার সময আমাকে ক্লোরোফর্ম্ম্ প্রয়োগ করিতে হয় নাই, এ কথা সত্য নয়। সাধারণ লোকের মতই আমাকেও সংজ্ঞাহীন করা হয়। কিন্তু সব সময়ই অপূর্ব্ব আনন্দের একটি প্রতিবেশ আমি অন্তরে বাহিরে উপলব্ধি করিয়াছি। সে আনন্দ অনির্ব্বচনীয়। এত বড় একটা ঘা খাইযাও আমার মন যে অনেকটা স্থির ছিল, তাহাতে বোঝা যায় মনের মূলে কোন শক্তি নিশ্চয় কাজ করিয়াছে। মন সেই শক্তির আশ্রয় পাইয়াই চঞ্চল হইয়া পড়ে নাই। এই শক্তির স্বরূপ কি, সোজাসুজি বলিতে সত্যই সঙ্কোচ বোধ করিতেছি।

ভারতবর্ষের একটি বিশিষ্ট সম্পদ আছে; বাল্যকাল হইতে এই কথা শুনিতে পাই। আন্তর্জ্জাতিকতার এই যুগে ভারতের সেই বিশিষ্ট সম্পদের কথা উত্থাপন করিলে আপত্তি উঠিবে কিনা জানি না; কিন্তু এ বিষয়ে আমার নিজের কোন ঝুঁকি নাই। আমি দেবতাদের কথাই উদ্ধৃত করিতেছি, এই আন্তর্জ্জাতিকতা-বিরোধী মত প্রচারে যদি কাহারও আপত্তি থাকে,তিনি তেত্রিশ কোটি দেবতাদের সঙ্গে গিয়া বোঝাপড়া করুন। ভাগবতে দেখিতে পাই দেবতারা গাহিতেছেন—

"অহো বতৈষাং কিমকারি শোভনং,
প্রসন্ন এষাং স্বিদুত স্বয়ং হরিঃ।

যৈর্জন্ম লব্ধং নৃষু ভারতাজিরে,
মুকুন্দসেবৌপয়িকং স্পৃহা হি নঃ ।"
"কল্পায়ুষাং স্থানজয়াৎ পুনর্ভবাৎ,
ক্ষণায়ুষাং ভারতভূজয়ো বরঃ ॥
ক্ষণেন মর্ত্ত্যেন কৃতং মনস্বিনঃ,
সংন্যস্য সংযান্ত্যভয়ং পদং হরেঃ ॥"

দেবতারা বলিতেছেন—"যাঁহারা এই ভারত-ভূমিতে মনুষ্যজন্ম লাভ করিয়াছেন তাঁহারা ধন্য, কারণ তাঁহারা ভগবানের সেবার অনুকূল ইন্দ্রিয়সমূহ পাইয়াছেন। আমরা দেবতা হইলেও আমাদের সে সুবিধা নাই। আমরা যদি ভারতবর্ষে মানুষ হইয়া জন্মিতে পারিতাম, তবে কৃতার্থ হইতাম। আমাদের দুঃখ থাকিত না।"

"যাহারা স্বল্পায়ু লইয়া ভারতভূমিতে জন্ম গ্রহণ করে, ব্রহ্মাদি দীর্ঘায়ু দেবগণের অপেক্ষাও তাহারা সৌভাগ্যশালী। কারণ ভারতের লোকেরা তাহাদের স্বল্পায়ুর মধ্যেই নিজেদের কর্ম্মের ফল ভগবানে সমর্পণ করিয়া অভয়ত্ব লাভ করিতে সমর্থ হয়।"

ভারতভূমির এ বিশিষ্টতার কথা বহুদিন হইতে শুনিলেও তৎপ্রতি জীবনে বিশেষ আগ্রহ জন্মে নাই। ভারতের অধ্যাত্ম-বিদ্যা অনুশীলন করিবার মত অবসরও কোনদিন লাভ করিতে পারি নাই। তবে শুনিয়াছি, অজামিল কোন সাধন-ভজন না করিয়াই মৃত্যুর মহাভয় অতিক্রম করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। যমদূতেরা দাসীপতি অজামিলকে যমদ্বারে লইয়া যাইতে আসিলে বিষ্ণুদূতগণ তাঁহাদিগকে বাধা দান করেন। বিষ্ণুদূতেরা ধর্ম্মের গূঢ়তত্ত্ব ব্যাখ্যা করিয়া বলেন—

"পতিতঃ স্খলিতঃ ভগ্নঃ সংদষ্টস্তপ্ত আহতোঃ।
হরিরিত্যবশেনাহ পুমান্ নার্হতি যাতনাঃ ॥"

অর্থাৎ "হে যমদূতগণ! উচ্চ গৃহাদি হইতে পতিত অথবা যাইতে যাইতে স্খলিত; কিংবা ভগ্ন-গাত্র অথবা সর্পাদি কর্ত্তৃক দষ্ট, কিংবা জ্বরাদি রোগে সন্তপ্ত অথবা দণ্ডাদি দ্বারা আহত হইয়া অবশভাবেও যদি কোন ব্যক্তি 'হরি' এই শব্দ উচ্চারণ করে, তবে সে কখনও কোন যাতনা ভোগ করে না।"

অজামিল সুকৃতিশালী পুরুষ ছিলেন। তাঁহার দেহ, লীলা-দেহ। অর্জ্জুনকে যে কৌশলটি শিক্ষা দিতে স্বয়ং ভগবানকে অষ্টাদশ অধ্যায় গীতা আওড়াইতে হইল, অজামিল মৃত্যুভয়ের এক ঝাঁকুনিতেই তাহা পাকা করিয়া ধরিয়া ফেলিলেন। তিনি ভিতরে ভিতরে অনুচিন্তার সূত্রে ভগবৎ-প্রেম কোন বিশেষ ভাবে আহরণ করিয়াছিলেন, তাই মৃত্যুকালে তাঁহার মুখে ভগবানের নামের ব্যাহরণ ঘটে। প্রকৃতপক্ষে ব্যাহৃতির মূলে ছিল অনুস্মৃতি। মহাভয়ের মধ্যে ভগবানের নাম উচ্চারণ করা সকলের সাধ্য নয়। অজামিলের পক্ষে যাহা সম্ভব হইয়াছিল, সাধারণ বদ্ধ জীবের পক্ষে তাহা সুদূরপরাহত; সুতরাং ট্রামের চাকার তলে যখন আমার পা'খানা পড়িয়া যায়, তখন আমি ভগবানের নাম উচ্চারণ করি নাই। অতি ঘোর সংসারের মায়ায় জড়িত আমার যে তেমন সুকৃতি নাই, ইহা বলাই বাহুল্য; তবু একটা আশ্চর্য্য ব্যাপার, আমি ভগবানের নাম উচ্চারণ না করিলেও বহুমুখে মধুরকণ্ঠে উচ্চারিত হরি নাম সুস্পষ্টভাবে শুনিতে পাই। মেঘমন্দ্রে মিশ্রিত অবিরল জলদলকলরোলে সে ধ্বনি আমার শ্রবণে ঝঙ্কৃত হইতেছিল; শুধু শোনাই নয়, শ্রবণের সঙ্গে অপূর্ব্ব দর্শন লাভও আমার পক্ষে ঘটে। ফলতঃ সেই অবস্থায় আমি অন্তরে বাহিরে যাহা উপলব্ধি করিয়াছিলাম তাহা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। কিন্তু তবুও আমাকে সে কথা বলিতে হইতেছে। আমার কথা যাঁহার যেমন খুশী বিশ্বাস করুন বা না করুন, তাহাতে আমার কিছু আসিয়া যায় না। আমি বলিয়াই খালাস। ব্যাপারটা যাহা ঘটে, তাহা এই।

ট্রাম হইতে পড়িয়া যাইবার পর দেখিতে পাই, চারিদিকে যেন একটা জ্যোতির তরঙ্গ খেলিতেছে; হঠাৎ অপূর্ব্ব আলোক চতুর্দ্দিকে ঝকমক করিয়া উঠিল এবং সেই আলোকের স্পর্শে আমার দেহ, মন যেন গোটা একটা পদ্মফুলের মত দল মেলিয়া দিল। জ্যোতিঃ আমি পূর্ব্বেও দেখিয়াছি, আমার প্রথম যৌবনে যোগ-সিদ্ধ একজন শক্তিশালিনী সাধিকার সহিত সাক্ষাৎ করিবার সৌভাগ্য ঘটে। তিনি আমাকে জ্যোতিঃ প্রদর্শন করান। বর্ষীয়সী সাধিকা আমার কর্ণে কয়েকটি মন্ত্র দিবার সঙ্গে সঙ্গে আমি দেখিতে পাই, আমার চোখের সামনে চক্রাকারে অপূর্ব্ব একটা জ্যোতিঃ বিস্তার লাভ করিয়াছে। এই জ্যোতিঃ দর্শনে

আমার একটু বিস্ময়ই শুধু বোধ হইয়াছিল ; কিন্তু আমি সন্তুষ্ট হইতে পারি নাই। আমি সাধিকাকে বলিয়াছিলাম, একি, ইহা ত এখন আছে তখন নাই, এমন বস্তু।

"ঈক্ষতে বিভ্রমমিদং মনসো বিলাসং
যদ্দৃষ্টং অনিষ্টং অতিলোলং অলাতচক্রং ॥"

অলাতচক্রের মতই ইহা ক্ষণস্থায়ী। ইহা দেখিলেই বা আমার কি লাভ ? কোথায় সে রূপ—"উদার-লীলা-হসিতেক্ষণোল্লসৎ ভ্রূভঙ্গ-সংসূচিত ভূর্য্যানুগ্রহং ?" কোথায় সেই উদার লীলা ভ্রূভঙ্গীতে সংসূচিত সেই ভূরি অনুগ্রহ ? কোথায় ?—

"হাসং হরের্বনতাখিল-লোক তাপ
শোকাশ্রু-সাগর বিশোষনং অত্যুদারং
সম্মোহনায় রচিতং নিজমায়য়াস্য-
ভ্রূযুগলং মুনিকৃতে মকরধ্বজস্য।"

কোথায় সে হাসি ? কোথায় সে লীলা—"আঁখি ঠারে মূরছিত কোটি ফুলধনু ?"

সাধিকা আমার কথা শুনিয়া মৃদুহাস্য করিলেন, বলিলেন, আছে বাবা, ইহাতেও আছে, কিন্তু এ পথ তোমার নয়। এইদিন যাহা দেখিলাম, ইহা সেরূপ জ্যোতিঃ নয়। এ জ্যোতিঃ নৈর্ব্যক্তিক নহে। ইহাতে বর্ণে,গন্ধে ছন্দোময় বিগ্রহ মূর্ত্তির অভিব্যক্তি ছিল। জ্যোতিঃ দেখিবার সঙ্গে সঙ্গে চারিদিকে মধুর ধ্বনি শুনিতে পাইলাম। যতদূর দৃষ্টি যায়, দেখিলাম সকলেই ভগবানের নাম-কীর্ত্তন করিতেছে। সেই স্বর ভাবের লহর তুলিয়া অপূর্ব্ব মাধুরী সঞ্চার করিতেছে। এক সঙ্গে যেন ভয় নাই, ভয় নাই, এইরূপ শব্দের ঝঙ্কার চারিদিক হইতে ভাসিয়া আসিতেছিল। জয় জয়, এইরূপ ধ্বনি মধুর ছন্দে হিন্দোল তুলিতেছিল। সেই স্বরের লহরে, ভাবের প্লাবনে আমার মনোবুদ্ধি এবং অহঙ্কার ভাসিয়া গেল—আমি ডুবিলাম। সে রূপের সাগরে ডুবিয়া গিয়া আমার দেহ-বুদ্ধি বিলীন হইয়া গেল। মনে হইল, আমার এই যে দেহ, ইহা আমার নয় ; রূপ, রস, বর্ণে, গন্ধে সেই অপরূপ ছন্দোময় লীলার সঙ্গেই আমার দেহ-মন-বুদ্ধি সম্বন্ধযুক্ত হইয়াছে। সে সম্বন্ধের ভিত্তিভূমিতে দাঁড়াইয়া আমার এখানকার দেহের ব্যাপারগুলি যেন খেলার মত মনে হইতেছিল। মজা মন্দ নয়। আমার দেহ লইয়া কেহ খেলিতেছে

এবং আমি সে খেলা দেখিতেছি। বাহিরের জগতের সম্বন্ধে এই সময় আমার কোন অনুভূতি ছিল না, কিন্তু বাহিরের আলো একেবারে নিভিয়া গিয়াছিল, এমন কথাও বলিতে পারি না। বাহিরের জগৎ তখনও ছিল; কিন্তু জড় দেহের সংস্পর্শে আমি সাধারণতঃ বাহিরের জগৎ যেমন দেখি তেমন ছিল না। মনে হইতেছিল ভিতরে যে শক্তি খেলিতেছে, বাহিরে তাহারই লীলা চলিতেছে, এবং দুইয়ের মধ্যে অব্যবহিত একত্ব, কোন ফাঁক নাই। অন্তরের উৎসারিত সেই উদার লীলারধারা মনের মূলকে স্পর্শ করিয়া আমাকে সর্ব্বভাবে আপ্যায়িত করিতেছিল। বাহিরে আমার দেহ লইয়া যাঁহারা ব্যস্ত ছিলেন, তাঁহাদের স্পর্শেও আমি সেইএকান্ত আপ্যায়নই অনুভব করিলাম। ভিতরের হাসি, বাহিরের সেবা উভয়ের মধ্যে কোন ব্যবধানই বিশেষ করিয়া বুঝিয়া উঠিতে পারি নাই। আনন্দ-লীলার অদ্বয় এই অভিব্যক্তি আমার দেহ, মনকে অখণ্ডসত্তায় আবিষ্ট করিয়া ফেলিয়াছিল এবং সেই আবেশেই আমি দেহের যন্ত্রণা ভুলিয়া যাই। মনস্তত্ত্বের দিক হইতে আমার এই কথাগুলির মূল্য কি দাঁড়াইবে জানি না। মনোবিকলন-বিদগণের কেহ কেহ হয় তো এমন সিদ্ধান্ত করিবেন যে, আমি যাহা কিছু দেখিয়াছি, তাহা সব স্বপ্ন, তবে আমার এই স্বপ্ন নিদ্রিত অবস্থার স্বপ্ন নহে, জাগ্রত অবস্থায় আমি এই স্বপ্ন দেখিয়াছি। সাধারণতঃ আমরা জাগ্রত অবস্থায় যে সব চিন্তা করি এবং আমাদের মনের মূলে যে সব বাসনা অপূর্ণ থাকিয়া যায় সেগুলি মনের অবচেতন স্তরে থাকিয়া অব্যক্তভাবে কাজ করে। নিদ্রিত অবস্থায় বহির্বিষয়গত ইন্দ্রিয়ের সম্পর্ক যখন শিথিল হইয়া পড়ে, বিচারের বেড়া আর থাকে না তখন অব্যক্ত বাসনাগুলি স্বপ্নের আকারে সাড়া দেয়। জাগ্রত অবস্থায় আমি এরূপ স্বপ্নই দেখিয়াছি। দীর্ঘদিন হইতে মনের অবচেতন স্তরে যেসব চিন্তা বা ধারণা দানা বাঁধিয়া উঠিতেছিল, আকস্মিক আঘাতে ইন্দ্রিয়বৃত্তিগুলির সতর্কতা শিথিল হইয়া পড়াতে কল্পনার সেই পাখীগুলি খাঁচা খুলিয়া ডানা মেলিয়া বাহির হয়। যাঁহাদের এইরূপ অভিমত, তাঁহাদের সঙ্গে আমার কোন বিরোধ নাই, কিন্তু আমি শুধু এই কথাই বলিব যে, হোক্ স্বপ্ন—যে স্বপ্নে মানুষ তাহার জীবনের একান্ত বাস্তব দুঃখকে বিস্মৃত হইতে পারে, তাহার বাস্তবতা একেবারেই নাই ইহা, কেমন করিয়া বলিব? যে স্বপ্নে মানুষ মরণের ভয় ভুলিয়া যায় এবং মৃত্যুর মহাভীতির মধ্যে যে স্বপ্ন অন্তরে একান্ত আশ্বস্তির সঞ্চার করে, যে স্বপ্নে মনের উদার

প্রতিবেশের উন্মেষে দ্বন্দ্ব-সংঘাতপূর্ণ জগতে অভয়ত্ব এবং অমৃতত্ব এই দুইয়ের মিলন সংসাধিত হয়, সে স্বপ্ন, স্বপ্ন হইলেও সার্থক এবং সাধনার বস্তু। এই মনস্তত্ত্বের বিচার প্রসঙ্গে আরো একটি বিষয় বিবেচ্য হইয়া পড়ে। আমরা যেসব বিষয় দেখি বা শুনি, দৃষ্ট-শ্রুত সেই সব বিষয়ের গুণসমূহ জড়। আমাদের অন্তরে ভাবের সঞ্চার-সামর্থ জড় সেই বস্তুগুলির নাই। সেগুলি নিজেরা কাজ করিতে পারে না। দুর্দ্দিনের অন্ধকারে পরমাত্মীয়তার স্পর্শে কে সেগুলিকে বিত্তস্বরূপে পরিণত করিয়া আমাদের চিত্তকে দৃপ্ত করিয়া তোলে, বিক্ষিপ্ত ভাবে বিভিন্ন সময়ে দৃষ্ট, শ্রুত, চিন্তিত, অনুধ্যাত বিষয়সমূহ হইতে ভাবের সম্পদরাজি আহরণ করিয়া স্মৃতির স্বর্ণসূত্রে কে এত আদর করিয়া মালা গাঁথে এবং দেহ-মন-বুদ্ধির প্রবল বিপর্য্যয়ের মুখে সেই মালাখানি আমাদের কণ্ঠে পরাইয়া কে আমাদিগকে বিজয়ীর সম্মান দেয়? অপূর্ণ কামনা, বাসনার আঘাতে আঘাতে ব্যর্থতার বিপুল বিড়ম্বনায় আমাদের অন্তরে অনুদিন যে বেদনা সঞ্চারিত হইতেছে, তাহার রঙে তুলি ডুবাইয়া কে এমন আদরে উজ্জ্বল ছবি আঁকে, যাঁহার ছটায় প্রাণের শুষ্ক নদীতে জোয়ার ছোটে?

জয় হোক্ তাঁহার, সেই জীবনদেবতার। বন্দনা করি তাঁহাকে।

মনের ভিতর লুকিয়ে ছিলে

জানি, আমার কথা কতকটা কাহিনীর মত শুনাইবে। তবু প্রাণান্তকর বিপর্য্যয়ের মধ্যে পড়িয়া আমি যাহা অনুভব করিয়াছিলাম, আমি সহজভাবে সেই কথা বলিবার জন্য চেষ্টা করিতেছি। আমার কথাগুলি সিদ্ধান্ত-স্বরূপে গৃহীত হইবে না, ইহা স্বাভাবিক। কারণ সাধন-ভজন আমার জীবনে কিছুই নাই, সুতরাং সুধীজন আমার অজ্ঞতা বিবেচনা করিয়া আমাকে ক্ষমা করিবেন। গুরু-বৈষ্ণবের কৃপায় পড়িয়া আমাকে এসব কথা বলিতে হইতেছে, যদি কাহারও উপকার হয়।

ট্রামের তলায় পড়িয়া আমার পা কাটা যাওয়াতে আমার প্রচুর রক্তপাত হয়, কিন্তু আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি ইহাতে আমি সংজ্ঞাহীন হই নাই। খুঁটি-নাটি বিষয়ের সম্বন্ধেও আমার জ্ঞান সুস্পষ্ট ছিল। আমার মনে আছে, আমি গুরুতররূপে আহত হইয়াছি, এই খবর পাইয়া 'আনন্দবাজার পত্রিকা' অফিস হইতে আমার সহকর্ম্মিগণ যখন ছুটিয়া আসিয়া

আমাকে ধরিয়া হাসপাতালে লইয়া যাইবার জন্য চেষ্টা করিতেছিলেন, তখন ট্রামের চাকার নীচ হইতে আমি আমার ধুতিখানা খুব সাবধানে বাহির করিয়া লইয়াছিলাম। নক্সা পাড়টি যাহাতে না ছিঁড়িয়া যায় সেদিকে আমার প্রখর দৃষ্টি ছিল। আমাকে যখন ধরাধরি ক'রিয়া গাড়ীতে তোলা হইতেছিল, তখন আমি তাঁহাদিগকে আমার ডান পায়ের একখানা জুতা পড়িয়া রহিল বলিয়া জানাই এবং সেখানা কুড়াইয়া আনিতে অনুরোধ করি; অথচ আমার এই ডান পা-ই কাটা গিয়াছিল। এই সব ঘটনার কথা বিবেচনা করিলে ইহাই মনে হয় যে, আমার মনের ক্রিয়া তখনও বিলুপ্ত হয় নাই, কিন্তু সে মনে সাধারণ বুদ্ধির ক্রিয়া সচেতনভাবে জাগে নাই বা ছিল না।

মনের দুর্ব্বলতার জন্যই যে এমনটি ঘটিয়াছিল, তাহাও বলিতে পারি না; কারণ মনের দুর্ব্বলতার মধ্যেও বুদ্ধির ক্রিয়া থাকে। ঐ অবস্থায় আমার ভয় হইবার কথা; কিন্তু ভয় আমার একটুও হয় নাই। পক্ষান্তরে অপূর্ব্ব একটা আনন্দই আমি অনুভব করিতেছিলাম। আমার ধারণা এই যে, ঐ সময় আমার বুদ্ধির উপর অতীন্দ্রিয় একটি শক্তি ক্রিয়া করিতেছিল এবং আমার জড় মনের ধারা ধরিয়া নামিয়া আসিয়া সেই শক্তি ইন্দ্রিয় সম্বন্ধে দেহকে উজ্জীবিত রাখিয়াছিল। জড় মন বুদ্ধির ঘাঁটি পর্য্যন্ত উঠিতে সমর্থ হয় নাই। সেই শক্তির প্রভাবে জড় বিচারগত দৈন্য কিংবা দুর্ব্বলতা আমাকে আচ্ছন্ন করিতে পারে নাই। মনের বহির্ম্মুখীন বিশ্লেষণাত্মক বৃত্তিসমূহ, সেই শক্তির জ্যোতির সংশ্লেষে উদ্ভাসিত হইয়া আমার অন্তরে যে মধুর খেলা খেলিতেছিল, তাহার প্রভাবে অভাব বা অপচয়ের কোন প্রশ্ন আমার মনে জাগিবার অবসরই পায় নাই।

দুর্ঘটনাটি ঘটিবার সঙ্গে সঙ্গে মনের মূলে বিপুল একটা আবর্ত্ত উঠে এবং সেই আলোড়নের ভিতর দিয়া অপূর্ব্ব একটা জ্যোতির উন্মেষ হয়। আমি সে কথা পূর্ব্বে বলিবার চেষ্টা করিয়াছি। এবার তাহা আরও একটু ভাঙ্গিয়া বলিব। কিন্তু তৎপূর্ব্বে এ কথাটা বলিয়া রাখা প্রয়োজন যে, এদেশের মনীষীগণ পঞ্চাত্মক জীবকোষের যেসব কথা বলিয়া থাকেন, সে সম্বন্ধে জীবনে আমার কোনরূপ অনুশীলন ছিল না। অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময় এবং আনন্দময় কোষের কথাই শুধু আমি শুনিয়াছি। শ্রীভগবানের নামের মহিমায় ডুবিয়া আচার্য্যবান্ অবস্থায় উন্নীত হইলে পঞ্চাত্মক এই জীবকোষের সব অবীর্য্য দূর হয়। কাঠে কাঠে সংঘর্ষ-সঞ্জাত আগুন যেমন কাষ্ঠকে দগ্ধ করে,

সেইরূপ আচার্য্যের কৃপার অগ্নিময় উদ্দাম আলোড়নে জীবের কর্ম্মবন্ধন দগ্ধ হইয়া যায়। শ্রীমদ্ভাগবতের এই সব উক্তির শুধু আক্ষরিক পাঠই আমার কিছু ছিল, কিন্তু তত্ত্বানুধাবন আমার বিন্দুমাত্রও হয় নাই। ইহা ছাড়া যোগের বিভিন্ন প্রক্রিয়া সম্বন্ধেও আমি সম্পূর্ণ অজ্ঞ, সে কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। যোগ-শাস্ত্রানুযায়ী আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার প্রভৃতি প্রক্রিয়ার জন্য আমি প্রথম জীবনে কিছু চেষ্টাই শুধু করিয়াছিলাম, কিন্তু কার্য্যতঃ সেদিকে অগ্রসর হইবার মত আমার অন্তরে আদৌ কোন আগ্রহ জাগে নাই।

কিন্তু প্রবল এই বিপর্য্যয়ের মধ্যে আমার মনের উপর জ্যোতির্ম্ময় ছন্দে আনন্দধারার যে বিকীরণ ঘটে আমি ইহা বেশই বুঝিতে পারি। এই জ্যোতি-র্ব্বিকাশের একটা ধারা বেশ ধরা যায়। আবছা গোছের অন্ধকার। যেন সন্ধ্যা আসিতেছে, প্রথমে এইরূপ মনে হইল। এই ভাবটি খুব অল্প সময়, কয়েক সেকেণ্ডের জন্য। তারপর অরুণোদয়কালের স্বর্ণাভ আলোকের রেখা ছটকিয়া পড়িয়া যেন সেই আঁধারকে গ্রাস করিল। পরে সেই আলোক ক্রমে নীলাভ চিক্কণ হইয়া উঠিল। ইহার পরে তরল রূপালী রঙের জ্যোৎস্নায় চারিদিক উদ্ভাসিত হইয়া গেল। ইহাতে হরিদ্রাভ একটা দ্যুতি ছিল বটে; কিন্তু শুভ্রতার ভাগই বেশী বলিয়া মনে হইল। পদ্মফুলের দল মেলিবার মত এই জ্যোতিঃ বিকশিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে রূপের বিলাসও ছিল, একথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। বস্তুতঃ রূপ ছাড়া এখানে অন্য জ্যোতিঃ নাই। জ্যোতিতে মন্ত্র-মূর্ত্তির চিন্ময় স্ফূর্ত্তি, অর্থাৎ জ্যোতিঃ জড় নহে। তাহার মূলে ব্যক্তধর্ম্মী শক্তির খেলা বা ভঙ্গী ছিল। এইটিকেই বলিতেছি রূপের বিলাস। সেই রূপের স্ফুরণজনিত কিরণ-বিকীরণে জগৎ ডুবিয়া গেল, অন্য কোন আলো থাকিল না।

বস্তুতঃ এই সময় আমার যাহা অনুভব হইল, পূর্ব্বে সে সম্বন্ধে আমার কোন ধারণাই ছিল না। মনের গভীর স্তরে কি হয় আমি জানি না, কারণ যোগিগণ যাহাকে দহর বলেন, গভীর সেই হৃদয়-হ্রদে অবগাহন করিবার মত রস-সংস্পর্শ আমার কোনদিন হয় নাই; অধিকন্তু সাক্ষাৎ-সম্পর্কে জ্যোতির এইরূপ বিকাশ কিংবা রূপমাধুর্য্যের পারম্পর্য্য-প্রকটনপটীয়সী এমন বিলাস-বিভঙ্গী সম্বন্ধে জীবনে কোনদিন অনুধ্যানও আমি পাই নাই। প্রকৃতপক্ষে ইহা এক অভূতপূর্ব্ব ব্যাপার।

শ্রীভগবানের সব কাজই মধুর। এই যে মাধুর্য্যময় সর্ব্বতোভদ্র এবং সর্ব্বব্যাপী অপরিচ্ছিন্ন তাঁহার লাবণ্য, তাঁহার অনন্ত এবং অখণ্ড লীলা, দেহাত্মবুদ্ধি থাকিতে তাহা একান্তভাবে উপলব্ধি করা সম্ভব নয়, কারণ দেহজ্ঞান পরিচ্ছিন্নতা আনিয়া দেয়, অজ্ঞানতার প্রভাব পূর্ণকে অপূর্ণ এবং অখণ্ডকে খণ্ড করিয়া ফেলে। এরূপ অবস্থায় ভগবদ্প্রেমের সম্বন্ধে শুধু অনুমান মাত্রই করা চলে কিন্তু প্রত্যক্ষ জ্ঞান জন্মে না। অথচ অনুমানের বলে কোন রসই মনের কোণে জমিয়া উঠিতে পারে না; দেহ সম্পর্কিত সংকীর্ণতা সব শোষণ করিয়া লয়। কাম সম্পর্ক থাকিতে প্রকৃত প্রেমের উদয় সম্ভব নহে।

এসব অনেক উপরের স্তরের কথা; কিন্তু যে কারণেই হউক, বিদ্যুতের ঝলকে পলকের মধ্যে অখণ্ড ভগবৎ-প্রেমের মাধুর্য্য সেদিন আমার মনের উপর দিয়া খেলিয়া গিয়াছিল। রূপের মধ্যে মূর্ত্তির স্ফূর্ত্তি আমি অনুভব করিলাম, দেখিলাম, সেই মূর্ত্তির মধ্যে সবই রঙ্গময়। অঙ্গের বিভঙ্গীতে রসের তরঙ্গে প্রাণধারা ছুটিতেছে এবং সেই প্রাণক্রিয়া বিশ্বে পরিব্যাপ্ত হইয়াছে। বিচ্ছিন্ন কোন বস্তু নাই এবং কোন ক্রিয়া সে লীলা-রসের সম্পর্কবিবর্জিত নহে। আমার দেহ, আমার মন সেই প্রাণরসের ধারার মধ্যে ডুবিয়া গেল। ঘর বাড়ী আমি সব ভুলিয়া গেলাম। আত্মীয়-স্বজনের কথা আমার মনেই হয় নাই। আনন্দের এমন ব্যাপ্তিশীল স্বাচ্ছন্দ্যে আমার সব ভয় ভাঙ্গিয়া গেল। পরম নির্ভরতায় আমি নিজকে ছাড়িয়া দিলাম।

এসব অনুভূতিকে ছাড়াইয়া একটা ঝঙ্কার চারিদিকে বাজিতেছিল। আলাপ কি গুঞ্জন, আমি ঠিক বলিতে পারিব না। তবে ইহা ঠিক যে, শ্রুতিময় একটা সঙ্গতি আমার সমগ্র মনকে স্পর্শ করিয়াছিল। কিছুদিন পর্য্যন্ত এই ব্যাপার আমি লক্ষ্য করিয়াছি। যেন চারিদিকে একটা সুর বাজিতেছে, আর মন সেই সুরের মধ্যে জড়াইয়া আনন্দ রসে নিমগ্ন হইতেছে। বিষয় বিচারের মধ্যে এই লীলা আমার মনকে পড়িতে দিতেছে না। জড়ের সম্পর্কে মনের ঝোঁক গেলেই চিদানন্দ-সঞ্চারিণী শক্তি তাহাকে টানিয়া লইয়া একান্ত সহায়ত্বের স্বাচ্ছন্দ্যে এবং নিশ্চিন্ততায় প্রতিষ্ঠিত করিতেছে।

এই যে ঝঙ্কার, যাহা কয়েকদিন আমার চারিদিক ঘিরিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া বাজিয়াছিল, ইহাই কি 'ধ্বনি'? শুনিয়াছি, ধ্বনির প্রতিবেশে জ্ঞেয় তত্ত্বের

উন্মেষ ঘটে এবং মন জ্ঞেয় তত্ত্বের ভিতর অনুপ্রবেশ করে। ইহার পর মন বিলীন হইয়া শুদ্ধসত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকে। গীতার ত্রয়োদশ অধ্যায়ের দ্বাদশ হইতে সপ্তদশ শ্লোকে এই জ্ঞেয়-তত্ত্বের নির্দ্দেশ দেখিতে পাওয়া যায়। ট্রামের তলায় পড়িবার সঙ্গে সঙ্গে অপূর্ব্ব অভয়ত্ব মাখান মধুর ধ্বনি বাজিয়া উঠে। প্রকৃতপক্ষে মনে হইল, হরিনামের মধ্যেই তাহার বিস্তার এবং আমার তৎকালীন সব অনুভূতি জুড়িয়া সেই নামসুধা-রসেরই সঞ্চার ঘটে। এই ধ্বনির রিণিঝিণি আমাকে ঘিরিয়া রাখিয়াছিল। মাধুর্য্যের সর্ব্বতোব্যাপ্ত লীলা সম্ভবতঃ উক্ত ধ্বনির প্রভাবেই দীপ্তরূপে স্ফূর্ত্ত হইয়াছিল। দেহাত্মবুদ্ধি আমার মনে যখনই জড়াইয়া পড়িয়াছে, তখনই এই মাধুর্য্যের বীর্য্য মনকে তাহা হইতে মুক্ত করিয়াছে।

সাধুকৃপা নাম

অনুভূতির গতি অতি বিচিত্র। মন তাহার গভীর গহনে যতই ডুবিয়া যায়, উদার গগনে সে ততই আপন মহিমায় পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। বিশ্বের সহিত আত্মসম্বন্ধ ততই শতদলের মত মানস-লোকে মাধুরী বিস্তার করে। এইভাবে অন্তর্হৃদয়ে অবগাহন করিবার একটা কৌশল আছে। সেই কৌশল সূক্ষ্মধারা ধরিয়া মনে সাড়া দেয়। সব আড়ষ্টতা হইতে মুক্ত হইয়া মনের তখন সর্ব্বাঙ্গীণ পরিপুষ্টি ঘটিয়া থাকে। মনের কেন্দ্র হইতে আনন্দের ছন্দ এই অবস্থায় দেহের প্রত্যেকটি স্নায়ু-কোষে ছড়াইয়া পড়ে। কোষে কোষে তোষণ এবং পোষণ ক্রিয়ার উজ্জীবন জীবের স্বরূপধর্মের তখন উদ্দীপন, অনন্ত যৌবনের মহিমায় তাহার জাগরণ ঘটে। অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময় এবং আনন্দময় এই পঞ্চাত্মক জীবকোষের অবীর্য্য সে অবস্থায় দগ্ধ হইয়া যায়। নিজের সমগুণ সত্তায় জীবের প্রতিষ্ঠা ঘটে। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় তখনই বুঝিতে পারি—

"আছি আমি একান্তই আছি—মহাজনে দেবতার অন্তরের অতি কাছাকাছি মহেন্দ্র মন্দিরে" ফ্রয়েড্ এই তত্ত্বের বাহিরের পরিচ্ছেদের প্রান্তভাগ মাত্র স্পর্শ করিতে সমর্থ হইয়াছেন, জীবন্ত স্বরূপের সাক্ষাৎ সম্পর্কে পরিচিতি তাঁহার ঘটে নাই। তাঁহার নির্দ্দেশও অনেকটা অনুমানমূলক। একান্ত স্বকৃতির অভাব সেখানে রহিয়াছে। তাঁহার সন্ধান কতকটা ভাষা ভাসা ভাবেই

কাজ করিয়াছে, পরিপূর্ণতার জ্যোৎস্নালোকিত রাজ্যে অনুপ্রবেশ করিয়া মানব-মনের দুজ্ঞের্য় যে সব রহস্য, তিনি সে সবগুলির সমাধান করিতে পারেন নাই।

তন্ত্রের মতে মূলাধারে বিশ্বের সমগ্র শক্তি সম্পুটের আকারে নিহিত রহিয়াছে। মনকে সূক্ষ্ম পথে প্রণিহিত করিয়া মূলাধারে অবস্থিত শক্তির এই সম্পুটের আবরণ উন্মুক্ত করিতে পারিলে সহস্রার পর্য্যন্ত উর্দ্ধে সম্প্রসারী উদার ছন্দ অন্তরের তারে তারে বাজিয়া উঠে, ক্ষুদ্র হইতে মনের গতি বৃহতের অভিমুখে ব্যাপ্তি লাভ করে। এই অবস্থায় মূলাধার হইতে ব্রহ্মরন্ধ্র পর্য্যন্ত জ্যোতির একটা আবর্ত উঠিতে থাকে এবং উপর হইতে অপরিসীম আপ্যায়নের ধারা আসিয়া দেহ ও মনকে আপ্লুত করিয়া ফেলে। সাধক ব্যোম-পঙ্কজ-নিঃস্যন্দিত সেই সুধারস পান করিয়া সামবস্য সুখে বা দিব্যানন্দে নিমগ্ন হন। ক্ষুদ্র কাম তখন পরম প্রেমের মহিমায় বিলীন হইয়া যায়।

সূক্ষ্মপথে মনের গতিকে এই ভাবে উর্দ্ধাভিমুখে পরিচালিত করা সহজ নয়। জড় বিচারের দ্বারা কিছুতেই মনের মুক্তাশ্রয় অবস্থা লাভ করা সম্ভব হয় না। পাটের আঁশের মত মনের চারিদিকে ক্ষুদ্র স্বার্থমূলক চিন্তাগুলি জড়াইয়া থাকে। এগুলি এতই সূক্ষ্ম যে অনেক সময় ধরা পড়ে না কিন্তু কাজের বেলা এগুলি চাড়া দিয়া উঠে এবং মনের বলকে এলাইয়া দেয়। মন বহিশ্চিন্তার এমন সব সূক্ষ্ম আঁশে আটকাইয়া পড়াতে তাহার উর্দ্ধগতি নিরুদ্ধ হয়। একমাত্র মন্ত্রের সাধনার দ্বারাই মনকে এই সব জঞ্জাল হইতে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত করা সম্ভব হইতে পারে। মনকে সূক্ষ্মপথে পরিচালিত করিবার কৌশল মন্ত্রের ভিতর নিগূঢ়ভাবে থাকে, বিক্ষেপ হইতে সংক্ষেপে যাইবার সে ধারা। এই হিসাবে মন্ত্রের বিশেষ শক্তি আছে এবং সে শক্তি অন্য কোন ভাবে আয়ত্ত করা সম্ভব নয়। শ্রীল জীবগোস্বামীপাদ মন্ত্রতত্ত্বের ব্যাখ্যা করিতে গিয়া বলিয়াছেন—"ভগবন্নামাত্মকাঃ হি মন্ত্রাঃ ঋষিভিশ্চাভিহিতাঃ শক্তিবিশেষাঃ সমাত্ম-সম্বন্ধপ্রতিপাদকাশ্চ।"

বাস্তবিক পক্ষে ব্যাকরণের সাহায্যে মন্ত্রের অর্থ উপলব্ধি করা যায় না। মহাভারতে দেখিতে পাই, ঋষি সনৎসুজাত বলিতেছেন, যে মূল হইতে ব্যাকরণের উৎপত্তি, ভাষার বিস্তার, এবং ছন্দের সম্বন্ধ সূত্রে সমাজের সংস্থিতি তাহাকে ব্যাকরণের দ্বারা কেমন করিয়া ব্যাখ্যা করা সম্ভব হইতে পারে?

জপিতে জপিতে অন্তরে মন্ত্রের স্ফুরণ হয়, সত্যের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে মনের সংযোগ ঘটে। সত্যের সঙ্গে এইভাবে সাক্ষাৎ সম্পর্কে সংযোগ ঘটিলে সাধক সর্ব্বদর্শী হইয়া থাকেন। তিনি সর্ব্বাত্ম-ভাবনায় প্রতিষ্ঠিত হইয়া কৃতার্থতা লাভ করেন। ইহাই বিদ্যা—"যা বিদ্যা পরমামুক্তের্হেতুভূর্তা সনাতনী।" ভাগবত বলেন, মন্ত্রার্থের সহিত মনের সংযোগ-সাধনাত্মিকা এই যে লীলাময়ী শক্তি শ্রীভগবানের আত্মমায়ার আশ্রয় ব্যতীত মন তাঁহার সম্পর্কে যাইতে পারে না। আত্মমায়াই অনুভবকে জাগ্রত করিয়া মন্ত্রার্থকে প্রত্যক্ষ-প্রভাবে উদ্দীপ্ত করিয়া তোলেন। এই আত্মমায়াকেই খৃষ্টানরা "হোলি গোষ্ট" বলিয়া অভিহিত করিয়া থাকেন। গীতাতে এই সত্যের নির্দ্দেশ রহিয়াছে। গীতার চতুর্থ অধ্যায়ে শ্রীভগবান বলিয়াছেন, "আমি যদিও জন্মরহিত, অবিনশ্বর স্বভাব এবং ভূতগণের ঈশ্বর তথাপি স্বীয় শুদ্ধ সত্ত্বময়ী প্রকৃতিকে আশ্রয় করিয়া আত্মমায়ার প্রভাবে আবির্ভূত হইয়া থাকি।" আচার্য্য শঙ্কর নিজেও এ সত্য স্বীকার করিয়াছেন। গীতা-ভাষ্যে তিনি বলিয়াছেন, ভগবান্ নিত্য, শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত-স্বভাব হইয়াও নিজ মায়ার আশ্রয়ে তিনি যেন দেহ ধারণ করেন, জন্ম পরিগ্রহ করেন, এই ভাবে লোকের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন করিয়া থাকেন। শ্রীভগবানের এই আত্মমায়াই অনুভূতির মূলে কাজ করিয়া থাকে, সুতরাং শ্রীভগবানের লীলাকে স্বীকার না করিলে অনুভব অর্থাৎ মনের মূলে ভগবানকে প্রত্যক্ষ ভাবে উপলব্ধি করা সম্ভব হইতে পারে না এবং ভগবচ্ছক্তির চিদৈশ্বর্য্যময় অভিব্যক্তি সেক্ষেত্রে পরিস্ফূর্ত্তি লাভ করে না। অনুগ্রহ যেখানে নাই, বিগ্রহও সেখানে নাই। বিগ্রহ যেখানে নাই, বিশেষ ভাবে গ্রহণ করিবার জন্য মনের পরিপূর্ত্তিতে জীবের চেতনায় দৈন্য বা অসঙ্গতি সেখানে থাকিবেই। যেখানে এই অবস্থা সেখানে সেবা কি করিয়া সম্ভব হইতে পারে? "ভক্তি ভগবতঃ সেবা, ভক্তিপ্রেমস্বরূপিণী।"

ভগ নের লীলার চাতুরীময় রসের সংস্পর্শ আবার শ্রুতির পথেই ঘটিয়া থাকে। শ্রুতির ভিতর দিয়া মন আবিষ্ট হইলে তবে লীলারসের ঘনিষ্ঠতা লাভে তাহাতে আগ্রহ জাগ্রত হয় এবং মনের ধর্মে শ্রীভগবানের দিব্য কর্ম ধরা পড়িয়া যায়। অন্যথায় স্বার্থগত আমাদের বিচারে মনোধর্ম খণ্ডিত হইয়া যায় সুতরাং সমগ্রভাবে ভগবানের সংবেদন আমরা অনুভব করি না। এই জন্যই ভগবৎ কর্ম্ম বা আচরণের চেয়ে বচনের উপর জোর দেওয়া হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে

বচন এবং আচরণ এই দুই-ই অবিচ্ছেদ্য ভাবে লীলারসে বিধৃত থাকে ; বচনে যদি মন আত্মরসে উচ্ছলতা লাভ করে তবে আচরণও লীলা হইয়া দাঁড়ায়। পক্ষান্তরে বচনের রসে চিত্ত যদি ডুবিয়া না যায়, তবে আমাদের মনে দেশ, কাল ও পাত্র-সম্পর্কিত বৈষম্য বিচার আসিয়া পড়ে। ইহার ফলে মনের গোড়া হইতে অনুভবের ধারা কাটিয়া যায়। গীতার দশম অধ্যায়ের ৮ম হইতে ১১দশ শ্লোক অর্থাৎ চতুঃশ্লোকী গীতায় এই তত্ত্বটি স্পষ্টভাবে ব্যক্ত রহিয়াছে এবং সাধনার ধারা নির্দিষ্ট হইয়াছে। শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন "আমি সমুদয় জগতের উৎপত্তির হেতু, আমা হইতে সমুদয় উদ্ভূত হয়, ইহা উপলব্ধি করিয়া বিবেকী ব্যক্তিগণ প্রীতিযুক্ত চিত্তে আমার আরাধনা করিয়া থাকেন। তাঁহারা আমাতে চিত্ত ও ইন্দ্রিয়বর্গ সমর্পণ করিয়া সকলকে আমার কথা বলেন, আমার মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়া তাঁহারা নিজেরা পরম আনন্দ উপলব্ধি করেন এবং অপরের তুষ্টি সাধন করেন। এইভাবে আমাতে সর্বদা আসক্ত-চিত্ত এবং প্রীতি পূর্বক আমার ভজনাকারীদিগকে আমি বুদ্ধিযোগ প্রদান করিয়া থাকি। তাঁহারা সেই পথে আমাকে প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। তাঁহাদের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশার্থ আমি আত্মভাবে অধিষ্ঠিত হইয়া উজ্জ্বল জ্ঞানময় প্রদীপ দ্বারা গুরুরূপে তাহাদের অজ্ঞান অন্ধকার বিনষ্ট করি।"

প্রকৃত-পক্ষে ভগবানের বচন এবং আচরণ একই বস্তু। বেদ-বেদান্ত তাঁহার বচন এবং বেদ-বেদান্তের স্বরূপও তিনি। সাধকের মন ভগবানের বচন-সুধায় নিমগ্ন হইলে তাঁহার আচরণেও আত্মসম্বন্ধে তিনি উদ্বুদ্ধ হন। সে অবস্থায় ভগবানের লীলাশক্তি সাধককে আশ্রয় করিয়া কাজ করে। ভাগবতী বাণীর তিনি মূর্ত্তিস্বরূপে পরিণত হন। তাঁহার বচনের ভিতর দিয়া ভাগবতী শক্তির মাধুর্য্য বীর্য্যস্বরূপে কাজ করে। এই অবস্থায় সাধকের জীবন শ্রীভগবানের নাম-কীর্ত্তনরূপে প্রমূর্ত্ত হয়। শ্রীভগবানের নামে নিষ্ঠিত এমন সাধকই ভগবানের সাক্ষাৎসম্পর্কে জীবকে লইয়া যাইতে পারেন। এমন ভক্তকে আশ্রয় করিয়া তাঁহার আত্মভাবে গুপ্ত লীলা চলে। সর্ব্বদা ভগবানের নামকীর্ত্তনপরায়ণ, ভক্তির পথে তাঁহার উপাসনায় নিত্যযুক্ত এমন যে সব সাধক তাঁহারাই প্রকৃত মহাত্মা। গীতার নবম অধ্যায়ের ত্রয়োদশ এবং চতুর্দ্দশ শ্লোকে একথা বলা হইয়াছে। শ্রুতির মতে যিনি 'সদা জনানাং হৃদি সন্নিবিষ্ট' এমন ভক্তরূপী আচার্য্যের প্রাণময় ধ্বনির সঞ্চার-শক্তিতে তিনি ব্যক্তভাবে

প্রকটিত হন। মাত্রা স্বরে এবং বর্ণে উত্তরোত্তর স্ববিষ্ঠ হইয়া তিনি শ্রীবিগ্রহ রূপে দেখা দেন। কিন্তু আচার্য্যের বচনের অন্তর্নিহিত এমন গূঢ়বীর্য্যের প্রভাব আমাদের মনের স্থূল স্তরে সব সময় সঙ্গে সঙ্গে ধরা পড়ে না; এমন কি, অধিকাংশ স্থলেই নয়। এজন্যই মহৎসঙ্গকে অগম্য বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। কিন্তু অগম্য হইলেও তাহা অমোঘ, অর্থাৎ কাজ তাহা করিবেই। আমাদের অহংকারের বাতি যখন দুর্যোগ-ঝঞ্ঝায় নির্বাপিত হইবে, গভীর সেই অন্ধকারে মন এবং বুদ্ধি কোন পথ যখন পাইবে না, তখন আমরা ইঁহাদের অভয়হস্ত সম্প্রসারিত দেখিতে পাইব। ইঁহাদের বচনের জ্যোতিঃ আমাদের গতিপথকে তখন স্বচ্ছন্দ এবং সুগম করিয়া তুলিবে। এই সব মহাত্মা ভগবানের কৃপামূর্ত্তি। ইঁহারা ভগবদনুগ্রহের বিগ্রহস্বরূপ। ইঁহাদের বচনের মধুচ্ছন্দের সঙ্গে মনের সম্বন্ধ ঘটিলে ভগবানের সব আচরণ, বিশ্বসংসারে যেখানে তাঁহার যত কাজ চলিতেছে, সব আনন্দময় হইয়া ফুটে। বাস্তবিকপক্ষে ইঁহাদের বচনকে আশ্রয় করিয়াই ভগবানের আবির্ভাব সম্ভব হয়। বাঙ্ময় তনু হইতে তিনি চিন্ময় লীলায় প্রকটিত হন। মায়াময় যবনিকার আড়াল হইতে রঙ্গময় বিভঙ্গীতে তিনি হাসির ছটায় দিক্ আলো করিয়া বাহির হইয়া পড়েন। 'সম্ভবামি যুগে যুগে' এই ভাগবতী বাণী এই ভাবেই সার্থকতা লাভ করে। এ লীলায় জড় প্রকৃতির রাজ্যেও ভগবান্ পরিপূর্ণ মহিমায় অধিষ্ঠিত। প্রকৃতিকে অভিভূত করিয়া পুনঃ পুনঃ সৃষ্টির কুহক এখানে থাকে না। এমন লীলার স্পর্শে ভূতগ্রাম আর প্রকৃতির বশে অবশভাবে পরিচালিত হয় না; প্রত্যুত প্রজ্ঞানময় প্রাণ-ধারার প্লাবনে বিশ্ব-প্রীতি সঞ্জীবিত ও সরস হইয়া উঠে।

আমার মনে হয়,ভগবানের নাম-পরায়ণ মহাপুরুষের এমন কৃপাই মহাভয়ের মধ্যেও আমাকে সঞ্জীবিত রাখিয়াছিল। আমি সে কৃপা ধরিতে পারি নাই। অজামিল মৃত্যুমুখে পড়িয়া ভগবানের মঙ্গলময় নাম উচ্চারণ করিয়াছিলেন। পূর্বজন্মে তাঁহার মহতী সুকৃতি ছিল। এ প্রশ্ন কেহ তুলিতে পারেন। কিন্তু আমার পক্ষে সে যুক্তি অচল, কারণ বিপদে পড়িয়া আমি ভগবানের নাম উচ্চারণ করি নাই। তবু কৃপা অযাচিত ভাবে আসিয়াছে, বিদ্যুতের মত ঝলকে ঝলকে তাহার প্রভাব অন্ধ আমার নেত্র-পথকে উজ্জ্বল করিয়াছে। এমন কৃপার জয় হোক্, জয়তু জগন্মঙ্গলং হরের্নাম।

বাঁশী বাজে মন মাঝে

ভগবদ্দর্শন, দিব্যদর্শন, জ্যোতিঃ দেখা এসব এদেশে নূতন নয়। ছোট বড় অনেকের মুখেই আমরা ঐ সব কথা যেখানে সেখানে শুনিতে পাই। প্রকৃত পক্ষে সেগুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দুর্ব্বল মনের সংস্কার মাত্র। রূপ গোস্বামী মহারাজ খোলাখুলি ভাবেই একথাটা বলিয়াছেন। তাঁহার মতে যাহাদের অন্তঃকরণ স্বভাবতঃই দুর্ব্বল, কিংবা যাহারা কিছুদিন ধরিয়া অভ্যাস করিয়াছে সত্ত্বাভাস ব্যতীতই তাহাদের দেহে কম্প, অশ্রু, পুলক এসব লক্ষণ দেখা যাইতে পারে। ফলতঃ এসব ব্যাপারের সঙ্গে মনের মূলে ব্যাপ্তিচেতনার কোন উদ্দীপনাই নাই। শ্রীমন্মহাপ্রভু এই ধরণের ব্যাপারকে বিশেষ কোন গুরুত্ব প্রদান করেন নাই। প্রভু যখন বৃন্দাবনে অবস্থান করিতেছিলেন, তখন কেহ কেহ আসিয়া তাঁহাকে এই কথা বলেন যে, কালীদহে কৃষ্ণ আবির্ভূত হইয়াছেন। রাত্রিতে তাঁহার দিব্যলীলা দৃষ্ট হইয়াছে। মহাপ্রভু এসব কথা আমল দেন নাই। প্রভু বলিয়াছিলেন, কৃষ্ণ ঐভাবে দেখা দেন না। পরে প্রকৃত সত্য ব্যক্ত হইয়া পড়ে। জানা যায়, কতকগুলি জেলে নৌকার গলুইয়ের উপর আগুন রাখিয়া মাছ ধরিতেছিল, অজ্ঞ জনগণ সেই ব্যাপারকে কালীয়-শিরে শ্রীকৃষ্ণের নৃত্য বলিয়া ভুল করিয়াছে। বাস্তবিক পক্ষে প্রেমস্বরূপ ভগবানকেও দেখিব, অথচ আমাদের দৈনন্দিন জীবনের ধারারও কোন পরিবর্ত্তন ঘটিবে না, ইহা সম্ভব নহে। একখানা সুন্দর মুখ দেখিলে আমরা সহজে ভুলিতে পারি না, আর যিনি চির-সুন্দর তাঁহাকে দেখিয়া বাহ্য-ভোগ বিচারে মাতামাতি করিব, রেষারেষি, দ্বেষাদ্বেষী চালাইব এবং ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়গুলির নিতান্ত স্থূল আকর্ষণের দিকে শিশুর মত আসক্ত থাকিব, ইহা স্বাভাবিক বলিয়া মনে হয় না। শাস্ত্রবিদ্‌গণের মতে মধুর রসের ধর্ম্মই এই যে, তাহা বিস্তার লাভ করে। ভগবান মধুর হইতেও সুমধুর। মন যদি একবার সত্যই তাঁহার প্রেমের স্পর্শ পায়, তবে মনের সব ধারা দিয়া রসমাধুর্য্য ছড়াইয়া পড়িবে। আমাদের সকল অনুভূতি নিত্য তৃপ্তিতে পরিপূর্ত্তি লাভ করিবে, ইহাই স্বাভাবিক। কালের হিসাব তখন আর থাকিবে না, কারণ, সেই পরম সঙ্গতি হইতে মন আর বিচ্যুত হইতে চাহিবে না। বস্তুতঃ কালকে অতিক্রম করিতে না পারিলে অনুভূতির পরিপূর্ত্তি নাই। "ন যত্র কালঃ প্রভবেৎ পরপ্রভুঃ"—কালের কর্ত্তৃত্ব সর্বত্র অপ্রতিহত, কিন্তু ভগবদনুভূতির রাজ্যে কালের কর্ত্তৃত্ব থাকে না। গোস্বামীপাদ

কবি কর্ণপুর সুমধুর কাব্যছন্দে এ সত্য ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, ভগবদনুভূতির স্পর্শে মানুষের পঞ্চেন্দ্রিয়ের একান্তভাবে স্ফূর্তি সাধিত হয়। ক্ষণরূপ শয়ন ছাড়িয়া সাধক স্বেচ্ছায় উত্থান লাভ করেন। দিব্য জীবনের স্পন্দনে দেহ, মন এবং ইন্দ্রিয়সকল ছন্দে ছন্দে জাগে। বাঁশী বাজিতে আরম্ভ হয়। সে ধ্বনির তরঙ্গ-রঙ্গে মানুষের সমস্ত জীবন দিব্য লীলার অঙ্গীভূত হইয়া পড়ে। জীবনে আর কোনও বিরোধ থাকে না; বাহিরের সকল বিপর্যয়ের মধ্যে ভাগবৎ-মাধুর্য্যেই সাধক অনুপ্রাণিত হন। তিনি সর্বত্র ভগবানকেই দর্শন করেন। এদেশের অধ্যাত্ম-শাস্ত্রে ইহাই পরম পুরুষার্থ বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। কিন্তু এরূপ অনুভূতি আমার হয় নাই। আমার মন অনুভূতির আলোকে কালকে অতিক্রম করিতে পারে নাই, অবসন্ন হইয়া সে ক্ষণরূপ শয্যাই পুনরায় গ্রহণ করিয়াছে। কৃপার স্পর্শ হয়ত পাইয়াছিলাম, কিন্তু সে সংবেদন আমার মনকে বিদ্ধ করিয়া জড় জীবনের গ্লানি হইতে আমাকে মুক্ত করিতে সমর্থ হয় নাই। সুতরাং সাময়িক এই অনুভূতিতে আমার পক্ষে আশ্বস্তির কোন কারণই আমি দেখিতে পাইতেছি না। বস্তুতঃ আমার সেই অনুভূতির মূলে গূঢ় শক্তি যতই থাকুক, শুধু সে আলোচনা আমাকে সান্ত্বনা দিতে পারিতেছে না।

আমার অনুভূতির মূলে গূঢ় শক্তি যে কিছু ছিল এমন ধারণা করিবার কয়েকটি কারণ আছে। একটি এই কারণ যে, প্রাণান্তকর বিপর্য্যয়ের আবর্ত্তের মধ্যে আমার মনে আনন্দের যে একটা প্রতিবেশ সৃষ্ট হয় এবং তাহা আকস্মিক ভাবে ভাঙ্গিয়া যায় নাই। অভ্যুদয়ের যে রসটি আমার অন্তরে উপচাইয়া উঠে, কিছুদিন পর্য্যন্ত মনের সঙ্গে তাহা বেশ মাখা ছিল, পরে ক্রমে ক্রমে ফাঁকা হইয়া যায়। ট্রামের তলায় পড়িয়া ঝাঁকুনি খাইবার সঙ্গে সঙ্গে ভগবানের লীলার দিকটা যেন মনে প্রাণে ঝকমকিয়া উঠে। ইহার পাঁচ ছয়দিন পরে দ্বিতীয় বিপর্য্যয় দেখা দেয়। অন্ত্রদেশ হইতে প্রচুর জমা কালো রক্ত নির্গমনের ফলে আমি মুমূর্ষু অবস্থায় উপনীত হই। সুবিজ্ঞ চিকিৎসকগণ সকলেই আমার জীবনের আশা ছাড়িয়া দিয়াছিলেন এবং আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে শেষ দেখা করিবার সব ব্যবস্থাই তাঁহারা সম্পূর্ণ করেন। এই অবস্থার সব কথা আমার স্মরণ আছে। আমি তখন মনের মূলে খুঁজিয়া ভগবৎ-লীলার জীবন্ত স্পর্শ পাই নাই; কিন্তু মনের গোড়ায় খুঁটি তখনও টলে নাই। লীলাংশ

স্তিমিত হইয়া গেলেও গূঢ় শক্তির প্রভাব আমার মনে অভয়ত্ব দৃঢ় রাখিয়াছিল। আমি আশ্রয়হারা হইয়া পড়ি নাই।

একটা আনন্দোদ্বেল স্রোতের ধারায় আমি যেন ভাসিয়া চলিতেছিলাম। সে চলার কোথাও কোন বাধা নাই, এমন একটা ভাব আমার মনকে পুষ্ট করিতেছিল। মোটামুটি ইহাকে প্রসাদের একটা আভাষ বোধ হয় বলা যাইতে পারে। প্রকৃতপক্ষে অনুভূতির ইহা আলম্বনাত্মক অংশ। কিন্তু উদ্দীপনাংশ যেন গুটাইয়া পড়ে। প্রকৃতপক্ষে আলম্বন লইয়াই উদ্দীপনা ঘটিয়া থাকে। মন আলম্বনকে যতই একান্ত করিয়া জড়াইয়া ধরে ততই উদ্দীপনা উচ্ছ্বসিত হয়, ভঙ্গীতে ভঙ্গীতে ছড়াইয়া পড়ে। এইভাবে আলম্বনকে নিজ করিতে পারিলে মন্ত্রবীজের মহিমা চিত্তে ব্যাপ্ত হইয়া লীলাংশে দীপ্ত হইয়া থাকে। আলম্বনকে আশ্রয় করিয়া গভীর গহনে মনের এই অবগাহনে আমাদের পক্ষে যে সর্ব্বাঙ্গীণ রসের অনুভূতি ঘটে, তাহাকেই উদ্দীপনা বলা যাইতে পারে। বাস্তবিক পক্ষে আলম্বন যেন মনকে বাহ্য সংস্পর্শ হইতে টানিয়া লয়, আর উদ্দীপনা বাহিরে আনিয়া তাহাকে দিব্যভাবে ফুটাইয়া তোলে।

আলম্বনের এই যে সাড়া ইহাই বা আমি মনের মূলে কোথা হইতে পাইলাম, এখানে এই প্রশ্ন থাকিয়া যায়। আমার পক্ষে ইহা ব্যক্ত করা সম্পূর্ণ অসম্ভব; কারণ অকস্মাৎ এবং অযাচিতভাবেই সে বস্তু আমাকে স্পর্শ করিয়াছিল। আমি শুধু এই টুকুই বলিতে পারি যে, হয়ত আমার মন কোন সময় এমন কিছু পাইয়াছিল যাহার সঙ্গে সাক্ষাৎ-সম্পর্কে আমার পরিচয় ঘটে নাই; অর্থাৎ যে বস্তুর স্বরূপ আমি তখন ঠিক ধরিতে পারি নাই বা বুঝিতে পারি নাই। কিন্তু আমার অজানা এবং অবোঝা সত্ত্বেও সে শক্তি কাজ করিয়াছে। ইহাকে কৃপাশক্তি বলিয়াই শুধু আমার পক্ষে ব্যাখ্যা করা সম্ভব।

শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশ স্কন্ধে শ্রীভগবান উদ্ধবকে লক্ষ্য করিয়া আমাদিগকে আশ্বস্ত করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, কামকে জয় করা অত্যন্তই কঠিন ব্যাপার। কিন্তু সেজন্য চিন্তা করিও না। যদি কামকে জয় করিতে না পার, তাহাতেও নিরুৎসাহ বোধ করিবার কারণ নাই। আমার কথায় শ্রদ্ধাযুক্ত হও। সেই কথার ছন্দে ছন্দে আমার কৃপাশক্তির সঙ্গে তুমি সম্বন্ধযুক্ত হইবে। বস্তুতঃ সেই পথে ভক্তের অঙ্গের মাধুরী তোমার দৃষ্টিতে উন্মুক্ত হইবে। ভক্তের

অনুধ্যান চিন্ময় প্রভাবে উজ্জ্বল হইয়া তোমার অজ্ঞানতা দূর করিবে। তোমার চিত্তে প্রসাদের সঞ্চার হইবে। প্রকৃতপক্ষে এদেশের অধ্যাত্ম সাধনায় জ্ঞান বলিতে শুধু কতকগুলি বিচারগত সিদ্ধান্তকে স্থাপন করা হয় নাই। প্রত্যক্ষ-অনুভূতিকেই জ্ঞান বলিতে বুঝান হইয়াছে। এই মর্ত্ত্য জগতে ভক্তের ভিতর দিয়াই ভগবানের এরূপ প্রত্যক্ষ অনুভূতি সম্ভব। ভক্তকে আলম্বন-স্বরূপে গ্রহণ করিয়াই ভগবৎ-তত্ত্বের উদ্দীপনা ঘটে, ভাবনার সঞ্চার হয়—"ন চাভাবয়তঃ শান্তিঃ, অশান্তস্য কুতঃ সুখং"—ইহা ভাগবতী বাণী। বস্তুতঃ আমাদের চিন্তার রাজ্য জুড়িয়া সব সময়ই সূক্ষ্মভাবে কালের কাজ চলিতেছে। যম সংযমনী পুরী বসিয়া কালের পথে আমাদের চিন্তার অতি সূক্ষ্ম গতির সূত্রে আমাদের জন্য ভবিষ্যৎ জীবন গড়িয়া তুলিতেছেন। এই যম অন্তর্যামী ভগবানেরই শক্তিবিশেষ। আমাদের বাসনা অনুযায়ীই তিনি আমাদের সাধনার ফল দিতেছেন। প্রকৃতপক্ষে আমাদের সাধারণ দশজনের চিন্তার রাজ্যে কামেরই কাজ চলিতেছে, প্রেমের স্থান সেখানে নাই। এইজন্য আমাদের যত দুর্দ্দশা। চিন্তার এই রাজ্যে ভগবানকে প্রতিষ্ঠা করিতে না পারিলে অধ্যাত্ম-তত্ত্ব কিছুতেই জীবন্ত হইয়া উঠে না। শ্রীভগবানের রূপ, গুণ এবং লীলার প্রত্যক্ষ সংস্পর্শের চিন্ময় রসে মন যদি নিমগ্ন না হয়,তবে সে আবার অবসন্ন হইয়া পড়ে। একমাত্র ভক্তের কৃপাই অনুমানকে ছাড়াইয়া প্রত্যক্ষতার বলে সাধনায় প্রাণসঞ্চার করিতে পারে। ভগবানের সেবায় নিবেদিত তাঁহাদের জীবনের প্রভাব যাঁহারা লাভ করেন তাঁহাদের সম্পর্কে যাঁহারা যান, অধ্যাত্মশক্তি তাঁহাদের মধ্যে সংক্রমিত হয়। প্রেমের ইহাই প্রজ্ঞান-তত্ত্ব। বস্তুতঃ প্রেমের জন্য স্বেচ্ছাপ্রণোদিত জাগ্রত সত্যকার লালসা সাধু-জীবনের সম্পর্কেই আমাদের অন্তরে জাগে।

পূর্বেই বলিয়াছি, যাঁহারা ভগবানের নামে নিষ্ঠিত, তাঁহাদিগকে যেভাবেই টোকা দেওয়া যায়, ভগবানের নামই বাহির হইয়া আসে। ইহারাই সত্যকারের ভক্ত পদবাচ্য। শাস্ত্রকারগণ বলেন, ইঁহারা সকলের প্রতি পরম কৃপা-পরায়ণ। যাহারা পাপী তাপী তাহারাও কোনরূপে ইঁহাদের সংস্পর্শে গেলে পবিত্র হয়। ইঁহারা কথার ভিতর দিয়া ভগবানের দিব্য প্রভাব বিস্তার করিয়া মানুষের অন্তরের এবং বাহিরের সব জঞ্জাল দূর করিয়া দেন। ইঁহাদের বচনের অন্তর্নিহিত গূঢ় বীর্য্যের বিস্তারকেই নাদ বলিয়া অভিহিত করা

হইয়াছে। ইহাই রস-সাধনার মূলীভূত"ধ্বনি"। এই নাদ বা ধ্বনি হইতেই ভগবৎ-প্রসাদ প্রসূত হইয়া থাকে এবং সাধকগণ সে প্রসাদের কণা-বিন্দু আস্বাদন করিয়া আনন্দময় জীবনে অধিষ্ঠিত হন। শব্দব্রহ্মে নিষ্ঠিত হইয়া তাহার পর তাঁহারা পরব্রহ্মকে লাভ করেন। বাস্তবিক পক্ষে ভগবানের দিকে যাইবার পথ অনেক থাকিতে পারে; কিন্তু রথ একই। ভক্তি ভিন্ন ভগবানকে পাওয়া যায় না এবং ভক্তিকে আমরা যে নামেই অভিহিত করি না কেন, তাহা আসক্তি ছাড়া অন্য কিছু নয়। ভক্ত-জীবনে অভিব্যক্ত প্রেমের সহিত পরিচয় ব্যতীত এই আসক্তি বা শাস্ত্রের কথায় ঈশ্বরে পরানুরক্তি লাভ করা সম্ভব নয়। ভক্তের বাঙ্ময়ী তনুকে অবলম্বন করিয়াই শ্রীভগবানের দিব্যলীলা অভিব্যক্ত হইয়া থাকে। ভক্তের ভিতর দিয়া তিনি কথা বলেন, ভক্তকে আশ্রয় করিয়া তিনি হাসেন, কাঁদেন, নাচেন; তিনি প্রত্যক্ষভাবে আমাদের মনকে আসিয়া স্পর্শ করেন। অনন্তরূপে তাঁহার প্রকাশ এবং অনন্তভাবে তাঁহার বিলাস এ সব কথা শোনা এক ব্যাপার, আর উপলব্ধি করা অন্য কথা। ভক্তে ব্যক্ত শক্তিকে আশ্রয় করিয়াই অনন্তের খেলা। ভগবানের লীলা ভক্ত-হৃদয়কে মন্থন করিয়া তাঁহার মধুর নামের ঝঙ্কার তোলে—তাহাই আমাদের সাধনার ধন। নতুবা অনর্থময় দেহাত্মবুদ্ধিকে অতিক্রম করিয়া মানবত্বের পরম মহিমায় প্রতিষ্ঠিত হইবার অন্য কোন উপায় নাই। ঋষিগণ, দেবগণ ভগবানের এমন প্রকাশই চাহিয়াছেন। তাঁহারা প্রার্থনা করিয়াছেন—

"জীবস্য সংসরতো বিমোক্ষণং
অজ্ঞানতোঽনর্থাবহাৎ শরীরতঃ
লীলাবতারৈঃ স্বযশঃ-প্রদীপকং
প্রাজ্বালয়ৎ য ত্বা তমহং প্রপদ্যে।

প্রদীপের আলো জীবনে কোনদিন পড়িয়াছিল কি? যদি পড়িয়া থাকে, তবে নিভিল কেন? আবার তাহা জ্বলিবে কি? এই প্রশ্নই অন্ধকারের মধ্যে আমাকে আকুল করিয়া তুলিতেছে।

অনুমানে প্রমাণে নহে

প্রকৃতপক্ষে লীলাকে অবলম্বন না করিলে অধ্যাত্ম-সাধনার পথে রসের সঞ্চার হয় না। ভক্তিতে ব্যক্তভাবেরই সর্ব্বতোময় প্রভাব, অব্যক্তে ভক্তি

নাই। এ স্থলে প্রশ্ন উঠিতে পারে এই যে, লীলাকে না হয় স্বীকার করা গেল, কিন্তু অবতার আবার কেন? এইরূপ প্রশ্নের ক্ষেত্রে কতকগুলি সংস্কারই আমাদের মনের মূলে মুখ্যভাবে কাজ করে বলিয়া মনে হয়। সাধারণ মানুষের দোষ-ত্রুটি অবতাররূপে প্রকটিত ভগবানে আরোপ করিতে আমাদের মন উন্মুখ হইয়া পড়ে। ভগবানকে আমরা দূরে রাখিতে চাই, তাঁহাকে আপন করিতে আমাদের ভয় হয়। কিন্তু যিনি আমাদের আপন হইতেও আপন, তাঁহার সম্পর্কে এমন যুক্তি সঙ্গত বলিয়া মনে হয় না। বস্তুতঃ ভগবানের অবতরণকে অস্বীকার করিলে তাঁহার লীলাকেই প্রকৃতপক্ষে অস্বীকার করা হয়। কারণ, অবতরণের ভিতর দিয়াই তাঁহার লীলার মাধুরী সঞ্চারিত হইয়া থাকে। তিনি আমাদের কাছে আসেন, আমাদের কথা ভাবেন, এইরূপ অনুভূতির ভিতর দিয়া তাঁহার সহিত আমাদের হৃদয়ে রসের সম্পর্ক পরিস্ফূর্ত হইয়া উঠে। প্রকৃত প্রস্তাবে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডই ভগবানের লীলা, এমন ব্যাখ্যা করা যায় বটে; কিন্তু এমন ব্যাখ্যাতে ভাবের ঘরে চুরি থাকিয়া যায়, কারণ বিশ্ব-ব্যাপার হইতে আমরা ভগবানের অস্তিত্ব সম্বন্ধে শুধু অনুমানই করিতে পারি; হৃদয়ে তাঁহার সঙ্গে আমাদের একান্ত সংযোগ ঘটে না। আর হৃদয়ের সম্বন্ধ ব্যতীত লীলার কোন অর্থই হয় না। লীলা মস্তিষ্কের কারবার নয়, তাহা হৃদয়ে উপলব্ধি করিবার বস্তু। হৃদয়ের আলোকে মস্তিষ্ক যদি উজ্জ্বল না হয়, ভগবানের সম্বন্ধসূত্রে জীবনে প্রকৃত আনন্দ লাভ করিবার সব উপযোগই নষ্ট হইয়া যায়। প্রকৃতপক্ষে মস্তিষ্ক পশুপক্ষীদেরও আছে। "জ্ঞানমস্তি সমস্তস্য জন্তোর্বিষয়গোচরে" চণ্ডীর ঋষি প্রথমেই এতত্ত্ব ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কিন্তু হৃদয়ের আলোকে তাহাদের মস্তিষ্ক উদ্ভাসিত হয় না বলিয়াই আত্মতত্ত্ব উপলব্ধির স্বাচ্ছন্দ্য হইতে তাহারা বঞ্চিত। মানুষের এই অধিকার আছে বলিয়াই মানুষের মর্য্যাদা এত বেশী। মানুষ অমৃতের পুত্র। ভারতের সব অধ্যাত্ম-সাধনা, শ্রুতির উপর প্রতিষ্ঠিত। শ্রুতি অবতার-তত্ত্ব স্বীকার করিয়া লইয়াছেন এবং ভগবানের অবতরণ-মাধুরীকে আশ্রয় করিয়াই ঔপনিষদিক সত্য রসধর্মে পরিস্ফূর্ত হইয়াছে, তাহার আনন্দময়ত্ব প্রদীপ্তি লাভ করিয়াছে। বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে ভগবানের লীলা ব্যাপ্ত রহিয়াছে একথা অবশ্যই সত্য। কিন্তু ভগবানের অবতরণের মাধুরীর ভিতর দিয়া আমাদের প্রতি তাঁহার প্রিয়ত্বের প্রগাঢ়তা যদি আমরা হৃদয় দিয়া স্বীকার না করিতে পারি তবে বিশ্ব-প্রকৃতির অন্তর্নিহিত লীলা

আমাদের দৃষ্টিতে জাগে না। আগে তাঁহাকে আপনার করিয়া পাইলে তবে সেই একান্ত লাভের আনন্দে বিশ্বের সর্ব্বত্র ভগবানের লীলা স্বচ্ছন্দ হইয়া উঠে। এখানে আর একটি প্রশ্ন এই যে, আমাদের হৃদয়ের স্তরে ভগবানের সেই কৃপাময় আবির্ভাব, নামিয়া আসা বা অবতরণের অনুভূতি মানসিক ব্যাপার হিসাবে রাখিলেই হয়, এই দ্বন্দ-সংঘাতময়, পরিবর্ত্তনশীল অনিত্য জগতে তাঁহাকে টানিয়া আনিবার প্রয়োজন কি? এ প্রশ্নের উত্তর এই যে, এ প্রয়োজন যেমন আমাদের, তেমনই ভগবানেরও রহিয়াছে। তিনি জগৎরূপে নিজেকে ছড়াইয়া আবার নিজেকে জড়াইয়া ধরিতেছেন। জগৎ তিনি ছাড়া নয়, আমাদের দৃষ্টিতেই ইহা ধূলা-মাটি। তাঁহার অবতরণের অনুভূতির আলোকে বিশ্বপ্রকৃতিও চিন্ময় হইয়া উঠে। সুতরাং লীলার সম্পর্কে জাগতিক জড়ত্বের বিচার, শুধু আমাদের দেহসম্পর্কিত বিকারের সংস্কার মাত্র। আমরা নিজেদের দিকে তাকাইয়া এসব কথা বলি। বস্তুতঃ ভগবানের কৃপা এবং তাঁহার প্রেমের দিকে তাকাইলে এ সকল কূট প্রশ্নের সহজেই নিরসন হইয়া যায়। প্রকৃতপক্ষে লীলার অনুধ্যানে আমাদের চিত্ত যতই নির্ম্মল হয়, ততই তাঁহার সঙ্গে আমাদের প্রেমের সম্বন্ধ গড়িয়া উঠে। প্রগাঢ় সে রসে মন যতই ডুবে, ততই আমাদের জন্য ভগবানের কত বেদনা, আমরা তাহা উপলব্ধি করিতে পারি। তাঁহার আত্মভাবনা আমাদের মন, বুদ্ধি এবং দেহকে পর্য্যন্ত ডুবাইয়া দেয়। ইহাই ব্রহ্ম-সংস্পর্শ-লাভের পথ।

প্রকৃতপক্ষে অহঙ্কারকে অতিক্রম করিতে না পারিলে অধ্যাত্ম-জীবনের সত্যকারের সূচনাই হয় না। কিন্তু অহঙ্কার এমন বস্তু যে, ইহাকে বাহির হইতে ঝাঁকি দিয়া ঝাড়িয়া ফেলিবার উপায় নাই। বাহিরের ঝাঁকা খাইলেও বীজ ইহার ভিতরে থাকিয়াই যায় এবং অনেক সময় আমাদিগকে ফাঁকিতে ফেলিয়া দিয়া শাখাপল্লব বিস্তার করিয়া বাড়িতে থাকে। অন্তরের অন্তস্তলে ভগবৎ-কৃপার ধারা যখন উপচাইয়া উঠে, অহঙ্কার শুধু সেই প্রত্যক্ষ উপলব্ধির চিন্ময় রসেই ভাসিয়া যায়। বস্তুতঃ আমরা আমাদের মনের মূলে সনাতন সত্যস্বরূপ যিনি তাঁহাকে পাইবার জন্যই বিপুল বেদনা বহন করিয়া চলিতেছি এবং তাঁহাকে না পাইয়া ইতস্ততঃ ক্ষিপ্ত হইয়া ঘুরিতেছি। তাঁহাকে না পাওয়া পর্য্যন্ত অহঙ্কারের এই তাড়না নিবৃত্ত হইবার নহে। ফলতঃ অহঙ্কার কোন অবস্থাতেই যায় না, কারণ তাহা হইলে আমাদের সনাতন

সত্তাকে অস্বীকার করিতে হয়। ফলতঃ অন্তরে অব্যবহিত একান্ত লাভের প্রভাবে স্থায়ীভাবে আমাদের ক্ষুদ্র-মমত্ব চিন্ময় অদ্বয় সম্বন্ধে অনন্তে ব্যাপ্তি লাভ করে। লীলার অনুধ্যানই আমাদের অন্তরে এই একান্ত লাভের রস উদ্রিক্ত করিতে পারে। তখন আমরা অনপেক্ষ হই এবং অন্তর্জ্যোতিঃ, অন্তরারাম, অন্তঃসুখের উচ্চাবস্থা অধিগত হওয়া শুধু তখনই আমাদের পক্ষে সম্ভব হইয়া থাকে। ভগবানের বিশিষ্ট লীলাকে মন্ত্রমূলে ঘনিষ্ঠভাবে উপলব্ধি করিয়া আমরা অমৃতময় সত্তায় প্রতিষ্ঠিত হইবার উপযোগী বলিষ্ঠতা লাভ করি। ভগবান্ তখন আনন্দ-লীলা বিস্তার করিয়া আমাদিগকে বরণ করিয়া লন। তাঁহার দ্বারা বৃত হইয়া আমরা নিয়তার্থ হই। সত্যের সঙ্গে নিত্যযুক্ত সেই অবস্থায় আমাদের প্রকৃত ভজন আরম্ভ হয়।

অবতার অসংখ্য। শাস্ত্রে ইহার প্রকরণ ভেদ করা হইয়াছে। কিন্তু সব অবতারে আমাদের মনে অনুধ্যান জন্মে না। তাঁহার আত্মতত্ত্ব অর্থাৎ আমাদের সঙ্গে যে তাঁহার ঘনিষ্ঠতা আছে, অপেক্ষাকৃত সহজ ভাষায় তিনি যে আমাদের জন্য বেদনা বহন করেন, এ তত্ত্ব সব অবতারে সর্ব্ব ভাবে ব্যক্ত নয়। কারণ, মানুষের মনোধর্ম্ম বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে ভগবানের আত্মলীলার অভিব্যক্তিতেও বৈচিত্র্য ঘটিয়া থাকে। আমাদের সহিত সমাত্ম সম্পর্কে ভগবানের পূর্ণাভিব্যক্তি যেখানে সেখানেই তাঁহার নিরবচ্ছিন্ন বেদনা, সর্বৈব ভাবনা, অযাচিতভাবে তাঁহার আত্মতত্ত্ব আমাদের অনুধ্যানে পরিস্ফূর্ত্ত হইয়া উঠে। বস্তুতঃ অন্তরের বেদনার তারে নাড়া না পড়িলে অনন্ত জীবন-প্রভাতের সূর্য্যের স্পর্শ আমাদের হৃদয়ের উপর পড়ে না। আমাদের অহঙ্কৃত অবস্থায় নিত্য সত্যের সঙ্গে ব্যবধানগত বিকার আমাদের থাকিয়াই যায়। এই ভেদবুদ্ধি বা বিকার থাকিতে উৎক্রমণ ঘটিবেই; অর্থাৎ জীবন-মরণের চাকা ঘুরিতেই থাকিবে এবং মৃত্যুভয়কে অতিক্রম করা যাইবে না। প্রকৃতপক্ষে ত্যাগ, সেবা প্রভৃতি উচ্চ মনোবৃত্তি-জ্ঞাপক যে সব সংজ্ঞা আমরা ব্যবহার করিয়া থাকি, এ সবই নির্দ্দেশাত্মক, উদ্দিষ্ট বস্তু।

ভগবানের লীলার সাক্ষাৎ-সংস্পর্শেই আমাদের অন্তরে সত্যকার দৈবী সম্পদের উন্মেষ ঘটে এবং আমাদের জীবনে সে সব সত্য হয়। মানুষ এই পথেই দিব্যজীবন লাভের অধিকারী হইয়া থাকে। এ অবস্থায় আর সংক্রমণ হয় না,

উপসর্পণ আরম্ভ হয়। ভগবানই তখন নিজে আমাদের কাছে ঘেঁসিয়া আসিতে থাকেন। সাধক তখন সর্ব্ববন্ধ-বিনির্ম্মুক্ত অবস্থায় শ্রীভগবানের সেবায় আপনাকে উৎসর্গ করিয়া দিয়া নিত্য জীবনে প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকেন।

"রুদ্র, তোমার দক্ষিণ মুখ দেখাও। সে মুখের হাসিরাশি ছড়াইয়া আমাদিগকে নিত্য পালন কর"—বেদোক্ত এই মন্ত্র অনেকেই জানেন। এই সব মন্ত্রে শ্রীভগবানের প্রত্যক্ষ লীলা-দেহের সেবার জন্যই আগ্রহকে ব্যক্ত করা হইয়াছে, তাঁহার মাধুর্য্য বা সকল অঙ্গের চারু সুষ্ঠুতাই বেদমন্ত্রে প্রকাশ পাইয়াছে এবং সেই মাধুর্য্য ও লালিত্য আস্বাদনের জন্য আকুলতা অভিব্যক্ত হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে আমাদের বেদনা দূর করিবার জন্য আমরা যখন ভগবানকে বেদনা স্বীকার করিতে দেখি, তখনই সমাত্মবোধের সূত্রে তাঁহার দক্ষিণ মুখের মধুর ছন্দ আমাদের অন্তরে ফুটিয়া উঠে। সুতরাং অধ্যাত্ম-সাধনায় অর্থাৎ ভগবৎ-সাধনার পথে অগ্রসর হইতে হইলে ভগবানের ব্যক্তিত্বের মাধুর্য্যময় লীলার অভিব্যক্তির এই দিকটা খুবই বড় কথা। প্রকৃতপক্ষে এই বেদনার ব্যঞ্জনা দান করাই শ্রুতি, স্মৃতি এবং পুরাণের মুখ্য উদ্দেশ্য। ভগবানের সঙ্গে আমাদেব সমাত্ম-সম্পর্ক স্থাপনের জন্য তত্ত্বদর্শী ঋষিদের অভিহিত বিশেষ শক্তি মন্ত্রের মাধ্যমে কাজ করে। এই সব ঋষিবাক্য প্রজ্ঞানময়। সেগুলি যুগোচিত ভাবে মানব-মনের উপর অপরিবর্ত্তনীয় সনাতন সত্যের আলোক-সম্পাত করিয়া সাধ্য এবং সাধনতত্ত্বকে হেতুমৎ এবং বিনিশ্চিত করিয়া থাকে, যিনি মানুষের মন, বচন এবং বুদ্ধির অতীত ঋষিদের শক্তি তাঁহাকে আমাদের কাছে আনিয়া ধরিয়া দেখায়। বস্তুতঃ শাস্ত্রবাক্য বা ঋষিবাক্যের ভিতর দিয়া লীলার উন্মেষ উপলব্ধি করাই উন্নত অধ্যাত্ম-জীবন লাভের পক্ষে একান্ত উপায়। ফলতঃ শুধু নির্দ্দেশে সত্যকে সোজাসুজি পাওয়া যায় না, কারণ সেক্ষেত্রে নানা মত, নানা পথের বিভ্রম সৃষ্টি হইতে পারে। বহু মতের আবর্ত্তে পড়িয়া মন অপরিবর্ত্তনীয় সত্যকে ধরিতে পারে না। প্রথমে শ্রদ্ধাবুদ্ধি প্রয়োজন। সেই শ্রদ্ধাবলে সাধু, গুরু এবং শাস্ত্রবাক্য হৃদয়ে যদি ঐক্য লাভ করে, সত্যোপলব্ধির জন্য তবেই সাধনা সার্থক হইয়া থাকে। বস্তুতঃ তেমন সাধনায় ভগবৎ-প্রেমের প্রমূর্ত্ত প্রকাশ ঘটে।

সংক্ষেপের মধ্যে কয়েকটি দৃষ্টান্তই শুধু উল্লেখ করা যাইতে পারে। গীতায় আমাদের অনেকের দৃষ্টিতে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের দিকটাই বড় হইয়া উঠে। শ্রীকৃষ্ণ কৈবর্তক হইয়া পাণ্ডবদিগকে রণ-নদী উত্তীর্ণ করিয়াছিলেন, ইহাই তাঁহার বিশেষ কৃতিত্ব বলিয়া মনে হয়।* কিন্তু ঋষি সে কথা ষোল আনায় স্বীকার করিতেছেন না। তিনি বলিতেছেন, ভক্তের জন্য বেদনায় যে ঠাকুরটিকে ঘোড়ার লাগাম এবং চাবুক লইয়া সহিস সাজিয়া আসিতে হইয়াছে তাঁহাকে যদি দেখিতে পার, চিনিতে পার, তবেই গীতার অমৃত আস্বাদনে তুমি অধিকারী হইবে। ঘোড়ার লাগাম আর চাবুক ইহাই এক্ষেত্রে গীতার জ্ঞানমুদ্রা—গীতার দেবতাকে ধরিবার, চিনিবার এবং জানিবার সংকেত। চণ্ডীতে আমরা মায়ের অসুরবধকেই অনেকে বড় করিয়া দেখি, কিন্তু ঋষিরা তাহা দেখেন নাই। তাঁহারা অসুবদের দিকে চাহিয়া মায়ের দক্ষিণ মুখের হাসি ছটকিয়া উঠিতেছে দেখিলেন, মায়ের চিত্তের একান্ত কৃপাকেই তাঁহারা উপলব্ধি করিলেন। মায়ের সমর-নিষ্ঠুরতা তাঁহাদের দৃষ্টিতে কৃপার ভঙ্গী বা বিলাস হইয়া ফুটিল। এইরূপ রামচন্দ্রের লীলায় রাবণ বধকে আমরা অনেকে মুখ্য ব্যাপার বলিয়া মনে করি। কিন্তু ঋষিরা বলেন অন্য কথা। শ্রীরামচন্দ্রের লীলা-মাহাত্ম্য বর্ণনা কবিতে গিয়া ভাগবতের ঋষি বলিয়াছেন, রঘুপতি বামচন্দ্রের সমুদ্র বন্ধন, রাক্ষস বধ প্রভৃতি কার্য্য কবিগণ আশ্চর্য্য ব্যাপার বলিয়া বর্ণনা করিলেও এগুলি বড় কিছু নয়। রামচন্দ্র ভক্তজনগণের হৃদয়ে দণ্ডকারণ্যের কণ্টক বিদ্ধ নিজ পাদপল্লব বিন্যস্ত করিয়া আত্মজ্যোতিতে প্রকটিত হইলেন, ইহাই তাঁহার লীলার মুখ্য তত্ত্ব। প্রকৃতপক্ষে রামচন্দ্রের এই লীলার সংবেদনেই দণ্ডকারণ্যবাসী মহর্ষিগণ সকলে গোপীদেহে শ্রীকৃষ্ণ সেবার আস্বাদনে উদ্বুদ্ধ হন এবং পূর্ণব্রহ্মস্বরূপের সাক্ষাৎ-সেবা পাইয়া চরিতার্থতা লাভ করেন।

এই দিক হইতে কৃষ্ণলীলার মহিমা অসমোর্দ্ধ। বৃন্দাবন-লীলা বেদ-প্রতিপাদ্য পরব্রহ্মতত্ত্বের আত্মমাধুর্য্যে সমাত্মসম্পর্কের সূত্রে আমাদের প্রেষ্ঠ স্বরূপের ঘনিষ্ঠতায় উদ্দীপ্ত। এত কাঁটা আর কাহারও পায়ে বিঁধে নাই। কুর্প-কঙ্করে চরণ-নখর রক্তাক্ত করিয়া এমন করিয়া আর কোন অবতারকেই ছুটিতে হয় নাই। বেদনাময় সে লীলার অনুধ্যানে ভাবনায় আমাদিগকে পড়িতেই হয়। তাঁহাকে আপনার করিয়া লইবার ইচ্ছা স্বভাবতঃই জাগ্রত হইয়া থাকে।

কিন্তু শ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলায় এই আত্মমাধুর্য্য সমধিক উদ্দীপ্ত। বস্তুতঃ শ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলা এবং শ্রীকৃষ্ণ-লীলা দুইটি স্বতন্ত্র বস্তু নয়। গৌরাঙ্গ-লীলা কৃষ্ণলীলারই পরিপূর্ত্তি। কৃষ্ণলীলায় সমাত্ম-সম্পর্ক যেটুকু গুপ্ত ছিল, এ লীলায় তাহা ব্যক্ত হইল। অন্তরঙ্গ শক্তির ঝলকে অঙ্গ আলো করিয়া গৌররূপে আসিয়া প্রেমের ঠাকুর আমাদিগকে বরণ করিলেন। প্রেমের দায়ে এই লীলার বিবর্ত্ত-বিলাসে কত কাঁটা যে তাঁহার পায়ে ফুটিয়াছে তাহার হিসাব নাই, নিকাশ নাই। বেদনায়, ভাবনায় জীবকে আপন করিবার সাধনায় প্রেমময় আনন্দময় পুরুষোত্তম যিনি, তিনি এই লীলায় আমাদের কাছে আসিয়া একেবারে ধরা দিয়াছেন। আমার পশুবল্ল জীবনে শ্রীভগবানের সেই অনন্তভাব বা ভূমার মহিমা উপলব্ধি করা সম্ভব হইল না। কিন্তু তাঁহার ভক্তের কৃপা যে পাইয়াছিলাম, একথা ভুলিতে পারিতেছি না। আমার জীবনের সন্ধ্যা-সমাগমে এই আশ্বাসই একমাত্র আলো।

অনুভূতির রীতি ও প্রকৃতি

ভগবানের দিক হইতে আমাদের জন্য তাঁহার যে বেদনা, আমাদের দিক হইতে তাহাকেই আমরা তাঁহার করুণা বলিয়া থাকি। প্রকৃতপক্ষে আমাদের মত সাধারণ মানুষের পক্ষে ভগবানের করুণা সম্বন্ধে সুস্পষ্ট কোন একটা ধারণাই হয় না। আমাদের কাছে সে করুণা ব্যবহিত ; অর্থাৎ ছাড়া-ছাড়া। আমাদের মনের গোড়ায় সনাতন ধারায়, অন্য কথায়, স্থায়ীভাবে আমরা তাহার সাড়া পাই না। অথচ ভগবানের সঙ্গে সম্পর্ক আমাদের সনাতন। আমাদের তৃষ্ণার সম্যক্ উপরতি শুধু পূর্ণস্বরূপে তাঁহার করুণার আত্যন্তিক উপলব্ধিতেই ঘটে। বস্তুতঃ দেহসম্পর্কিত ভোগ-সুখগত স্বার্থকেই আমরা সময় সময় তাঁহার করুণা বলিয়া ব্যাখ্যা করি এবং এইভাবে আপনাকে বঞ্চনা করিয়া থাকি। এ অবস্থায় ভগবানের সঙ্গে আমাদের ভাবের সম্বন্ধ নিবিড় হইয়া উঠিতে পারে না এবং তাঁহার আত্মীয়তাও সর্ব্বতোভাবে আমাদের জীবনে দীপ্ত হয় না। ধৃতির অভাবে মনের বৃত্তিগুলি আবার বিকৃতির মধ্যে গিয়া পড়ে। বিশ্বপ্রকৃতিতে দৃষ্ট অনিষ্ট বা বিকারকে তাঁহার লীলা বলিয়া স্বীকার করিতে আমাদের মন স্বভাবতঃই সঙ্কুচিত হয়। ভগবান্ আমাদিগকে কখনো সাজা দিতেছেন, কখনো দণ্ড দিতেছেন, আমরা এইরূপ ধারণা করিয়া লই।

কিন্তু ভগবান্ প্রেমময়। তাঁহার সব বিধান প্রেমেরই বিধান। আমাদিগকে দণ্ডদান করিবার জন্য তিনি নিশ্চয়ই ব্যস্ত হইয়া নাই। প্রকৃতপক্ষে অপার তাঁহার করুণায় ক্ষেত্রে দণ্ডের কোন প্রশ্নই উঠে না। প্রকৃত অধ্যাত্ম-জীবনে সাক্ষাৎ সম্পর্কে তাঁহার করুণার পরম স্পর্শ প্রথমে আসিয়া পড়ে। ভগবানের সে করুণা একেবারে মনের গোড়া ধরিয়া নাড়া দেয় এবং ক্ষুদ্র আসক্তির সব বাঁধ ভাসাইয়া তাঁহার কারুণ্য তারুণ্যের মহিমায় আমাদের দেহ, মন এবং বুদ্ধিকে আনন্দধারায় উচ্ছল ও উজ্জ্বল করিয়া তোলে। সে করুণার কণা-বিন্দু স্পর্শে জীবনের দৈন্য ঘুচিয়া গিয়া আত্ম-চৈতন্য উদ্ভিন্ন হয়। সেই রস-সঞ্চারে আমাদের নবজীবন লাভ হয়, যৌবনের রঙ্গে দেহ, মন তরঙ্গিত হইতে থাকে। তখন চরাচরে লাবণ্য ফুটিয়া উঠে। এইভাবে সাধক বিকার এবং বিপর্য্যাসের স্তর অতিক্রম করিয়া নিত্য-লীলার বিলাসে অনুপ্রবিষ্ট হন। সে অবস্থা লাভ করিলে আর উৎক্রমণ ঘটে না। সর্ব্বতোব্যাপ্ত সত্যকে যিনি উপলব্ধি করিয়াছেন, তাঁহার পক্ষে দেশ, কাল এবং পাত্রের বিভেদ প্রতীতি বিলুপ্ত হইয়া যায়। সাধক এই দেহেই নিত্য সত্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকেন।

কারুণ্য হইতে তারুণ্য এবং তারুণ্য হইতে লাবণ্যের রাজ্যে প্রবিষ্ট হইবার এই যে ধারা, এইটিকে ধরিয়া ফেলিবার উপরই অধ্যাত্ম-জীবনের মূলীভূত সত্য নির্ভর করিতেছে। এই তত্ত্ব যে সাধনার বলে মনের মূলে ব্যাপ্ত হয়, তাহাই আমাদিগকে প্রকৃতপক্ষে কৃতার্থ করিতে পারে। শ্রুতি, স্মৃতি ও পুরাণে এই তত্ত্বের নির্দ্দেশ এবং এই সত্যেরই উন্মেষ নিরূপিত হইয়াছে। শ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলা এই দিক হইতেই আমাদের পক্ষে একমাত্র সাধ্য বস্তু। সাম্প্রদায়িকতার কোন মনোভাব লইয়া আমি একথা বলিতেছি না। আমার মতে বেদ-বেদান্তের অন্তর্নিহিত অধ্যাত্ম-জীবনের সার্ব্বভৌম সত্যই এই লীলায় ব্যক্ত হইয়া পড়িয়াছে। ভগবানের লীলায় আমরা অনেকেই বিশ্বাস করি এবং গীতা-ভাগবত মানিলে সে বিশ্বাস করিতেই হয়। আমাদের জন্য ভগবানের এমন বেদনা অন্য কোন লীলাতে দেখা যায় নাই এবং সেই বেদনাসূত্রে চিন্ময় আনন্দরসের এমন উদ্দীপনাও আমরা অন্য কোন লীলায় পাই না। ভগবানের সার্ব্বভৌম প্রেম, তাঁহার পরিপূর্ণ স্বরূপ, অনবচ্ছিন্ন আনন্দরসের ধর্মে স্বচ্ছন্দ হইয়া এমনভাবে আর আমাদের কাছে ধরা

দেয় নাই। "বিষ্ণুতে তনুং-স্বাং" এই ঔপনিষদিক সত্য মহাপ্রভুতেই মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছে। এ লীলার অনুধ্যানে আমাদের জন্য তাঁহার বেদনায়,তাঁহার করুণার অরুণ স্পর্শে মনের সকল অন্ধকার দূর হয় এবং আমাদের জীবনের সকল দৈন্য নিরাকৃত হয়। বদান্যময় এই লীলা। এই লীলার মাধুর্য্য-বীর্য্য আমাদের জীবনে তারুণ্য-মহিমা বিস্তার করে এবং সেই তারুণ্য-ধর্ম্মে সব জগৎ লাবণ্যময় হইয়া যায়। কেন এমন হয়? এ লীলার অন্তর্নিহিত রস-তত্ত্বের সে নিগূঢ় কথা। গীতার পুরুষোত্তম তত্ত্ব বা পরব্রহ্ম কৃষ্ণতত্ত্ব হইতে গৌরাঙ্গ-লীলার বিবর্ত্ত বা পরিপূর্ত্তির অনুভূতির উপরই তাহা বিশেষভাবে নির্ভর করে। লীলার একান্ত অনুধ্যান এবং সংবেদনেই শুধু এই অনুভূতি লাভ করা সম্ভব। ফলতঃ যুক্তি-তর্ক আমাদের মনকে সে রাজ্যে লইয়া যাইতে পারে না! একমাত্র ভক্তি বা প্রগাঢ় আসক্তিতেই এই রসানুভূতি লাভ হইয়া থাকে। এ দেশের সাধকগণ বলিয়াছেন, যুক্তি-তর্ক মনের কোণে উঠিলেই রস উবিয়া যায়; কারণ সহজ সত্যকে আমরা যেখানে স্বীকার করিতে চাই না, সেখানেই যুক্তি-তর্কের ব্যাপার। ফলতঃআমরা যেখানেআপন জিনিষ পাই,বিচার আমাদের থাকে না। সেখানে মন বুঝিতে চায় না, শুধু মজিতেই জানে। শ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলায় আমাদের মনে এমন সনাতন আত্মতত্ত্বের স্ফুরণ ঘটে। সে স্ফুর্ত্তিতে আর যে বিকার ঘটিবে, এমন কোন পরোক্ষ প্রভাব মনের অবচেতন অন্তরেও থাকে না। অনাময় সে প্রকাশে এবং একান্ত আত্মীয়তার সেই অবিতর্ক বিভঙ্গীর রঙ্গময় বিলাসে বুদ্ধি,মন এবং দেহে ভগবানের প্রগাঢ় প্রসাদ-রস উপচাইয়া উঠে। আমরা মনের কোণে গূঢ় বেদনা বহন করিয়া যে রস বা আনন্দ আস্বাদন করিবার জন্য জন্ম হইতে জন্মান্তরে ঘুরিতেছি এবং যাহার অভাবে কোন কিছু ধরাধরি করিয়াই পুরাপুরি সান্ত্বনা পাইতেছি না, মহাপ্রভুর লীলায় সেই আনন্দরস সম্পূটিত আছে বলিয়াই সে লীলার অনুধ্যানে আমরা মনুষ্যত্বের পরম মর্য্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হই, পশুভাব আমাদের মধ্যে থাকে না। এইভাবে জীবনের কারবারে লাভবান্ হইবার কৌশলটি আমরা এই লীলার ছন্দে ধরিয়া ফেলি এবং আমরা কুশলের অবস্থা লাভ করি। "ক্ষীণতৃষ্ণঃ কুশলঃ"— সাংখ্যসূত্রের মতে ক্ষীণতৃষ্ণ হইলে কুশলের অবস্থা লাভ করা যায় অর্থাৎ জীবনের কারবারে সর্ব্ববিধ ক্ষতি এড়াইবার কৌশল অধিগত হওয়া সম্ভব হয়। "আশ্চর্য্য দ্রষ্টা কুশলানুশিষ্টঃ"—কুশল অবস্থায় সংস্থিত ব্যক্তিদের প্রভাবে

দ্রষ্টা আশ্চর্য্য দর্শন করিয়া থাকেন। ভাগবতে এই কুশলতত্ত্বের আরও বিস্তৃত ব্যাখ্যা দেখিতে পাওয়া যায়। কুশল ব্যক্তি অহঙ্কারকে অতিক্রম করিয়া থাকেন। ভাগবত বলেন, ভ্রমর যেমন বিভিন্ন ফুল হইতে কেবল মধুই সংগ্রহ করে, কুশল অবস্থায় মন সেইরূপ অণু হইতে মহৎ পর্য্যন্ত সকল স্থান হইতে শুধু সারটুকুই গ্রহণ করে, অর্থাৎ আপনভাবই আস্বাদন করিয়া থাকে। কিন্তু এসব কথাও অনেকটা নির্দ্দেশাত্মক অর্থাৎ এগুলির সাহায্যে শুধু সন্ধানই চলে, কিন্তু সত্যকে সাক্ষাৎ-সম্পর্কে ধরা-ছোঁয়ার মধ্যে আমরা পাই না। ভাগবতের দশম স্কন্ধে গোপীদের মুখে এই কুশলতত্ত্বের উন্মেষ বা লীলাসূত্রে অনুধ্যান অপেক্ষাকৃত উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। গোপীরা সেখানে শ্রীভগবানকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছেন, তুমিই সকলের একান্ত আপনার, তুমি সকলকে ভালবাস; তুমি সকলের নিত্য প্রিয়; কুশল যাঁহারা তাঁহারা তোমাতেই আসক্ত হইয়া থাকেন। তোমার জন্যই আমরা সনাতনবেদনা বুকে লইয়া ফিরিতেছি, তোমার মধুমাখা দৃষ্টিতে আমাদিগকে তুমি কৃতার্থ কর। আমাদের প্রতি প্রসন্ন হও। প্রকৃতপক্ষে এই কুশল তত্ত্বকে উদ্দীপ্ত করিবার কৌশলেই ভগবান আমাদের মনোরাজ্যে বিলসিত হইয়া থাকেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলার অনুধ্যানে সেগুলির সম্পর্কে যাওয়া আমাদের পক্ষে সম্ভব হইতে পারে। শ্রীভগবান্ গীতায় এই তত্ত্বের নির্দ্দেশ এবং এই লীলাবই উল্লেখসূত্রে বলিয়াছেন প্রেমের পথে যে সাধনা তাহার বিনাশ হয় না এবং এপথে লোকসান ঘটিবার কোন সম্ভাবনাও নাই। ইহাতে প্রত্যবায়ের ভয় থাকে না। এই ধর্ম্মের অণুমাত্রও মহাভয় হইতে উদ্ধার করে।

প্রকৃতপক্ষে বিভিন্ন শাস্ত্রে আত্মোপলব্ধির সম্বন্ধে আমরা যে সব বড় বড় কথা শুনিতে পাই এবং শুনিলেও দুরূহ এবং জটিল বলিয়া আমাদের পক্ষে যাহা জীবনে সার্থক করা সম্ভব হয় না, মহাপ্রভুর লীলার আলোকে সে-সব তত্ত্ব আমাদের পক্ষেও সরল হইয়া যায়। শাস্ত্রের নির্দ্দেশ আমাদের পক্ষে সোজাসুজি ধরা অনেক সময়ই সম্ভব হয় না। শাস্ত্র-নির্দ্দেশিত যুগোপযোগী সত্য এই লীলার আশ্রয়ে উদ্দীপিত হইয়া থাকে, নতুবা পরিবর্ত্তনশীল দেশ ও কালের আবর্ত্ত এড়াইয়া শ্রীভগবানের অব্যয় ভাবের সনাতনত্ব নির্ণয় করা সম্ভব নহে। মহাপ্রভুর লীলার মাহাত্ম্যে ভারতের সনাতন অধ্যাত্মতত্ত্ব উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। প্রেমের মহিমার কীর্ত্তন আমরা সর্ব্বত্রই শুনিতে পাই; কিন্তু প্রেম কর বলিলেই প্রেমিক

হওয়া যায় না। প্রেমের পথ ধর বলিলেই তাহা ধরাও সম্ভব নয়; প্রত্যুত সেজন্য লীলার জীবন্ত সংস্পর্শে যাওয়ার প্রয়োজন হইয়া থাকে। এই জীবন্ত সংস্পর্শ বলিতে মনের উপর সর্ব্বাঙ্গীণ প্রগাঢ় প্রভাবের কথাই আমি বলিতেছি, বিচারকে গুরুত্ব দিতেছি না। বস্তুতঃ যে সব বিষয় লইয়া আমাদের মন নড়ে চড়ে, আমাদের মনের নিতান্ত উপরের স্তরের সেই সব সংস্পর্শের মধ্যে প্রেম পাওয়া যায় না; প্রেমের পথে ডুবিয়া যাইতে হয়। প্রেমের পদ্মফুলটি যেখানে ফুটিয়া আছে, তাহার চারিদিক এমনভাবে শৈবালদামে আচ্ছন্ন থাকে যে, হাত-পা নাড়াচাড়া করিয়া সেখানে যাওয়া সম্ভব হয় না; ফুলটি পাইতে হইলে ডুব দিয়া সেখানে যাইতে হয়। বাস্তবিক পক্ষে প্রেমের অঙ্কুর মনের গূঢ় স্তর হইতে একান্ত রসের সংবেদনময় ধারায় সঞ্জীবিত হইয়া আমাদের জীবনকে বর্ণে, গন্ধে স্বচ্ছন্দ করিয়া পাপড়ি খোলে। মহাপ্রভুর লীলা আমাদের মনের মূলকে এমনই প্রগাঢ় ভাবে স্পর্শ করে এবং সমগ্র জীবনকে প্রাণরসে উজ্জ্বল করিয়া তোলে। এ পথে জীবনের মূলীভূত সত্যকে ধরিবার এমন একটি সহজ উপায় পাওয়া যায় যে, অহঙ্কৃত বিচারের আড়ম্বরে মনকে উদ্বেজিত করিয়া তুলিয়া বিপাকের অন্ধকার ও আবিলতায় আমাদিগকে পরিক্লিষ্ট হইতে হয় না। এইভাবে জীবনের সব সমস্যার সমাধানের পথ প্রশস্ত হয়।

জানি, অতিবুদ্ধির একটা আভিজাত্য আছে এবং আমাদের সমাজ-শীর্ষে তাহা উত্তরোত্তর জমিয়া উঠিতেছে। অনেক ক্ষেত্রে ইহা মনীষার মর্য্যাদাও লাভ করিয়া থাকে। যাঁহারা এই গুণের অধিকারী, সাময়িকতাকেই তাঁহারা বাস্তব বলিয়া বোঝেন; এবং বিষয়-প্রয়োজনই ইহাদের কাছে বড় কথা। ইঁহারা এদেশের অধ্যাত্ম-সত্যকে একান্ত অবাস্তব বলিয়া স্বীকার করিতে উপদেশও দিয়া থাকেন। আমার মনে হয়, চিত্তবৃত্তির সম্প্রসারণের অভাবই তাঁহাদের এমন ধারণার মূলে কাজ করে। আমরা নিতান্ত স্থূল বিচারের বিভ্রমে পতিত হই এবং সাময়িক সুবিধার মোহে অসত্যের সঙ্গে গোঁজামিল দিয়া আমাদের জীবনের সমস্যাগুলির সমাধানের জন্য চেষ্টা করি। ইহার ফলে, সেগুলি হয়ত তখনকার মত চাপা পড়ে, কিন্তু গোড়াকার গলদ থাকিয়াই যায়। এ পথে স্থায়ীভাবে সমস্যার সমাধান হয় না। প্রকৃতপক্ষে মানুষের চিত্তের এবং মনের সম্প্রসারণই প্রকৃত সংস্কৃতির উদ্দেশ্য। পশুদের

মনোবৃত্তির সম্প্রসারণে এই সামর্থ্য নাই। সনাতন সত্যের প্রতি সংবেদনশীলতার অভাব তাহাদের রহিয়াছে, এজন্য তাহারা স্থায়ীভাবে তাহাদের সমস্যার সমাধান করিতে পারে না। সে সাধনা তাহারা জানে না, ক্ষণিকতার বশেই অজ্ঞানভাবে তাহারা পরিচালিত হইয়া থাকে। কিন্তু মানুষের অবস্থা তো তেমন নয়। সনাতন সত্যের জন্য মানুষের বেদনা আছে, সাধনা আছে এবং সেই সাধনার পথেই সে আপনার জীবন সার্থক করিয়া তুলিতে চায়। প্রকৃত প্রস্তাবে হিংসা বা অপ্রেমের পথে আমাদের জীবনের কোন সমস্যারই এ পর্য্যন্ত সমাধান হয় নাই। পক্ষান্তরে হিংসা এবং বিদ্বেষের পথে অশেষবিধ সংক্লেশ উত্তরোত্তর বাড়িয়াই চলিয়াছে। ফলে, জগতের অবস্থা বর্ত্তমানে এমন হইয়া দাঁড়াইয়াছে যে, অহিংসা এবং প্রেমের পথে যদি আমরা এই সব সমস্যা সমাধানের জন্য চেষ্টা না করি, তবে মানব-সমাজ ধ্বংস হইয়া যাইবে।

আণবিক বোমার আবির্ভাবের পর জগৎ সত্যই একটা যুগ-সন্ধিস্থলে আসিয়া পড়িয়াছে। এখন হয় তাহাকে অহিংসা ও প্রেমের পথে বাঁচিতে হইবে, নতুবা আণবিক বোমার বজ্রানলে ধ্বংস পাইতে হইবে, হয় পশুত্ব না হয় মানবত্ব। সত্যই মানুষের দায়িত্ব আজ অপরিসীম হইয়া পড়িয়াছে। এই অবস্থার আশার দিকও একটা আছে। জগৎ জুড়িয়া মানুষের জাগরণ ঘটিতেছে। স্থায়ীভাবে মানব-সমাজের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের জন্য মানুষের চিত্ত আলোড়িত করিয়া আজ বৃহতের আহ্বান আসিতেছে। মানুষ কি সে ডাকে সাড়া দিবে না, এখনও কি সাময়িকতার মোহে পড়িয়া সে জীবনকে দুর্ব্বিহই করিয়া তুলিবে? পশুত্বের দৈন্যে মনকে গুটাইয়া লইয়া মানুষ কি তাহার অন্তর-ধর্ম্মকে অস্বীকার করিয়া দেবতার অভিশাপের উত্তাপে দগ্ধ হইয়াই চলিবে? ইহা সম্ভব বলিয়া মনে হয় না। কারণ, লীলার প্রকাশ এবং বিলাস মানুষকে ছাড়িয়া নয় বরং মানুষেরই জন্য। শ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলা-মাহাত্ম্য মানুষকে নূতন জীবনে প্রতিষ্ঠিত করিবে, ইহা ধ্রুব সত্য।

শুধু সেই কথাটাই বলিতে চাই। প্রকৃতপক্ষে আমার কথা আমি কিছু লিখিতে বসি নাই। সেকথা বলিবার মত কিছুই নয়; বরং উপেক্ষারই বিষয়। দয়ার ঠাকুর মহাপ্রভুর লীলার মাহাত্ম্য আমার ক্ষুদ্রশক্তি অনুসারে কিছু কীর্ত্তন করাই আমার উদ্দেশ্য। নিজের ওজন আমি বেশই জানি। আমার মত সামান্য একটা পোকা-মাকড় মরিলে কাহারো কোন ক্ষতি হয়

না, এ সত্যটুকু বুঝিবার জন্য আমার মত লোককেও বিশেষ ভাবনায় পড়িতে হয় না। আমি খুবই বুঝি, আমার একখানা পা কাটা গিয়াছে, এমন কত লোকেরই যায়। প্রকৃতপক্ষে মহাপ্রভুর নামের মহিমা এবং তাঁহার ভক্তের কৃপার গরিমা আমাকে এই কাজে প্রণোদিত করিয়াছে। এত কৃপা, এত দয়া, ভগবান্ কোন দিন বুঝি করেন নাই, আজ শুধু এই কথাটিই বলিবার জন্য মন-প্রাণ আকুল হইয়া উঠিতেছে এবং আমি নিতান্ত নির্লজ্জের মত আচরণে প্রবৃত্ত হইয়াছি।

রক্ষা করো এ নহে মোর প্রার্থনা

'রাখে কৃষ্ণ মারে কে', বাঙলায় এইরূপ একটি প্রবাদ আছে। কোন বড় রকমের দুর্ঘটনা হইতে উদ্ধার পাইলে, যাঁহারা আমাদের কল্যাণকামী, 'ভগবান্ আপনাকে রক্ষা করিয়াছেন' তাঁহাদের মুখে একথা আমরা প্রায়ই শুনিতে পাই। আমাদের কল্যাণ সম্বন্ধে ইঁহাদের আন্তরিকতার সম্পর্কে অবশ্য কোন সন্দেহের কারণ নাই, তথাপি আমার নিজের কথা বলিতে গেলে সমস্ত অন্তর দিয়া ইঁহাদের ঐরূপ শুভেচ্ছাকে অন্ততঃ ভাষার দিক হইতে স্বীকার করিয়া লওয়া আমার পক্ষে সম্ভব হয় না। কারণ, ভগবান রক্ষা করিয়াছেন, এমন কথা বলিলে ভগবানের প্রতিকূলতা করিতে সমর্থ এইরূপ কোন শক্তিকেও স্বীকার করিয়া লওয়া হয়।

এই ধরণের কথা শুনিলে অনেক সময় আমার মনে বরং কষ্টই হইয়া থাকে। মনে হয়, ভগবান্ যদি প্রাণটা রক্ষা করিয়া থাকেন, তবে পা-খানাই বা কেন তিনি রক্ষা করিলেন না? তিনি যদি সত্যই দয়াময় হন, তবে এটুকু দয়াও তো তাঁহার নিকট হইতে আশা করা যায়। সুতরাং আমাদের এইরূপ ধারণার মধ্যে বিচারের ভুল রহিয়াছে। আমরা এ ক্ষেত্রে ভগবানকেই স্বীকার করিতেছি না। আমাদের দেশের সনাতন সংস্কৃতি ভগবান্ ছাড়া অন্য শক্তির অস্তিত্ব স্বীকার করে না। ভগবানই সকল শক্তির মূলে। যেখানে যত কিছু শক্তি আছে, সেগুলি ভগবৎ-শক্তিরই অভিব্যক্তি ব্যতীত অন্য কিছু নহে। বিশ্বও তিনি, বিশ্বাতীতও তিনি। মায়াও তিনি, মায়াতীতও তিনি। সুতরাং কোন্ শক্তির প্রতিকূলতা হইতে তিনি আমাদিগকে রক্ষা করিবেন? ফলতঃ তাঁহার একান্ত আশ্রয়েই আমরা সর্ব্বদা অবস্থান করিতেছি এবং তিনি

আমাদিগকে সব সময়ই রক্ষা করিতেছেন। প্রতি মুহূর্ত্তে আমাদের অস্তিত্বের অনুভূতি তাঁহাকে অবলম্বন করিয়াই হইতেছে। বাহিরের বিপর্য্যয়ের মধ্যেও আমাদের অস্তিত্ব সম্বন্ধে, আমাদের এই যে অনপেক্ষ চেতনা বা সম্বিৎ ভগবৎ-শক্তির প্রজ্ঞানময় প্রকাশেই তাঁহার উপলব্ধি ঘটিয়া থাকে। আমাদের জন্ম নাই, মৃত্যু নাই, মুখে মুখে একথা আওড়াইলেই আমরা মরণের ভয় ভুলিতে পারি না এবং ভগবান্ যত কিছু করিতেছেন, সবই আমাদের মঙ্গলের জন্য এ সত্যও আমাদের ধারণায় আসে না। বাস্তবিক-পক্ষে আমাদের ব্যষ্টি জীবনের ধারা যখন ব্যাপ্ত জীবনের সঙ্গে মিশে বিশ্বের সঙ্গে ভগবানের যোগের সূত্রটি আমরা তখনই ধরিতে পারি। তখন মরণ বলিতে কোন কিছু থাকে না। বিশ্বের জীবনের সঙ্গে সোজাসুজি মিশিয়া অর্থাৎ অপরের জীবনের মধ্যে নিজের জীবনকে উপলব্ধি করিয়াই আমরা তখন জীবনকে প্রদীপ্ত বা নিত্য ভাবে পাই। জীবনের আকর্ষণে যে জীবন দেয় সে জীবনকেই লাভ কবিতে পারে। কার্য্যতঃ অনন্ত জীবনের ধারার সঙ্গে আমাদের ব্যষ্টি জীবনের বিচ্ছিন্নতা-বোধই আমাদিগকে দৈন্যে অভিভূত করিয়া ফেলে এবং মরণের বিভীষিকায় আমরা আড়ষ্ট হইয়া পড়ি। ভগবানের সব লীলাই জীবন্ত। যেখানে তাঁহার যত শক্তি কাজ করিতেছে সবই জীবনময়। ঋষিরা বলিলেন, আকাশে প্রাণ বোধবান্ হইতেছে। মন দিয়া স্পর্শ করিতে পারিলেই তাহা রূপ ধরিয়া উঠে এবং আমাদের ব্যষ্টি জীবনের ক্ষুদ্র পরিধি ছন্দোময়, অমৃতময়, আনন্দময় উদার সত্তার মধ্যে বিস্তার লাভ করে। যে কথাটি বলিতে চাই বোধ হয় তাহা ভাল করিয়া বলা হইল না। সুতরাং আরও একটু ভাঙ্গিয়া বলিতে চেষ্টা করা দরকার। কথাটা যাহা বলিতে চাই, তাহা এই যে, মহাপ্রাণ ব্যক্তিরা যখন অপরের জন্য জীবন দান করেন, তখন তাঁহারা অনন্ত এবং অখণ্ড জীবনের জ্যোতির্ম্ময় লীলাই প্রত্যক্ষ করেন। মরণের কালো ছায়া তাঁহাদের মনের উপর হইতে সরিয়া যায়। মরণের ভ্রান্তি ভুলানো ভগবানের এই জ্যোতির্ম্ময় লীলা বিশ্বের সর্ব্বত্রই পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে। "ব্রহ্ম হ'তে কীট পরমাণু সর্ব্বভূতে সেই প্রেমময়।" আমাদের মনের মূলে অব্যয় জীবনের এই ছন্দের সম্বন্ধ আমরা যখন অনুভব করি তখন রক্ষা পাইবার বা ভগবানের নিকট তাহা প্রার্থনা করিবার কোন প্রশ্নই আমাদের থাকে না।

বাস্তবিক পক্ষে ব্যাপ্ত-জীবনের অনুভূতির যেখানে অভাব সেখানেই রক্ষার প্রশ্ন দেখা দেয়। ইহা শুধু দেহ সম্পর্কিত স্বার্থক্লিষ্ট অপরিপুষ্ট জীবনেরই ব্যাপার। ভগবান্ আমাকে রক্ষা করিয়াছেন, তিনি আমাকে প্রাণে বাঁচাইয়াছেন, এগুলি আমাদের বিবেকমূঢ় বিচার মাত্র।

প্রকৃতপক্ষে দেশ এবং কালের গণ্ডির মধ্যে আমাদের যে পরিচ্ছিন্ন জীবন, তাহা স্থায়ী হইবে না এবং এ দীপ একদিন নিভিবেই। যদি ইহাকে রক্ষার জন্য ভগবানের কাছে যাইতে হয়,তবে প্রতিনিয়ত প্রতিকূল শক্তির কাছে ভগবানকে পরাজয় স্বীকার করিতে হইতেছে এ সিদ্ধান্তও ধ্রুব হইয়া দাঁড়ায়। এরূপ অবস্থায় ভগবান্ সর্ব্বশক্তিমান, তিনি কৃপাময়, দয়াময়, এসব কথার কোন সার্থকতাই থাকে না। বস্তুতঃ ভগবানই রক্ষাকর্ত্তা ; কিন্তু তাঁহার রক্ষা বস্তুটা এরূপ নয়। তিনি ক্ষুদ্র জীবন হইতে আমাদিগকে বৃহত্তর জীবনে লইয়া যান। আমাদের ক্ষুদ্র জীবনকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া কিংবা সেই জীবনের রক্ষা ব্যাপারকে বড় করিয়া দেখিয়া আমরা ভগবানের স্বরূপ-ধর্ম্মকেই অস্বীকার করিতেছি। কে না জানে যে, আমাদের এই যে দেহ, ইহা চিরদিন থাকিবে না এবং ইহা পারক্য, ইহা ক্ষণভঙ্গুর। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও এই দেহের সাহায্যে নিত্য সত্য বস্তু লাভ হইতে পাবে। আমাদের এই দেহের প্রয়োজন সেই সত্যকে লাভ করা। একথা ভুলিয়া দেহকে রক্ষা করিবার প্রশ্নকে বড় করিয়া তুলিলে পরিশেষে বিড়ম্বনাই ভোগ করিতে হয়। ফলত মানুষেব কাল-পরিমিত জীবন অতি সামান্য। নিম্নতর জীবজন্তুদের মধ্যে অনেকে মানুষের চেয়ে অনেক বেশী দিন জীবন ধারণ করে। সুতরাং বেশী দিন বাঁচিয়া থাকিবার উপরই মানুষের জীবনের সার্থকতা নির্ভর করে না। প্রকৃতপক্ষে মানুষ তাহার ক্ষুদ্র জীবনের পরিমিতিকে অতিক্রম করিয়া অনন্ত জীবনকে উপলব্ধি করিতে সমর্থ। এইখানেই তাহার জীবনের সার্থকতা। ইহাও সত্য যে, অনন্ত জীবনের এই সূত্রের সঙ্গে যুক্ত হইবার জন্য মানুষের পক্ষে ইন্দ্রলোক, চন্দ্রলোক বা অন্যত্র কোথায়ও যাইবার প্রয়োজন হয় না। অনন্ত জীবনের উৎস ধারা তাহার এই পরিমিত জীবনের চারিদিকেই প্রবাহিত হইতেছে এবং ক্ষুদ্র স্বার্থের খাঁটি ছাড়িয়া একবার নাড়া দিয়া উঠিয়া সেই উৎস ধারার মুখে মনকে ধরিতে পারিলেই আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়া যায়।

কিন্তু আমাদের মনের গতি বড়ই সূক্ষ্ম এবং বিচিত্র, পরোক্ষতাকে মন কিছুতেই স্বীকার করিতে চায় না। সে প্রত্যক্ষতা চায়। গাছের দুইটি পাখীর চেয়ে সে হাতের একটি পাখীকেই বড় বলিয়া বুঝে। এরূপ অবস্থায় পরিব্যাপ্ত জীবন-লীলার সংবিত্তি ব্যতীত অর্থাৎ দেহ, মন, প্রাণ এ সকল দিয়া সাক্ষাৎ-সম্পর্কে তেমন জীবনের অব্যবহিত অনুভূতি ছাড়া ক্ষুদ্র জীবনের হিসাব মানুষ ভুলিতে পারে না। আবার অনন্ত জীবনে দ্যোতমান পরমতত্ত্ব তাহার অন্তরে একান্তভাবে স্ফূর্ত্ত হইলে ক্ষুদ্রের মোহ হইতে সে স্বভাবতঃই নিষ্কৃতি লাভ করে। অনন্ত জীবনের মূলীভূত এই আত্মচেতনার অনুধ্যানের পথেই আমাদের অধ্যাত্ম সাধনার আরম্ভ হয়। যেখানে যত জীবন, সে সকলের যিনি আপন, তাঁহার সংবেদনে সাধকগণ দিব্য জীবনে প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকেন। এই যে সংবেদন, ইহার মূল কোথায়, ইহা জাগেই বা কখন এবং কেন জাগে? এদেশের শাস্ত্রে এইসব জটিল প্রশ্নের সমাধান রহিয়াছে। তন্ত্রের মতে এক মহাভাবই উপাধিভেদে নানারূপে বিক্রীড়িত হইতেছে। সাধক যখন এই সত্য উপলব্ধি করেন, তখন ভাব-ভেদ তাঁহার দূর হইয়া যায়। সে অবস্থায় তিনি বুত্থান-পথে অদ্বয় ভাব বা ভাবাদ্বৈতের রাজ্যে অনুপ্রবিষ্ট হন। সাধকের মনের মূলে এই অদ্বয় ভাবের প্রভাব বা আত্মভাব অব্যবহিত আপ্যায়নে ক্রিয়াদ্বৈতের অনুভূতিকে জাগ্রত করে এবং এই ক্রিয়াদ্বৈত আরও প্রগাঢ়তা লাভ করিয়া দ্রব্যাদ্বৈতে পরিণত হয়। আমাদের সাধারণ জীবনেও যে সব বস্তু আমাদের প্রিয় এবং কাম্য সেগুলির সম্বন্ধেও ন্যূনাধিক পরিমাণে এইরূপ তন্ময়তা দেখা দিতে পারে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে অত্যন্ত অস্ফুট আকারে হইলেও কতকগুলি সাদৃশ্য লক্ষণ অবলম্বন করিয়াই সাধারণতঃ মনের সংবেদনে এইরূপ ভাবসাম্যের অনুভূতি সম্ভব হয়। যেখানে তেমন সাদৃশ্য লক্ষণ থাকে না, সেখানে স্ফুরণও হয় না। কিন্তু মহাভাবের স্পর্শে মনে যে সংবেদন জাগে সেখানে মনোবৃত্তির পরিস্ফূর্ত্তি সীমাবদ্ধ থাকা সম্ভব নয়। মহাভাব সকল ভাবের মূলে, সুতরাং সে ভাবের বিন্দুমাত্র স্পর্শেও সর্ব্বত্রই মনের সংবেদনে আত্মতত্ত্বের সাদৃশ্য লক্ষণ উদ্বুদ্ধ হইয়া থাকে। বস্তুতঃ মহাভাবের সঙ্গে কোন রকম সম্পর্ক সূত্রে মমত্ববোধ যদি মনের তারে জড়াইয়া যায় তবে সকল স্থানেই মমত্ব স্ফূর্ত্ত হয়। এই অবস্থায় অভাবের কোন অনুভূতি রহে না সুতরাং প্রতিকূলতার প্রতীতিও বিলুপ্ত হইয়া যায়। বুদ্ধির ক্রিয়া লোপ পাইয়া আত্মার ক্রিয়া তখন সর্ব্বত্রে

ব্যাপ্ত হয়। কারণ, বুদ্ধি নিশ্চয়াত্মিকা বৃত্তি হইলেও অভাবাত্মিকা। অন্তর ভাবের অনুভূতির আলোকে বুদ্ধির অভাবাত্মিকা বৃত্তি বিলুপ্ত হইলে তাহার ব্যবসায়াত্মিকা বৃত্তির স্ফূরণ ঘটে। ঐ অবস্থায় মনের সহিত যেখানে যত সঙ্গ ঘটে সর্ব্বত্র সঙ্গতি উপলব্ধি হয়। সাধক বহিঃপ্রকৃতির বিপর্য্যয় তখন আর দেখিতে পান না। পক্ষান্তরে তিনি সর্ব্বত্র আনন্দদায়িনী মায়ের আপ্যায়নই অনুভব করিয়া থাকেন। এই আনন্দ লীলার সান্দ্র স্পর্শে যাঁহার অন্তর উদ্দীপ্ত হইয়াছে, তাঁহার পক্ষে ভগবানের কাছে রক্ষা ভিক্ষা করিবার কোন প্রশ্নই উঠে না। ভগবৎ-লীলার একান্ত ঘনিষ্ঠতায় তিনি সমভাবে এবং সর্ব্বত্র ইষ্টই দেখেন এবং সর্ব্বাবস্থায় অভীষ্টসেবার রঙ্গময় জীবনে প্রতিষ্ঠিত হন।

এই মহাভাব, মোটামুটি প্রেমকেই বুঝায়; কিন্তু প্রেম বলিতে আমরা সাধারণতঃ যাহা বুঝি, তাহার মধ্যে শব্দটির অর্থের প্রকৃত ব্যঞ্জনা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পাওয়া যায় না। মহাভাব প্রেমের পরম কাষ্ঠা। অন্য কথায় প্রেমের সমুন্নতি সীমা! প্রেম মানুষের জীবনে সম্ভব হইতে পারে,কিন্তু মহাভাব মানুষে সম্ভব হয় না। মানুষ ইহার স্পর্শটুকু পাইতে পারে মাত্র। প্রত্যুতঃ মহাভাব ভগবানের একান্ত যে অন্তরঙ্গ শক্তি, তাঁহারই অধিকারে। বৈষ্ণব শাস্ত্রকারদের মতে মহাভাবস্বরূপা শ্রীরাধা ঠাকুরাণী। মহাভাবে তাপ আছে, ঝাঁপ আছে, ভগবানের আনন্দরস-মাধুর্য্য অনঙ্গরঙ্গে বিভঙ্গিত করিবার মত তাহার তরঙ্গ আছে। প্রকৃতপক্ষে এই মহাভাবময়ী শক্তিকে আশ্রয় করিয়াই ভগবানের ভগবত্তা, "রসো বৈ সঃ, যং লব্ধা আনন্দী ভবতি।" এই মহাভাবের তরঙ্গরঙ্গে বিলসিত ভগবৎ-তত্ত্বের বিস্তারকে জীবনে আস্বাদন করাই অধ্যাত্ম সাধনার উদ্দেশ্য এবং সাধ্যস্বরূপে সেই তত্ত্বে প্রতিষ্ঠাতেই সাধকের পক্ষে ভাগবত-জীবন লাভ হয়। পরন্তু সাধক নিজে কিছুতেই এই পর্য্যায়ে উঠিতে পারেন না; তিনি তাহা চাহেনও না। ভাগবত বলেন, এই মহাভাব-বিলসিত ভগবানের সেবাতেই দিব্য জীবনের স্ফুরণ ঘটে এবং এমন জীবন লাভ করিতে পারিলেই প্রকৃত রক্ষা পাওয়া হইল। এ রক্ষার ক্ষেত্রে সর্ব্বাবস্থায় ভগবানের অনুগতি লাভ হয়। এই অনুগতির পথে নিত্য প্রীতির সঞ্চারেই ভগবানের প্রকৃত রক্ষয়িতৃত্ব বা পতিত্বের উপলব্ধি হইয়া থাকে। "সমন্ততঃ পাতি," ভাগবতের মতে এই জন্যই তিনি পতি। সাধকের মন এ অবস্থায় ভগবানের আনন্দময় সত্তার সর্ব্বতোমুখী সংবেদনে একেবারে বিদ্ধ হইয়া যায়। "মধুরিম-সদ্ধিতঃ, বরতন্তু-

স্পন্দিতঃ, ভুজযুগ-টঙ্কৃতঃ, তনু-পরিরম্ভিতঃ" রসময় এমন দেবতাই ভক্তের আরাধনার ধন। তাঁহাকে পাইলে অন্য দিকে ঝোঁক থাকে না, চোখ একেকেই দেখে, হৃদয় একেকেই রাখে, প্রাণরসে এ.কর সঙ্গেই তখন মাখামাখি এবং সমগ্র জীবনে একের রঙ্গই চাখাচাখি চলিতে থাকে। শ্রীভগবান্ ভাগবতে উদ্ধবকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছেন, মানুষের মন যখন গুণময়ী প্রকৃতির বিক্ষোভের মধ্যে পড়ে, মানুষ তখনই অশান্ত, বিভ্রান্ত এবং বন্ধনযুক্ত হয়। পক্ষান্তরে পরম পুরুষ ভগবানের সঙ্গে যুক্ত হইলেই মানুষ জন্ম, বন্ধন হইতে মুক্ত হয়। এই যে পরম পুরুষ, ইনিই পুরুষোত্তম। ইঁহাকে পাইলে অক্ষর প্রকৃতি জীব এবং পরিবর্ত্তনশীল ক্ষর প্রকৃতি এই দুইয়ের মধ্যে বিরোধ থাকে না। আমরা তখন বুঝিতে পারি তিন লোক উজ্জ্বল করিয়া ভগবান্ তাঁহার অব্যয় মাধুরীতে ভর্ত্তৃত্বের ভাব ব্যক্ত করিতেছেন। প্রকৃত পক্ষে যিনি এমন রসময়, আনন্দময়, আমাদের মনকে সর্ব্বভাবে সঙ্গ তিনিই দিতে পারেন। এই সঙ্গ হইতে রঙ্গ এবং রঙ্গ হইতে ভগবানের অনঙ্গ-দীপনের অনন্ত মাধুর্য্য সর্ব্বত্র বিকীরিত হয়। এই জগৎ পর্য্যন্ত ছড়াইয়া তাঁহার প্রেমমাধুরী আমাদের সঙ্গ দেয়, এমনই তাঁহার কারুণ্য। সেই সঙ্গ-লাভে মনোধর্ম্মের সমগ্রভাবে যে উজ্জীবন ঘটে তাহাকেহ তারুণ্য বলিতে হয় এবং সেই তারুণ্য ধর্ম্মে উপচিত রসোচ্ছ্বাসের বিলাসে আমরা একান্ত আত্মনিবেদনের পথে তাঁহার লাবণ্য-লীলায় প্রতিষ্ঠিত হই। সে অবস্থায় জরা নাই, মৃত্যু নাই; অদ্বয় আনন্দ সর্ব্বত্র উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতেছে। এই অবস্থা লাভ করিলে তবে সত্যই আমরা বাঁচিয়া গেলাম; প্রকৃত রক্ষা পাইলাম তখন। পক্ষান্তরে এই নিত্য সত্যকে বিস্মৃত হইযা নশ্বর জড় দেহ এবং সেই দেহ-সম্পর্কিত ভোগবাসনা অক্ষুন্ন রাখার নিক্তিতেই যদি আমরা ভগবানের কৃপা এবং আমাদিগের রক্ষা কবিতে তাহার শক্তির বিচার করিতে বসি, তবে তাঁহার সম্বন্ধে অবিচারই করা হইবে। এপথে কোনদিনই রক্ষা পাওয়া যায় না এবং সেজন্য ক্যাণ্ডলামি করা নির্বুদ্ধিতা মাত্র।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলা বুদ্ধির এই বিড়ম্বনা হইতে আমাদিগকে উদ্ধার করে। মহাভাবে তাঁহার তনু-সুবলিত। ভক্ত, ভাগবত এবং ভগবান্, এই তিন তত্ত্ব একত্রে তাঁহার প্রেমের লীলায় পরিস্ফূর্ত্ত। কারুণ্য, তারুণ্য এবং লাবণ্য সে লীলার অনুধ্যানে উদ্ভিন্ন। সঙ্গ রঙ্গ এবং অনঙ্গ-রসে

মনকে নিষিক্ত করিয়া সে লীলা নিত্য জীবন ও যৌবন ধর্ম্মকে জাগ্রত করে।

এ দেহ থাকিবে না; কিন্তু দেহ থাকিবে ভাবযোগ্যভাবে—দেহী নিত্য। যে দেহ দ্বারা নিত্য সত্যের আস্বাদন হয় এবং অনন্ত জীবনের উপলব্ধি ঘটে, সেই দেহেরই প্রয়োজন। নিত্য সত্যের ভাবনাই প্রকৃতপক্ষে আমাদের মন, দেহ এবং ইন্দ্রিয়-চেতনার মূলে রহিয়াছে। বস্তুতঃ সে দেহ তারুণ্য এবং লাবণ্যে উজ্জ্বল; কার্পণ্যে তাহা বিকল নয়, সুতরাং নিজের রক্ষার দিকে সে দেহ তাকায় না, পরন্তু বিশ্বের বীজস্বরূপ যে আনন্দ-লীলা, অদ্বয় চিন্ময় রসের যেখানে বিলাস, তাহাতেই সে মজিতে চায়। দুই দিনের এই জড়দেহ রক্ষার জন্য ব্যগ্রতার বিবেকহীনতা এবং দৈন্য হইতে শ্রীভগবানের প্রেমের লীলা আমাদিগকে মুক্ত করুক এবং নিত্য সত্যের সঙ্গে যুক্ত হইবার উপযোগী দেহের উদ্দীপনা তিনি আমাদের মধ্যে জাগ্রত করুন। "মহাভাব-দ্যুতি-সুবলিত তনু নৌমি কৃষ্ণস্বরূপম্।"

রঙ্গ বিনা নাহি অঙ্গ

যাহার প্রতিকার নাই, তাহাকে স্বীকার করিয়া লইতেই হয়। অদৃষ্টে যখন কষ্ট আছে তখন সহ্য করিয়া যাইতেই হইবে, এমন যে একটা গা-ছাড়া ভাব ইহাকে স্থৈর্য্য বলা চলে না, ধৈর্য্য বলিলেও ভুল করা হয়। প্রকৃত পক্ষে ইহা নৈরাশ্য এবং অবসাদেরই একটা প্রবৃত্তি এবং অনেক ক্ষেত্রে তমঃ গুণেরই লক্ষণ। এ অবস্থায় মনের কোণে উদ্বেগ অনবরত উঁকিঝুঁকি দিতে থাকে এবং মনোবৃত্তির বলিষ্ঠ বিকাশ এ অবস্থায় সম্ভব নয়। সাধারণ মানুষকে অদৃষ্টের দোহাই দিয়া নৈতিক গোছের এই ধরণের উপদেশ অনেক ক্ষেত্রে দেওয়া হয়। কিন্তু নৈতিক বল এ পথে মনের মূলে গড়িয়া তোলা যায় না। বস্তুতঃ আত্যন্তিক দুঃখ নিবৃত্তির পথ ইহা নয়। দুঃখ-নিবৃত্তি ভাব-পদার্থে ঘটিয়া থাকে এবং একান্ত লাভেই তাহা সম্ভব। একান্ত লাভের একটা অনপেক্ষ প্রভাবই সাধকের জীবনের মূলে কাজ করে। সেই প্রভাবের অনাময় প্রকাশে নিজের মনকে মুক্ত করিয়া দিয়া তিনি বাহিরের সব বিপর্য্যয় হইতে অনাসক্ত অবস্থা লাভ করিয়া থাকেন। বিপর্য্যয় সে অবস্থায় থাকে না এমন নয়, সেগুলি থাকে; কিন্তু সাধককে সে বিপর্য্যয় স্পর্শ

করিতে পারে না। পক্ষান্তরে সব বিপর্য্যয় এবং বিকারের ভিতর দিয়াই একান্ত লাভের স্বরূপতত্ত্বে বিধৃত আত্মনিষ্ঠিত রসময় সত্তার সন্তর্পণ এবং সন্নিকর্ষই তিনি প্রতিনিয়ত আস্বাদন করিয়া থাকেন। আত্মার যে রাজ্য হইতে আনন্দরসের প্লাবনে বিশ্ব-জগতের উজ্জীবন ঘটিতেছে, সাধকের মন সর্ব্বতোভাবে সেই রাজ্যে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া পড়ে। এই অনুপ্রবেশকে আত্মনিবেদন বলা যায়। আত্মনিবেদনের এই পথে পরম আনন্দসত্তার লীলার ধারার সঙ্গে সাধকের প্রাণের সাড়া একীভূত হইয়া থাকে। এমন একীভূত হইয়া যাওয়ার অর্থ সাধক সেই সত্তাতে নিজের সত্তাকে হারাইয়া ফেলেন, এমন কথা বলা যায় না, কারণ তাহা হইলে তাঁহার সনাতনত্বকেই অস্বীকার করিতে হয়। প্রকৃতপক্ষে সাধক সে অবস্থায় সর্ব্বত্র সেই আনন্দময় পরমসত্তার রসময় প্রকাশ এবং বিলাসের প্রাচুর্য্যে একেবারে ডুবিয়া যান। ভেদাভেদের অর্থাৎ ভেদের মধ্যে অভেদ এই অবস্থা।

রস-লীলার এই প্রাচুর্য্যে ও বীর্য্যে ভগবান্ মধুর এবং মধুর বলিয়াই তিনি গোপন। স্ব-মাধুর্য্যে সর্ব্বত্র তাঁহার রঙ্গ-লীলা বা গোপন চাতুরী চলিতেছে। এই চাতুরীটি ধরিয়া ফেলাকেই ভক্তিশাস্ত্রে জ্ঞান বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে —'জ্ঞানং স্বাত্মরহঃপ্রকাশং।' ভগবানের গোপন খেলার এই রহস্যই ভক্তি যোগ। ভক্তের কাছে ভগবান মধুব এবং মধুর বলিয়া তাঁহাতে গোপনত্ব কিছু থাকিবেই। ফলতঃ তাঁহার গোপনত্বকে সংবেদনসূত্রে ঘেঁষিয়া মিশিয়া নিবিড়ভাবে আস্বাদনের জন্য আকুলতার পথেই তাঁহার অমৃতত্ব উন্মুক্ত হয়। বাস্তবিক পক্ষে ভগবানকে যদি ধরিয়া ফেলিয়া জানিয়া বুঝিয়া শেষ করা যাইত, তবে তাঁহার মধুরত্ব কিছুই থাকিত না। এই প্রাকৃত জগতেও কোন বস্তু যতক্ষণ আমাদের পক্ষে মধুর, ততক্ষণ তাহার গোপনত্বই তৎসম্বন্ধে আমাদের ঔৎসুক্য সঞ্চার করে। গোপনীয়তার মধ্যে যে রহস্য থাকে, তাহাকে আশ্রয় করিয়াই সে বস্তু আমাদিগকে আকর্ষণ করিয়া থাকে। ভগবানের পক্ষেও ইহাই। তিনি রহস্যময় এবং সেই জন্য তিনি আমাদের প্রিয় বা প্রেষ্ঠ। তিনি গুহাহিত এবং গহ্বরেষ্ঠ বলিয়াই তিনি চিকীর্ষিত। যে শক্তির আশ্রয়ে ভগবান্ এমন গোপন থাকেন, তিনি আমাদের সঙ্গে এমন-ভাবে লুকোচুরি খেলেন সেই শক্তির চাতুরীর চমকে ভক্তকে পথের বাহির হইতে হয়। সেই শক্তির সঙ্কেতময় সরস অভিব্যক্তির সঙ্গে প্রাণের

ধারার সঙ্গতি-সূত্রেই রহস্যময় সেই দেবতার খোঁজে বাহির হওয়া আমাদের পক্ষে সম্ভব হইয়া থাকে। প্রকৃতপক্ষে এই গোপনত্বের শক্তি ভগবানেই অন্তর্নিহিত। 'হিরণ্ময় পাত্রের দ্বারা সত্যের মুখ আবৃত রহিয়াছে, হে জ্যোতির্ম্ময় দেবতা, সেই আবরণ উন্মোচন কর—সত্য ধর্ম্ম দীপ্তিলাভ করুক। উপনিষদে ঋষিদের এই প্রার্থনাতেও দেখা যায়, আবরণকে তুচ্ছ করা হয় নাই। বস্তুতঃ বিশ্ব-প্রকৃতির আবরণকে মনোময় রহস্যস্বরূপে গ্রহণ করিয়াই ঋষিগণ রসময় দেবতার আত্মসত্তার সুনিবিড় আকর্ষণকে উপলব্ধি করিয়াছেন। এ আবরণের ভিতর তাঁহারা প্রাণধর্ম্মের উজ্জীবক এমন রসস্পর্শ অনুভব করিয়াছেন যাহার প্রভাবে সত্যের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা লাভের জন্য তাঁহাদের চিত্ত আকুল হইয়া উঠিয়াছে। এমন রস-সংবেদনে ভগবানের প্রজ্ঞানময় প্রকাশই তাঁহারা কামনা করিয়াছেন। বিশ্বের রূপে রসে, বর্ণে, গন্ধে তাঁহারা বিশ্বাতীত দেবতার অন্তরঙ্গ শক্তির বিভঙ্গী বা সঙ্কেত উপলব্ধি করিয়াছেন। এই ইঙ্গিত বা সঙ্কেত ভগবানের মাধুর্য্য উপলব্ধির মর্ম্মকথা এবং গূঢ়তাই এ-লীলায় প্রাণ-পদার্থ বলা যায়।

সাধারণ মানুষের কাছে ভগবানের এই যে গোপন-লীলা, ইহাই বিপর্য্যয়-রূপে প্রতীত হইয়া থাকে। তাহাদের কাছে এগুলি নিয়তি, কাল, জন্ম, মরণ প্রভৃতির আকারে দুর্জ্জেয় প্রশ্নরূপে দেখা দেয়। দৃষ্টি যেখানে অন্ধকারে আচ্ছন্ন, মনের বল সেখানে পাওয়া যায় না এবং আনন্দের সেখানে উন্মেষ ঘটে না। সে অবস্থায় অবসাদ আসিবে, ইহা স্বাভাবিক। বস্তুত অদৃষ্টের দোষ, ভগবানের দোষ, এসব ধারণা আমাদের মনে এই অজ্ঞানতার জন্যই সৃষ্টি হয়। এ অবস্থায় মানুষ তাঁহার জীবনের নিত্য বিত্ত হারাইয়া ফেলে; আশ্রয়হীন, সম্বলহীন এই অবস্থা। অধ্যাত্ম-জীবনের পথ ইহা নয়। এক্ষেত্রে ক্ষুদ্র স্বার্থের তাড়নাই মনকে জড়াইয়া ফেলে এবং বৃহতের সব ভাবনা পরোক্ষ হইয়া যায় এবং দেহ-সম্পর্কিত ভোগ-সুখের কামনাকে কেন্দ্র করিয়াই মনের সব কাটা ঘোরে। এইরূপে দেহের পরিবর্তনশীল ধর্ম্মের প্রভাব মনের উপর গিয়া পড়িয়া কালের হিসাব গড়িয়া তোলে। কালের পরিমাপের মূলে দুঃখের প্রভাবই রহিয়াছে, এবং সুখ কালের হিসাবকে লোপ করিয়া দেয়। ক্ষুদ্র কালের পরিমিতির মধ্যে দুঃখের স্মৃতিকে জড়াইয়া ধরিয়া আমরা জীবনের গ্লানি বহন করিয়া ফিরি। বস্তুতঃ এ দুঃখ আমাদেরই

নিজেদের গড়া এবং সৃষ্টিছাড়া ব্যাপার। "আপনি রচি রচি ভব-নিরবাণা কৈছে জীব দুঃখ পাওয়ে আপনা।"

প্রেমস্বরূপে ভগবানে যদি আমাদের চিত্ত নিষ্ঠিত হয়, তাঁহাকে উপলব্ধির একান্ত লাভে যদি আমরা জীবনকে প্রভাবিত করিতে পারি, তবে দুঃখের অস্তিত্ব আমাদের কাছে আর থাকে না, পক্ষান্তরে তখন জগতে যে সব শক্তিকে আমরা আমাদের প্রতিকূল বলিয়া মনে করিতেছি, সে সবই আমাদের অনুকূল হইয়া দাঁড়ায়। অনিন্দকের অবস্থা—অহিংসার অবস্থা তখনই আমাদের পক্ষে অধিগত হইতে পারে।

কিন্তু অনুকূলতার উপলব্ধিও বোধ হয়, সবচেয়ে বড় কথা নয়। কারণ সে উপলব্ধির মধ্যেও স্বার্থ সম্বন্ধ সম্ভবত কিছু থাকে। স্বার্থ সম্পর্কের মোহমুক্ত মনে রসধর্ম্মের উজ্জীবনে প্রতিকূলতাও একটা নূতন রূপলাভ করে। প্রতিকূলতার মধ্যেও আমরা ভগবানের প্রেমের প্রবলতাই উপলব্ধি করি। সব ভাঙাচোরার ভিতর দিয়া আমাদিগকে জড়াইয়া ধরিবার জন্য তাঁহার আকুলতাই আমাদের প্রাণধর্ম্মকে উজ্জ্বল করিয়া তোলে। দুর্গম যাত্রার পথে তাঁহার দুর্লভ প্রেমের প্রগাঢ় স্পর্শ লাভ করিবার জন্য সাধক তখন অন্তরের অর্গল উন্মুক্ত করিয়া দেন। তিনি তাহার বুকের কাপড় টানিয়া ছিঁড়েন, Naked God meeteth with naked Christ, দুঃসহ সে অবস্থা। জড় দৃষ্টিতে আমরা যে সব ক্ষেত্রে ভগবানের রুদ্রতা দেখিতেছি, এবং তাহার ভয়ে কাঁপিতেছি, সাধকের দৃষ্টিতে সেই রুদ্রতা মধুর হইতে মধুরতর হইয়া ফুটে। অতি সৌম্য বলিয়াই তিনি যে অতি রুদ্র, সাধক এই সত্যকে তখন হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হন। শ্রীভগবানের রুদ্রলীলার তালে তালে তাঁহার অন্তর-রস উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে এবং সর্ব্বতোদীপ্ত সেই প্রচণ্ড মাধুর্য্যের বৈপ্লবিক প্রাচুর্য্যে সাধকের চিত্ত শিশির-স্নাত কমলদলের মত রসে ঢল ঢল ঔজ্জ্বল্য লাভ করে।

সন্তানের মঙ্গলের জন্য জননী যেমন তাড়না করেন, সেইভাবে ভগবানও আমাদিগকে দুঃখ কষ্ট দিয়া সংশোধন করিতেছেন, আমাদের মত দুষ্ট ছেলেকে তিনি বেত মারিয়া সায়েস্তা করিতেছেন এসব যুক্তি আমাদের আছে। দণ্ড-নীতির এই মহিমা-কীর্ত্তনে সাংসারিক প্রয়োজন সিদ্ধ হইতে পারে; কিন্তু সাক্ষাৎ-সম্পর্কে ভগবদনুভূতির রাজ্যে এমন ভীতিমূলক

প্রতীতি সম্ভব নয়। কারণ ভগবানের যে শক্তি, তাহা প্রেমেরই শক্তি। তাঁহার সে শক্তির সঙ্গে একান্তভাবে মনের যোগ ঘটিলে আঘাতের অনুভূতি আমাদের থাকিবে কেন? প্রেমের যে পথ, সে পথে আঘাতে আঘাতে অন্তর-রস উপচাইয়া উঠিয়া থাকে—আঘাত আপ্যায়নের রকম ফের হইয়া দাঁড়ায়।

প্রকৃতপক্ষে প্রেমের পথে দুঃখ সুখেরই বিলাস মাত্র। দুঃখ যদি না থাকে, তবে প্রেমে কোন সুখ নাই। দুঃখকে বাহুভাবে বরণ করিয়াই, দুঃখের মূল্য দিয়াই প্রেমের দুর্লভ ধন অর্জ্জন করিতে হয়। প্রাথমিক অবস্থায় দুঃখ এবং সুখের মধ্যে অন্তর বা ব্যবধান বোধ একটু থাকিতে পারে, কিন্তু প্রেম যতই প্রগাঢ় হইতে থাকে এবং মন যতই অভীষ্টে অভিনিবিষ্ট হয়, এই অন্তর বা পার্থক্য বোধও বিলুপ্ত হইয়া যায়। দুঃখই তখন সোজাসুজি সুখ হইয়া দাঁড়ায়। ফলত দুঃখের আঁধারে অভীষ্টের মুখ মনোমন্দিরে সে অবস্থায় উজ্জ্বল হইয়া জাগে, আঁধারকে আলোর উজ্জ্বল মাধুরী স্বরূপ, আলোর আলো এমন ভালো বলিয়াই উপলব্ধি হয়। প্রভাতসূর্য্যের কিরণের স্পর্শে কমলের দল যেমন বিকাশ লাভ করে, সেইরূপ দুঃখের স্পর্শেও অভীষ্টের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতায় দেহ ও মন জমিয়া উঠে। দুঃখের ভঙ্গীর রঙ্গে প্রেমের মনন-মাধুর্য্য বাহ্য দেহ-স্মৃতিকে বিলুপ্ত করিয়া দেয় এবং অন্তরের ঐশ্বর্য্যে মানুষ উদারতা লাভ করে। এ অবস্থায় প্রাণের মূলে রসময় সত্তার সমগ্রভাবে প্রকাশ ঘটে এবং মন তখন আর সংশয়ের মধ্যে দোল খায় না, একেবারে নির্ভয়।

ততখানি উপরের কথা ছাড়িয়া দিলেও মোটামুটি একথা বলা চলে যে, দুঃখের অনুভূতির প্রদীপ্তি মানুষের মনোধর্ম্মের একটি বিশিষ্ট সম্পদ এবং ইহার উপরই মানুষের প্রকৃত মনুষ্যত্ব অনেকখানি নির্ভর করে। অপরের দুঃখ যে অনুভব করিতে পারে না, সে মানুষই নয়। দুঃখের এই অনুভূতি হইতে সেবার প্রবৃত্তি জাগ্রত হয় এবং সেবা ও ত্যাগের পথে মানুষ সত্যকার সুখ লাভ করে। বস্তুতঃ নিজের ভোগ-সুখের মধ্যে যে সুখ, সে-সুখ পশুত্ব এবং বর্ব্বরতা ছাড়া অন্য কিছুই নহে। সে-পথ মানুষের পক্ষে নির্ব্বুদ্ধিতা এবং লোকসানেরই পথ। মানুষ যতই উন্নত হইবে, ততই এগুলিকে সে নিতান্ত নোংরামি এবং কদর্য্য বলিয়া মনে করিবে। শুধু তাহাই নয়, এগুলির বিড়ম্বনা হইতে মানব-সংস্কৃতি মুক্তি খুঁজিবে। সে অবস্থায় মানুষ বহুর জন্য

দুঃখবোধ করিবে এবং বহুর দুঃখ দূর করিবার মধ্যেই মনের প্রসারতাকে উপলব্ধি করিবে এবং সেই প্রয়াসই তাহার জীবনের বিলাস হইয়া দাঁড়াইবে। দুঃখের অনুভূতির ভিতর দিয়া আমরা যেখানে বৃহৎকে আপনার করিয়া পাই, সেই পাওয়াকেই একান্ত পাওয়া বা সত্যোপলব্ধি বলা চলে। বৃহতের যে বেদনা আমাদের নিজেদের স্বার্থ-চেতনা ভুলাইয়া দেয়, তাহাকেই ভগবৎ-ভাবনা বলা যায়। দুঃখের ঐশ্বর্য্য এইভাবে আমাদিগকে সত্যে প্রতিষ্ঠিত করে এবং অবীর্য্য হইতে উদ্ধার করে। প্রকৃতপক্ষে সুখের দাস আমাদিগকে ভয়ের দিকে এবং দুঃখের দীপ্তি আমাদিগকে জয়ের দিকে লইয়া যায়। দুঃখের এই অন্তর-স্পর্শী সম্পদ যেদিন বৃহতের সঙ্গে মানুষকে সম্বন্ধ যুক্ত করে, সেদিন তাহার প্রকৃত অসহায়ত্ব দূর হয়। বলা বাহুল্য, এই অসহায়ত্ব-বোধ বা নিঃস্বতাই আমাদের সকল ভয়ের মূলে রহিয়াছে এবং ভয়ই সব পাপ ও সকল দুর্গতির হেতু।

ভগবদনুভূতির রাজ্যে ভয়ের স্থান নাই। "ভীষাস্মাদ্বাতঃ পবতে ভীষোদেতি সূর্য্যঃ—শ্রুতির এই যে মন্ত্র, ইহার অর্থ নিশ্চয়ই এই নয় যে, ভগবান চোখ রাঙাইয়া বায়ুকে বহাইতেছেন, সূর্য্যের উদয় ঘটাইতেছেন কিম্বা মৃত্যুকে পাঁচ ঘাটে তাড়াইয়া লইয়া ফিরিতেছেন। প্রকৃতপক্ষে ঐ মন্ত্রের দ্বারা ভগবানের বিরাটত্ব এবং তাঁহার সর্ব্বশক্তিমত্তাই অভিব্যক্ত হইতেছে। ভগবানের এই সর্ব্বশক্তিমত্তা বলিতেও ইহা বোঝায় না যে, তিনি অপরকে পীড়ন করিয়া চালাইবার জন্য প্রবৃত্তি-পরায়ণ, বস্তুত সকলের তিনি আপন। সেই আত্ম-সংবেদনে আকর্ষণ করিতে পারেন বলিয়াই তিনি বলী, তিনি সর্ব্বশক্তিমান এবং তিনি সর্ব্বশক্তিমান বলিয়াই তিনি স্বেচ্ছাময়। আত্মভাবে-পরিব্যাপ্ত তাঁহার লীলার ক্ষেত্রে তাঁহার ইচ্ছায় বাধার কোন প্রশ্নই উঠে না। প্রকৃতপক্ষে ভগবানের বিধানে পীড়নের কোন স্থান থাকিতে পারে না এবং তাঁহার বিধান আর তিনি একই বস্তু। উজ্জ্বল প্রেম নিজের জন্য কোন সঞ্চয় রাখে না, পরম লাবণ্য-লীলায় সেখানে কার্পণ্য থাকা অসম্ভব। প্রকৃতপক্ষে ভগবানের বিধানে ভগবান নিজেকেই দান করিয়াছেন। তাঁহার অন্তর-রসকে উচ্ছ্বসিত করিয়া তিনি বহুর মধ্যে বিলসিত হইতেছেন; সুতরাং বহুর সহিত সংবেদনের সূত্রেই ভগবানের সন্ধান পাওয়া সম্ভব। এইভাবে ভগবানের যে সব বিধান স্থূল স্বার্থের বিচারে আমাদের কাছে

প্রতিকূল বলিয়া মনে হয়।

বৃহৎ দুঃখের অনুভূতি আমাদের অন্তরে জাগিলে সেই গুলিই সনাতন সত্যে সমাহিত হইবার পক্ষে আমাদের সহায়ক হইয়া উঠে এবং সেই গুলির সাহায্যে আমরা নিজেদের অন্তরের মহিমা প্রদীপ্ত করিয়া পাই। সুতরাং দুঃখকে এড়াইবার সমস্যা সাধকের জীবনে নাই। বস্তুতঃ ভগবানের নিকট হইতে অনিষ্টের আশঙ্কা করা কিম্বা তাঁহাকে ভয়ের দৃষ্টিতে দেখা আমাদের নৈতিক এবং মানসিক জীবনের অপরিপুষ্টতারই লক্ষণ এবং মানব-সভ্যতার শৈশব অবস্থারই পরিচায়ক। প্রকৃতপক্ষে মানুষ যতই উন্নতি লাভ করিবে, ততই সে এমন ভয় হইতে মুক্ত হইবে এবং চারিদিকে আত্মীয়তার প্রতিবেশ প্রসারিত দেখিতে পাইবে।

দুঃখের মহিমার কথা আমরা এদেশে অনেকেই শুনিয়া থাকি। শাস্ত্র-পুরাণে এই ধরণের নীতিবাক্যের অন্ত নাই। জ্ঞানিগণও অশেষ-ভাবে ইহা উপদেশ করেন। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও দুঃখের বস্তুগত্যার একটা প্রভাব জীবনে থাকিয়াই যায়। দুঃখ-কষ্ট সবই যে আমাদের মঙ্গলের জন্য আমরা সমগ্র অন্তর দিয়া ইহা স্বীকার করিতে পারি না। ইহার প্রকৃত কারণ এই যে, প্রেমকে একান্ত সম্বল এবং পরম আশ্রয় রূপে আমরা উপলব্ধি করিতে সমর্থ নহি। সুতরাং কোন নীতি-কথাই আমাদের সমগ্র স্বীকৃতি লাভ করিতে সমর্থ হয় না। এরূপ ক্ষেত্রে সহজ এবং সরলভাবে আমাদের ব্যক্তি এবং সমষ্টি-জীবনে প্রেম যাহাতে জীবন্ত হইয়া উঠে, তাহাই প্রয়োজন। নিজেদের সুখের দিকে দৃষ্টি ছাড়িয়া যদি আমরা বৃহতের বেদনাকে উপলব্ধি করিতে পারি শুধু তখনই এবং বৃহতের স্বার্থে আত্মচেতনাতেই আমরা প্রকৃত সুখ লাভ করিতে পারি। প্রকৃতপক্ষে এখানে দুঃখের ভিতর দিয়াই সুখ। ভগবান বুদ্ধের কথা—"সুখং সঙ্ঘস্য সামগ্রী, সমগ্রাণাং তপঃ সুখং।" সুতরাং শুধু অর্থনীতির অঙ্ক কষিয়াই আমাদের জীবনের সমস্যা মিটিবে না। ফলতঃ প্রকৃত সুখ বাহিরের উপচারের উপর নির্ভর করে না, মনের সঙ্গতিই তাহার ভিত্তি। বাস্তবিক পক্ষে বৃহতের সঙ্গে বেদনার অভাব, মানুষকে নিঃস্ব করিয়া ফেলে এবং বাহিরের কোন উপচারই তাহার সে নিঃস্বতা দূর করিতে সমর্থ নহে। "নিঃস্ব জনের দুঃস্বপনের বন্ধ ঘুচানো দায় রে", রবীন্দ্রনাথের এই বাণীর সত্যতা কে

অস্বীকার করিবে ?

প্রকৃতপক্ষে এই নিঃস্বতা আমরা কতটা দূর করিতে পারিয়াছি, তাহার উপরই আমাদের সভ্যতা, সংস্কৃতি এবং সাধনার মূল্য বিচার করিতে হইবে। এই নিঃস্বতা দূর করিবার জন্যই সভ্যতার প্রথম জাগরণ হইতেই এদেশে মানুষের সাধনা চলিতেছে। সর্ব্বাবস্থায় যিনি আমাদের 'স্ব' তাঁহাকে পাওয়া চাই। সেই 'স্ব'ত্বের সত্তায় নিজেকে প্রভাবিত করিতে পারিলে, আর পর বলিয়া কেহ থাকিবে না। ভগবৎ-তত্ত্বের অন্তর্নিহিত এই 'স্ব'ত্বের একটি প্রজ্ঞানঘন প্রকাশ আছে। প্রগাঢ় অনুধ্যানে মনের গোপন রাজ্যে প্রবেশ না করিলে জীবনে সে দিব্য ভাবনার উন্মেষ ঘটে না। দুঃখ এই কাজে সাহায্য করে। দুঃখের সান্দ্রঘন নিবিড় স্পর্শ আমাদের চিত্তে ভগবানের 'স্ব'ত্বকে পরিস্ফূর্ত্ত করিয়া তোলে। ভগবান্ আমাদিগকে দুঃখ কষ্ট দিতেছেন, তিনি আমাদিগকে সংশোধন করিবার জন্য তাড়না করিতেছেন, এসব ধারণা ভগবানের সেই 'স্ব'-স্বরূপ বা 'স্ব'-প্রকাশ তত্ত্ব উপলব্ধির অভাবেই ঘটিয়া থাকে।

ভগবানের একটা কাজ ভাল এবং অন্য কাজটা মন্দ, এমন ধারণা অন্তরে থাকিতে তাঁহার সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধই ঘটিতে পারে না। এই জড় জগতেও যাহাকে আমরা অন্তরের সঙ্গে স্বীকার করি, তাহার বিকার আমাদের চোখে পড়ে না। ভগবান্ যদি আনন্দময় হন, তবে সমগ্রভাবে তাঁহার লাবণ্যই আমাদের চোখে পড়িবে। তাঁহার খুঁৎ ধরিবার মত প্রবৃত্তি আমাদের স্বভাবতঃই থাকিবে না। অনিন্দক হইয়া আমরা তখন তাঁহাকে মনন করিব এবং জগতের সর্ব্বত্র তাঁহার যত শক্তির সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক ঘটিতেছে, সে সবগুলিকে আনন্দের তরঙ্গ রূপে গ্রহণ করিব, সব সঙ্গ আমাদিগকে রঙ্গই দিবে, ভঙ্গের কোন প্রশ্ন সে সম্পর্কে থাকিবে না।

বাস্তবিক পক্ষে ভগবানের সত্তাকে এইরূপ সমগ্রভাবে আপনার করিয়া উপলব্ধি করাতেই আমাদের জীবনের সার্থকতা নিহিত রহিয়াছে। ইহাতেই মানুষের সভ্যতা এবং সংস্কৃতির পরিপূর্ত্তি। এই পরম সত্যকে জীবনে অনুভব না করিতে পারিলে আমাদের মনে ভীতি থাকিবে, হিংসা থাকিবে এবং বিদ্বেষ থাকিবে। সুতরাং মনুষ্যত্বের জন্য আমরা মুখে যতই বড়াই করি না কেন, পশুত্ব আমাদের ঘুচিবে না। আশ্চর্য্য এই যে,

আমরা এত বুঝি অথচ এই সহজ সত্যটি বুঝিয়া উঠিতে পারি না। এই সোজা কথাটা বুঝিতে আমাদের মন এবং বুদ্ধি একেবারে বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়ে। এ জীবন চিরদিনের জন্য নয়। এ অবস্থায় প্রেমের পথে যদি আমরা জীবনকে বিকাইয়া দিতে পারি, তবেই তাহাতে সঙ্গতি আছে, আনন্দ আছে। পক্ষান্তরে অন্য যত পথই আমরা দেখি না কেন, যে যেমন করিয়াই আটঘাট বাঁধিনা কেন, তাহাতে ভীতিই আছে, মরণই রহিয়াছে। কিন্তু কাঁদিতে কাঁদিতে মরিবার জন্য মানুষ এখানে নিশ্চয়ই আসে নাই। বস্তুতঃ হাসিতে হাসিতে অনন্ত জীবন সে লাভ করিবে, এই জন্যই পৃথিবীর বুকে মানবের আবির্ভাব। এদেশের তত্ত্বদর্শী সাধকগণ মানুষকে সেই অমৃতের বাণী শুনাইয়াছেন, অনন্ত জীবন লাভের বৈজ্ঞানিক পথ তাঁহারা নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তাঁহারা, গুহাহিত যিনি, যিনি গহ্বরেষ্ঠ, যিনি দূরে হইলেও অতি নিকটে এবং বিদূর বলিয়াই যিনি মধুর, তাঁহারা তাঁহাকে ধরাইয়া দিয়াছেন, চিনাইয়া দিয়াছেন, যিনি গুপ্ত তাঁহাকে তাঁহারা অপাবৃত করিয়াছেন।

"পুমান্ অপাবৃতঃ"—বাঙলা একদিন তাঁহাকে পাইয়াছিল। গীতায় যিনি পুরুষোত্তম, তিনি তাঁহার রুক্মবর্ণ অঙ্গের আলোকে দিক উজ্জ্বল করিয়া এখানে জাগিয়াছিলেন। সেই প্রেমের ঠাকুর মহাপ্রভুকে যদি আমরা অন্তরে স্থান দিতে পারি, তবে ভয়-ভাবনা আমাদের দূর হইবে এবং সর্ব্বত্র সর্ব্বাবস্থায় আমরা জয়েতেই প্রতিষ্ঠিত থাকিব; উদ্বেগের কালিমা তখন আমাদের জীবনকে বিমলিন করিতে পারিবে না এবং আমাদের হাসি অবিনাশী হইবে।

আমি কি দুঃখেরে ডরাই

দুঃখ এবং মৃত্যু আমাদের জীবনে এই দুইটি পরম সত্য; অন্য সব অনেকটা আগন্তুকধর্মী। সেগুলি আসে যায়, কিন্তু দুঃখ এবং মৃত্যু এই দুইটি জীবনের সঙ্গে নিত্য সম্বন্ধে জড়াইয়া আছে; ইহাদের অস্তিত্বকে অস্বীকার করিবার মত ক্ষমতা আমাদের নাই, প্রকৃত প্রস্তাবে এই দুইটিকে অতিক্রম করিবার জন্য সৃষ্টির প্রথম স্তর হইতে মানুষ চেষ্টা করিয়া আসিতেছে এবং সে চেষ্টার এখনও বিরতি ঘটে নাই। এতদ্দ্বারা এই সত্য প্রতিপন্ন হয় যে, মানুষের

অন্তরতম সত্তায় সুখ নিত্য এবং সত্যরূপে রহিয়াছে এবং মানুষ অমৃতের সন্তান; এই জন্যই দুঃখ এবং মৃত্যুকে অতিক্রম করিবার উদ্দেশ্যে প্রবৃত্তি তাহাকে স্বাভাবিক ভাবে প্রণোদিত করিতেছে।

সুতরাং প্রকারান্তরে এই কথাই দাড়াইতেছে যে, দুঃখ এবং মৃত্যুও যেমন আমাদের জীবনে পরম সত্য, সেইরূপ সুখ এবং অমৃত্বও আমাদের সত্তার পক্ষে নিত্য এবং সত্য বস্তু। সিদ্ধান্তটি শুনিতে পরস্পরবিরোধী বলিয়াই মনে হইবে; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইহা বিবোধী নয়। আমরা সাধারণ দৃষ্টিতে দুঃখকে সুখের এবং মৃত্যুকে অমৃতত্বের প্রতিকূল বলিয়া মনে করি, কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। গভীর দার্শনিক তত্ত্বের অবতারণা করিতে গেলে বিষয়টি জটিল হইয়া উঠিবে, সুতবাং সহজভাবে বিষয়টি বুঝিবার চেষ্টা কবাই ভাল।

স্থায়ী সুখ কিংবা অমৃতত্বেব স্বরূপ আমাদের জানা নাই; কিন্তু দুঃখ কি আমাদের জানা আছে—মৃত্যু কি আমরা সকলেই বুঝি। সুতবাং আমাদেব পক্ষে জানা বুঝা যে বিষয়টি সেইটিকে অবলম্বন করিয়াই বিচাবে প্রবৃত্ত হওয়া সমধিক যুক্তিসিদ্ধ। প্রকৃতপক্ষে আমবা যাহাকে মৃত্যু বলি, তাহা দুঃখেরই একটা রূপ। দুঃখের কুহেলী জডাইয়াই মৃত্যু তাহার দেহটি গডিয়া তুলিয়াছে। দুঃখ আমাদের পক্ষে কতকটা ব্যক্ত, আমবা কতগুলি সংজ্ঞা দিয়া তাহার নিরিখ বাঁধিয়া ফেলিয়াছি। কিন্তু মৃত্যু দুর্নিরীক্ষ্য। সেখানে কত দুঃখ কি আকারে আছে, আমাদের ধারণায় আসে না; এই জন্যই মৃত্যুকে এড়াইতে পারিলে অন্য দুঃখ আমাদের কাছে গৌণ হইয়া পডে এবং মৃত্যুব বিভীষিকার কাছে সব দুঃখ তুচ্ছ হইয়া যায়। সুতরাং কথাটা দাঁড়াইতেছে এই যে, ব্যক্ত দুঃখের সম্বন্ধে আমাদের চেতনা মৃত্যুর মধ্যে অব্যক্তরূপে দানা বাঁধিতেছে এবং আমাদিগকে সর্ব্বদা তাড়না করিতেছে। অব্যক্তের পথে দুঃখের এই যে গতি, আমাদিগকে অন্ধকারে ফেলিবার তাহার এই যে একটা রীতি যদি আমরা ইহার তাৎপর্য ধরিয়া ফেলিতে পারি অর্থাৎ দুঃখের পরিপূর্ণ স্বরূপ যদি আমরা উপলব্ধি করিতে সমর্থ হই, তবে মৃত্যু আর আমাদের পক্ষে বিভীষিকা সৃষ্টি করিতে পারে না এবং জীবনের সমস্যা কাটিয়া যায়। এখন প্রশ্ন উঠিবে এই যে, আমরা দুঃখ পাই, অথচ দুঃখকে উপলব্ধি করিতেছি না, তাহার স্বরূপ বুঝিতেছি না, এ কেমন কথা? প্রকৃত প্রস্তাবে

কোন জিনিষ পাওয়া আর উপলব্ধি করা এক বস্তু নয়। দুঃখের স্বরূপ সম্বন্ধে সত্যই যদি আমাদের উপলব্ধি থাকিত, তবে তৎসম্পর্কে জীব-সাম্যও আমরা লাভ করিতাম অর্থাৎ আমাদের মত দুঃখ অপরে পাইলে নিজের দুঃখে যেমন বেদনা বোধ করি সেইরূপ অপরের দুঃখেও বেদনা বোধ করিতাম। বস্তুতঃ উপলব্ধি ব্যাপারটা হৃদয়ের। আমরা হৃদয় দিয়া দুঃখকে গ্রহণ করিতে পারি না এজন্য দুঃখের সম্বন্ধে স্বরূপ-জ্ঞানও আমাদের লাভ হয় না। এক্ষেত্রে প্রশ্ন এই যে, তবে কি নিজেদের দুঃখকেও আমরা হৃদয় দিয়া গ্রহণ করি না? ইহার উত্তব এই যে, না; সে ক্ষেত্রেও হৃদয়ের সম্পর্ক আমাদের ঘটে না। কারণ হৃদয়ের ধর্ম্মই এই যে নিজের দিকে তাকাইলেই তাহা সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে। দেহেব ভয় হৃদয়কে দুর্ব্বল করিয়া ফেলে। হৃদয়েব ধর্ম্মেব ব্যাখ্যা উপনিষদে বেশ পবিষ্কার ভাবে আছে, উপনিষদ বলেন, হরণ করে, দান করে এবং লইয়া যায় অর্থাৎ তদ্গত করে; ইহাই হৃদয়ের ধর্ম্ম। দুঃখের স্বরূপ উপলব্ধিব ভিতর দিয়াই হৃদয়ে ভাবাত্মিকা এই শক্তির ভূয়িষ্ঠ এবং বলিষ্ঠ প্রাণরস ধর্ম্মেব উন্মেষে অমৃতত্ব বিধৃত রহিয়াছে। সুতরাং স্বরূপতঃ দুঃখই অমৃতত্ব লাভের পথ এবং রসের সঞ্চারীধর্মে দুঃখ স্বরূপতঃ সজীব। অন্য কথায় দুঃখের পথেই মৃত্যুকে জয় করিবার মত মনোবল হৃদয় বৃত্তির উদার পরিস্ফূর্ত্তির সূত্রে আমাদের অধিগত হইতে পারে। ব্যক্তিগত ক্ষুদ্র দুঃখ হইতে পরিত্রাণ লাভেব জন্য যখন আমরা চেষ্টা কবি তখনই আমাদের হৃদয়বৃত্তি সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে এবং সুখের ভ্রান্তিতে আমাদের দুঃখের কারণই ঘটে। পক্ষান্তবে বৃহতের বেদনায় যখন আমরা নিজেদের সুখের কথা ভুলিয়া যাই, তখন সেই দুঃখই হৃদয়ের রসে উপচিত হইয়া মৃত্যুভয় অতিক্রমকারী প্রাণবলে প্রেমে পরিণত হয়; সুতরাং স্বরূপতঃ দুঃখই সুখ। কিন্তু হৃদয়েব সম্পর্কবিহীন যে দুঃখ, সে দুঃখ, দুঃখের স্বরূপ নয় এবং তেমন দুঃখের জন্য বড়াই করিবার কিছুই নাই, কারণ তেমন দুঃখ পশুরাও পাইয়া থাকে।

আরও একটা কথা থাকিয়া যায় যে, অপরের দুঃখে আমাদের দুঃখ অনেক ক্ষেত্রে শুধু ধারণার ওপরও হইতে পারে, লোকের বাহবা পাইবার জন্য কিংবা নিজেদের উদ্দেশ্য সিদ্ধির অভিপ্রায়েও আমরা তাহা প্রকাশ করিতে পারি। আমাদের সে সব কাজের মূলে গভীর অনুপ্রাণতা

তেমন কিছু থাকে না; প্রকৃতপক্ষে সেগুলিতে হৃদয়ের ধর্ম্মের উন্মেষ ঘটে না। হৃদয়ে উদার ও প্রগাঢ় সম্পর্কে দুঃখের রূপ একই, সেখানে উপাধি-গত বিচার বিলীন হইয়া যায়। মহাবিষ্ণুর জন্য বেদনা আর ক্ষুদ্র একটী কীটের জন্য বেদনা একই প্রাণতত্ত্বকে পরিস্ফূর্ত্ত করিয়া তোলে। বেদনার সে রাজ্যে অন্য হিসাব নাই, আছে আপনাকে পাইবার ব্যাপ্তি চেতনা, আছে আত্মভাবনা। ভগবানের জন্য বেদনা হইবে, অথচ মানুষের জন্য বেদনা হইবে না, কীটানুকীটের জন্য অন্তরে ব্যথা জাগিবে না, এমন কথার কোন মূল্যই নাই। কারণ ভগবৎ-তত্ত্বের অনুভূতিতে হৃদয়ের যে প্রদীপ্তি ঘটে, সে আলো আর নিভে না, অণু হইতে মহৎ সব উপাধিকে উজ্জ্বল করিয়া প্রকাশক এবং অনাময় প্রভাবে তাহা অন্তর জোড়া এক অখণ্ড সত্যকেই প্রকট করে। তৃষ্ণার্ত্ত পুক্কশকে জলদান করিয়া আটচল্লিশ দিন নিরম্বু উপবাসে ক্লিষ্ট রন্তিদেব আনন্দরসে নিমগ্ন হইয়া বলিয়াছিলেন—আমার ক্ষুধা দূর হইল, তৃষ্ণা দূর হইল, দৈন্য দূর হইল। পিপাসায় আতুর জীবকে জল দান করিয়া তিনি তাঁহার দেহের বেদনা, ক্লান্তি, বিষাদ, মোহ, শোক, সমস্ত একেবারে বিস্মৃত হইলেন। রন্তিদেব এক্ষেত্রে পুক্কশকে পুক্কশ দেখেন নাই; পুক্কশের দেহে তিনি ভগবানকেই প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। শিবি শ্যেনকে নিজের মাংস কাটিয়া খাইতে দিয়া পরিতুষ্ট করিয়াছিলেন, তিনি শ্যেনের মধ্যে ভগবানকেই দেখিয়াছিলেন। বস্তুতঃ যেখানে যাহার বেদনায় আমরা দেহের স্মৃতি ভুলিয়া হৃদয়ে দৈন্যবিহীন প্রদীপ্তি লাভ করি, সেখানে সেই বস্তুই আমাদের কাছে পরম মধুর হইয়া উঠে। আমাদের অন্তরের একান্ত রসে সে জিনিষ যেন মাখামাখি হইয়া যায়, আমাদের মনের সব অভিলাষ তাহার জীবন রসের বিলাস-বৈভবে প্রভাবিত হইয়া পড়ে। দেহসম্পর্কিত সংস্কারকে ভাসাইয়া দিয়া হৃদয়ের উজ্জীবনে অভীষ্টের অভি-রামত্ব আস্বাদনের জন্য অধ্যাত্ম-সাধনার ক্ষেত্রে দুঃখকে বরণ করিবার নিমিত্ত আমাদের অন্তরে দুর্ণিবার একটা স্পৃহা জাগে। এই যে স্পৃহা, ইহা শুষ্ক একটা জ্ঞানতত্ত্ব নয়। ইহার মধ্যে প্রাণ আছে, অনুধ্যান রহিয়াছে, রস আছে,প্রগাঢ়-আত্ম সংস্পর্শ লাভের জন্য দুরন্ত এবং জ্বলন্ত একটা আবেগ, অন্য কথায় বাদ বা বিতর্কবিহীন মনের একটা সাধ রহিয়াছে। বস্তুতঃ অভীষ্টের যদি কোন আকার বা আমাদের চিত্তবৃত্তির দ্বারা স্বীকার করিবার মত অঙ্গ না থাকে

তবে রস জাগে না এবং সঙ্গ লালসাও সুনিশ্চিত হইতে পারে না। প্রকৃতপক্ষে ফাঁকা কোন প্রত্যয়ের সঙ্গে আমাদের হৃদয়ের মাখামাখি হওয়া সম্ভব নহে; সুতরাং হৃদয়ের সংবেদনে দুঃখ বরণের যে অবলম্বন, সেখানে উদয় আছে, রূপ আছে, তবে সে উদয় বা প্রকাশ, রূপ বা বিলাস কাটাছাঁটা নয়, সব লইয়া গোটা ফোটা জিনিষ। যে মাধুরী অখণ্ড তাহার উদয়ে সাধকের দেহাত্মবুদ্ধি লয় হইয়া যায়। সেই রূপের আলোক তাহাকে নিষ্পলক করিয়া পুলক ছড়াইতে থাকে। অন্য কিছু দেখিবার অন্য কিছু জানিবার থাকে না। এই ভাবেই অণু হইতে মহৎ একই পরম সত্যের আনুগত্য উদ্দীপ্ত হয় এবং সর্ব্বতোময় সেবার প্রবৃত্তি সঞ্চারী হইয়া থাকে। সেবার পথে এই যে আত্মভাবনার আস্বাদন ইহা উত্তরোত্তর অহেতুক হইয়া দাঁড়ায়। আমরা দুঃখ বলিতে যে সব সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করিয়া থাকি, আত্মভাবনার রাজ্যে অভীষ্টে সব সময় যে তাহার লিঙ্গ বা লক্ষণগুলি স্পষ্টভাবে থাকিবে, এমন কথা বলা চলে না। উপরের অবস্থায় গেলে অর্থাৎ বেদনা যদি একবার তীব্র হইয়া বুদ্ধির বিপর্য্যয়মূলক সংস্কারগুলিকে গ্রাস করিয়া ফেলে এবং হৃদয়ের গভীর আত্মভাবনার সুর যদি একবার বাজিয়া ওঠে, তবে সেবার প্রবৃত্তি দুঃখলিঙ্গ, সমূহের সম্বন্ধে অনপেক্ষ ভাবেই আমাদের অন্তরে উচ্ছ্বসিত হইতে থাকে। এ অবস্থায় অভীষ্টের জন্য দুঃখ বরণ করাই আমাদের ধর্ম্ম হইয়া দাঁড়ায়। সেই দুঃখ স্বীকৃতিজনিত রসের সঞ্চারে আমাদের মন নির্ব্বিকার হইয়া পড়ে এবং মনের অনুকারী ইন্দ্রিয়বৃত্তিগুলি পর্য্যন্ত রসের সেই উজ্জীবনে দিব্য হইয়া দাঁড়ায়। এ অবস্থায় সাধক সর্ব্বোপাধিবিনির্মুক্ত হইয়া সুন্দরের রাজ্যে প্রবেশ করেন। তাঁহার দেহ, ইন্দ্রিয়, মনের সঙ্গে যত কিছু সংস্পর্শ ঘটে, সর্ব্বত্র সুন্দরের অব্যবহিত স্পর্শই তিনি অন্তরে অনুভব করেন।

প্রকৃতপক্ষে দুঃখের স্বরূপ উপলব্ধির ভিতর দিয়া জীবনকে নিত্য সুখে নিহিত করিবার এই যে রহস্য, যেদিন ইহা মানুষের কাছে উন্মুক্ত হইবে এবং সাজাসুজি বৃহতের দুঃখ বরণ করিয়া লইবার মত প্রাণের প্রাচুর্য্য মানুষ যেদিন লাভ করিবে সেদিন বর্ত্তমানে দুঃখের বস্তুগত্যা যে রূপটি আমরা দেখিতেছি তাহা আর থাকিবেনা সেই সঙ্গে মরণের বিভীষিকাও বিলীন হইয়া যাইবে। দুঃখকে জয় করিবার এই যে কৌশল ইহাকে

প্রকৃত বিদ্যা বলা চলে। বিদ্যাও অর্জ্জন করিলাম, অথচ আমাদের দৈন্যও কোন দিন ঘুচিল না, দুঃখের চাপে পরাভবের বোঝাই শুধু বহন করিয়া আমরা চলিলাম, এমন বিদ্যার কোন মূল্য আছে বলিয়া মনে হয় না। ফলতঃ ধর্ম্মের নামে দুঃখের কালি মুখে মাখিয়া সন্ন্যাসী হইয়াও কোন লাভ নাই। এই সত্য উপলব্ধি করিয়াই ভাগবত বলিয়াছেন—"শক্কেত বিদ্বান্ কু-কলেবরা-ত্যয়াৎ যৎ তস্য যত্নঃ শ্রমমেব কেবলম্।"

বাংলার বৈষ্ণব ধর্ম্ম নিজের দুঃখ বিস্মৃত হইয়া বিশ্ব-বীজে দুঃখকে নিজ করিবার উপায় নির্দ্দেশ করিয়াছে। বস্তুতঃ বেদ-বেদান্তে সে সত্য নিগূঢ় ভাবে আছে। বাঙলার বৈষ্ণব-সাধনা তাহাকেই প্রাণধর্ম্মে জীবন্ত করিয়া তুলিয়াছে। শ্রুতি-স্মৃতিতে যে তত্ত্ব দুর্নির্দ্দেশ্য ছিল, ঠাকুর নরোত্তম সহজ কথায় এবং সরস ভাবে সেই তত্ত্বকে হৃদয়ের স্পর্শে দীপ্ত করিয়াছেন। বাস্তবিক পক্ষে নিজের দুঃখের দিকে তাকাইলেই মায়া এবং তৎসম্পর্কিত দার্শনিক নানা জটিলতা দেখা দেয়; পক্ষান্তরে বিশ্বের দুঃখের উপলব্ধিতে সেই মায়াই চিৎ-শক্তির বিলাস-রসে প্রদীপ্ত হইয়া উঠে; এই জগতের মধ্যেই তখন ভগবানের আনন্দলীলা উন্মুক্ত হইয়া পড়ে। আমরা তখন মনের মূলে সর্ব্বাবস্থায় সত্য এবং নিত্য বল পাই এবং আমাদের মলিন মুখে হাসি ফোটে। মৃত্যুভয়ে মনমরা হইয়া তখন ধর্ম্মের নামে দুর্ব্বলতা এবং দৈন্যভারে আমাদিগকে ক্লিন্ন হইতে হয় না।

কিন্তু নিজের দুঃখ ভুলিতে চাহিলেই ভোলা যায় না এবং বিশ্ব-বীজে দুঃখকে নিজ করাব প্রশ্ন সমানভাবে জটিলই থাকিয়া যায়। প্রকৃতপক্ষে সে উপদেশ অনেকটা হেঁয়ালির মতই শুনাইবে; কারণ ধূলা-বালু ঝাড়িয়া কিম্বা ধান হইতে তুঁষ ছাড়াইয়া চাউলের মত বিশ্বের বীজকে বাহির করা সম্ভব নয়। একটু প্রণিধান করিলেই বুঝা যাইবে, যে বস্তু যতই ব্যাপ্ত, তাহা স্বরূপতঃ ততই গুপ্ত। সকলের মধ্যে নিজেকে নিঃশেষে দান করিয়া এবং সকলকে আত্মরসে উজ্জ্বল করিয়া যাঁহার উন্মেষ, সকলের মহিমাকে স্বীকৃতির উদার বীর্য্যেই তাঁহার মাধুর্য্য উপলব্ধি করা যায়: সবার বোধা অনুভূতির সুরেই তিনি মধুর হইয়া ফোটেন। বিশ্বে যিনি ব্যাপ্ত, মনের গহনে বিশ্বের বীজস্বরূপে তিনি তেমন ভাবেই গুপ্ত রহিয়াছেন, বৃহৎ দুঃখকে বরণ করিয়া লইয়াই গহন বনের পথে সে গোপন দেবতার অভিসারে বাহির

হইতে হয়।

বিশ্ব-বীজের এই সকল তত্ত্বের উপলব্ধিতে হৃদয়ে যে সমগ্র ও অখণ্ড সংবেদনের স্ফূরণ ঘটে, তাহাকে বিশ্লেষণ করিয়া বুঝানো কঠিন। বস্তু অপরের দুঃখ, সকলের দুঃখ কিম্বা বৃহতের দুঃখ বলিতে আমরা সাধারণতঃ মানুষ, পশুপক্ষী, কীট-পতঙ্গ প্রভৃতি চেতন পদার্থের সহিত আমাদের হৃদয়ের সংবেদনই বুঝিয়া থাকি। অচেতন পদার্থনিচয়, যেমন গাছ, লতাপাতা, মাটি, পাথর এই সব পদার্থের সঙ্গে সমবেদনার ধারণা আমাদের হয় না; কারণ আমাদের বুদ্ধিতে সংবেদন শুধু সমধর্মী পদার্থের সঙ্গেই ঘটিতে পারে। গাছ, লতাপাতা কিম্বা জড়পদার্থনিচয় আমাদের যখন সমধর্মী নয়, তখন সেগুলির প্রতি আমাদের সংবেদন বা হৃদয়ের সংযোগ ঘটিতেও পারে না মনে হয়। কিন্তু এ সব বিচারের কথা। হৃদয়ের ধর্ম্মে যেখানে পরিপূর্ণ প্রকাশ সেখানে এমন বিচারের অবকাশ নাই; সেখানে প্রেমেরই বিলাস সচেতন এবং অচেতন সকলকেই উজ্জীবিত করিয়া তোলে। প্রকৃতপক্ষে মানুষই যে শুধু হৃদয়ের সাড়া দেয়, এমন নয়, পশুপক্ষীরাও তাহাতে সাড়া দেয়, শুধু তাহাই নয়, সংবেদনে গাছ, লতাপাতাও সাড়া দিতে জানে এবং মাটি-পাথরেও হৃদয়ের স্বচ্ছ সংবেদনে প্রেমের জ্যোতির্ম্ময় লীলা প্রকাশ পায়।

এদেশের তত্ত্বদর্শিগণ বিশ্বের চেতনঅচেতন বস্তু নিচয়কে প্রধানতঃ দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। কতকগুলি বহিঃ সংজ্ঞা বিশিষ্ট আর কতকগুলির বহিঃসংজ্ঞা নাই, শুধু অন্তঃসংজ্ঞা আছে। যেসব চেতন বস্তুর বহিঃসংজ্ঞা আছে, তাহাদের অন্তঃসংজ্ঞাও অবশ্য থাকিবে। নিম্নস্তরের সৃষ্টির দিকে বহিঃসংজ্ঞার হ্রাস লক্ষিত হয়। উদ্ভিদ্ প্রভৃতির শুধু অন্তঃসংজ্ঞাই আছে। মাটি ও পাথরেরও অন্তঃসংজ্ঞা রহিয়াছে বলিয়া মনীষীদের অভিমত। সংজ্ঞা প্রাণধর্ম্মেরই ব্যপার। বস্তুতঃ বিশ্বের চেতনঅচেতন সর্ব্বত্র প্রাণরসের এক অখণ্ড উজ্জীবন-লীলা চলিতেছে। এই লীলার সংবেদনে আমাদের সত্যকার প্রাণপ্রতিষ্ঠা ঘটিতে পারে।

ভালবাসায় শুধু মানুষই সাড়া দেয় না, পশুপক্ষী প্রভৃতি জীবজন্তুও যে সাড়া দিয়া থাকে, ইহা আমরা সকলেই জানি। বরং মানুষের এই সাড়া দেওয়াতে অনেকখানি নাড়াচাড়া থাকে। কিন্তু পশুপক্ষী প্রভৃতি জীবজন্তু অতি সহজে এবং স্বাভাবিকভাবে হৃদয়ের সংবেদন ধরিয়া লয়। আমাদের

হৃদয়ের ভাবটি স্বচ্ছরূপে ধরিবার শক্তি তাহাদের মানুষের চেয়েও বেশী আছে বলা যায়। মানুষের চেয়ে বহিঃসংজ্ঞা তাহাদের কম বলিয়াই সম্ভবতঃ তাহাদের এই শক্তি আছে ; বহিঃসংজ্ঞার অভাবে তাহাদের ক্ষেত্রে সংবেদনের অন্তঃসংজ্ঞার প্রভাব ক্ষুন্ন হইবার কারণ ঘটে না। এজন্য হৃদয়ের সংযোগ তাহাদের ছুটে না, টুটে না, প্রেম সমধিক পরিস্ফূর্ত্ত হয়। বস্তুতঃ মানুষ যত সহজে মানুষের ভালবাসাকে ভুলিয়া যায়, পশুপক্ষী তত সহজে ভোলে না। মানুষের একটু ভালবাসার কাছে তাহারা প্রাণ পর্য্যন্ত দেয়। সাপ, বাঘ পর্য্যন্ত মানুষের স্বচ্ছ হৃদয়ের উন্মেষ-রসে নিমেষে বশ হইয়া যায়। উদ্ভিদ্ এবং জড়জগতেরও সুপ্ত প্রাণধর্ম্মে এই প্রগাঢ় মর্ম্মগত আপন চেতনা রহিয়াছে। একবার আত্মভাবনা জাগিলে সেখানে আর বঞ্চনার ভয় নাই। বস্তুতঃ প্রাণের প্রকৃত স্পর্শ পাইলে গাছ, পাথর, ধূলাবালি অন্তঃসংজ্ঞায় সে আপন-তত্ত্বকে একান্তভাবে জড়াইয়া রাখে এবং তজ্জনিত হর্ষ চারিদিকে ছড়ায়। আপন জনের কাছে সে গোপন তত্ত্ব ব্যক্ত করে। যদুপতি গিয়াছেন, সে মথুরাপুরীও আর নাই। মানুষ প্রেমের সে লীলা ভুলিয়া গিয়াছে ; কিন্তু গাছ, লতাপাতা ভোলে নাই। ইহাতেই তীর্থের তীর্থত্ব—ইহাই স্থান-মাহাত্ম্য। প্রেমিক এবং মহাপুরুষদের পাদস্পর্শের চিন্ময় রসকে জড়-প্রকৃতিও আদর করিতে জানে এবং জীবন্ত করিয়া রাখে। স্থূল বিষয় বিচার হইতে মুক্ত হইয়া মন সূক্ষ্ম হইলে জড়রূপে প্রতীত বিশ্বপ্রকৃতির বুকে এমন প্রাণের কারবার ধরা পড়ে। সকলের যিনি প্রাণ, প্রেমিকের সাধন সঞ্জাত সংবেদনে উদ্দীপ্ত হইয়া যাহাদিগকে আমরা অচেতন বলিয়া মনে করি, আত্মসম্বন্ধের ভাবটিকে সকলের চিত্তে সঞ্জীবিত করিয়া তোলে। প্রকৃতপক্ষে চেতন-অচেতন সকল জুড়িয়া আমাদের হৃদয়ের সংবেদন না জাগিলে সত্যের সঙ্গে আমাদের সংযোগ ঘটিতে পারে না। সুতরাং সকলের মধ্যে যিনি বীজস্বরূপে রহিয়াছেন, সেই বিশ্ববীজে মজিয়াই আমরা নিজকে পাইতে পারি এবং নিজ-বীর্য্য বৈভবে আমরা প্রতিষ্ঠিত হই। প্রকৃতপক্ষে ইহাই প্রেম এবং প্রেমের দ্বারাই বিশ্ব-জগৎ ব্যাপ্ত এবং নিত্যভাবে বিধৃত রহিয়াছে। প্রেমই জগৎকে ধারণ করিয়া আছে ; সুতরাং প্রেমের মর্ম্মে চেতন-অচেতন সকলেরই কর্ম সমধর্ম্মে ধরা পড়ে। অর্থাৎ আমি যাহার জন্য কাজ করিতেছি, সকলেই তাহার জন্য কাজ করিতেছে, আমি যাহাকে

চাই, সকলেই তাহাকে চায়, এইভাবে চেতন অচেতন সব সঙ্গ আমাদের পক্ষে চিন্ময় হইয়া উঠে এবং আমরা আত্মরসে উজ্জ্বল বিশ্বাত্ম দেবতার সনাতন সংশ্রয় লাভ করিতে পারি। বিশ্বের যিনি বীজ, যিনি সর্ব্বত্র উদ্ভাসিত —পুরুষযোষিৎ আদি স্থাবর-জঙ্গম সর্ব্বচিত্ত আকর্ষণকারী তাঁহার অদীন-লীলার লাবণ্যে আমাদের জীবনের সকল কার্পণ্য দূর হয়। আমরা তখন তারুণ্য ধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত হইয়া পরম দেবতার পায়ে আত্মনিবেদন করি এবং ত্যাগের পথে প্রকৃত শান্তিতে প্রতিষ্ঠিত হই। বাঙলার বৈষ্ণব সাধনায় বেদপ্রণিহিত এই সত্যের উজ্জ্বল মহিমা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। বাস্তবিকপক্ষে ত্যাগের অন্তরে রহিয়াছে দুঃখের স্বরূপত উপলব্ধি এবং তেমন দুঃখের উপলব্ধির অন্তরে রহিয়াছে সুখ। বস্তুতঃ যে সুখের মূলে দুঃখের সংবেদনে হৃদয়ের একান্ত উদ্দীপ্তি নাই এবং প্রাণরসের প্রাচুর্য্যে পরম সত্যের স্বরূপে আমাদের সম্প্রতিষ্ঠা নাই, সে সুখ সুখই নয়। পশুত্বের তাড়নাই সে সুখে সার হয়। মানুষের অন্তর ধর্ম্ম সুখের সেই ভ্রান্তিকে একান্তভাবে স্বীকার করিয়া লইতে পারে না, তাহার ফাঁকি ধরিয়া ফেলিয়া দেয়। মানুষের জীবনের পক্ষে এই যে সুখ, ইহা একান্ত বঞ্চনা এবং দুর্বিষহ বিড়ম্বনা মাত্র। ভারতের সমগ্র সাধনা এবং সংস্কৃতি এজন্য দুঃখেরই বন্দনা করিয়াছে। বাস্তবিকপক্ষে নিজের দুঃখের জন্য মানুষের কাছে কান্নাকাটি করিলে শুধু উপেক্ষাই মিলে, বিড়ম্বনাই সার হয় এবং দুঃখভীরু বা ক্ষুদ্র সুখের সে কাঙাল, তাহার অন্তরের দৈন্যের জ্বালা হইতে দেবতারাও তাহাকে রক্ষা করিতে পারেন না। ভারতের সাধনায় দুঃখের যে বন্দনা আছে, তাহাতে আতুরের অশ্রু নাই এবং তাহা অসহায়ের একান্ত নৈরাশ্য বা অবসাদ জনিত খেদোক্তিতেও ক্লিন্ন নয়। ভারত সনাতন সুখের অনাময় জ্যোতির প্রাণময় স্পর্শ একান্ত দুঃখকে বরণ করিবার পথেই লাভ করিয়াছে। বিশ্বের যিনি জীবন, সর্ব্বতোব্যাপ্ত সেই গুপ্ত দেবতাকে আপন করিয়া পাইবার উদ্দেশ্যে ভারতের সাধকগণ দুঃখের দুর্গম পথে বাহির হইয়াছেন। দুঃখের দানকে হৃদয়ে গ্রহণ করিয়া নিজেদের মান তাঁহারা বাড়াইয়াছেন। বাঁশী বাজিয়াছে। দুরন্ত দুঃখকে জীবন্ত করিয়া সে বাঁশীর সুর দিকে দিকে দাহন ছড়াইয়াছে। সে সুরের সন্তাপ-সাগরে মনকে নিমগ্ন করিয়া সাধক সুখময় দেবতার সন্ধান পাইয়াছেন। দেবতার বৈদগ্ধী লীলায় আত্মসুখের অবীর্যকে দগ্ধ করিয়া তিনি জীবনের

অনন্ত-ঔদার্য্যকে আস্বাদন করিয়াছেন। বস্তুতঃ দুঃখ হইতে স্বতন্ত্র সুখ বলিয়া কোন পদার্থ এ-জগতে নাই এবং বুকের যেখানে জোর আছে, সেখানে মৌলিক সত্তায় দুঃখই সুখ। দুঃখ হইতে স্বতন্ত্র কিম্বা দুঃখ-নিরপেক্ষ সুখের সম্বন্ধে আমাদের যে প্রতীতি, তাহা অবিদ্যা এবং অজ্ঞানতা নিবন্ধনই ঘটিয়া থাকে এবং জীবনের উপর ইতর ও স্থূল স্বার্থগত মোহের প্রভাবই ইহার মূলে আছে। বাস্তবিকপক্ষে আত্যন্তিক যে সুখ দুঃখের স্বরূপ-তত্ত্বের উপলব্ধির ভিতর দিয়া তাহা অন্তরে উপচিত হয়। গীতায় এই সুখকেই বুদ্ধিগ্রাহ্য এবং অতীন্দ্রিয় বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। কারণ দুঃখের অনুভূতির ভিতব দিয়া যে সুখ হৃদয়ের উন্মেষ সাধন কবে, সেই সুখই ইন্দ্রিয়-সম্পর্কিত বিষয়-বিচারকে অতিক্রম করিতে সমর্থ। শ্রীভগবান এই সুখেব লক্ষণ ব্যক্ত করিয়া বলিয়াছেন যে, সে সুখে অবহিত হইলে মন গুরুতর দুঃখেও বিচলিত হয় না। এই উক্তির দ্বারা গুরুতর দুঃখের একান্ততাতেই সেই সুখের জীবন্ত লীলা ব্যক্ত করা হইয়াছে। যে সুখ দুঃখের এই জীবন্ত রসে ব্যাপ্ত নয়, দীপ্ত নয়, তাহা মৃত, তাহা জড়, তাহা ক্ষুদ্র, অনন্ত রস এবং অব্যয় অমৃতের অধিকাবী মানুষের তাহাতে শান্তি মিলে না। দুঃখের সঞ্জীবনী ধারাতেই সুখ নিত্য ধর্ম্মে প্রতিষ্ঠা লাভ করে, টাটকা হইয়া উঠে, নবীন হইয়া ফোটে, সুন্দরের ছন্দ অন্তরে জাগাইয়া জীবনকে সমৃদ্ধ করে। সুতরাং দুঃখেরই জয় হোক্ এবং দুঃখের সম্বন্ধে আমাদের ভ্রান্তি ও ভীতি প্রাণ ধর্ম্মের আলোকে অপসৃত হউক।

সমর্পিবে নিজতনু

ইহার পরে কি? যমদ্বারে মহাঘোরে তপ্তা বৈতরণী নদী! কে বলিবে? মরণের পরে আবও কিছু কি আছে। না এই শেষ—চিরনিদ্রা, মহানিদ্রা। সে নিদ্রা হইতে মানুষ আর উঠে না, জাগে না। এখানে জীবনের এই যে বাতি, ইহা যদি একবার নিভিয়া যায়, তাহার জ্যোতি আর কোথায়ও গিয়া খোলে না, খেলে না। জীবনটা তবে কি সত্যই একান্ত আকস্মিক, অপরম্পর সম্ভূত, আলেয়ার মত ব্যাপার! বলা বাহুল্য, মরণের পর কিছু থাকে না, এমন ধারণা মানুষের সুসম্বদ্ধ চিন্তার পক্ষে আদৌ স্বাভাবিক নয় এবং মানুষ যখন তেমন ধারণা করিতে যায়, অনেকটা গায়ের

জোরেই তাহাকে তাহা করিতে হয়। বিশ্ব-সৃষ্টির ভিতর দিয়া অভিনব এবং অনন্ত রহস্যের প্রতি মানব চিত্তের দূর-প্রসারী আত্ম-সংস্থিতিদীপ্ত একটা আকর্ষণ রহিয়াছে, মানুষের পক্ষে তাহা ছিন্ন করা সহজ নহে, কারণ তাহাঁর হৃদয়ের সঙ্গে সেই অসীম রহস্যের সংবেদন জড়ানো মাখানো রহিয়াছে। মানুষের মনের তারে যেন অনন্তের সম্বন্ধে নিত্য সচেতন একটি সুর সহজ ভাবে বাজিতেছে, বিষয়-বিচারের সিদ্ধান্তের দ্বারা সে তাহাকে চাপা দিতে সমর্থ হয় না। নানা সম্পর্কের সূত্রে সূত্রে সেই সুরলহরী বিশ্বপ্রকৃতির চাতুরীতে তাঁহাকে জড়াইয়া দূরে লইয়া যায়। মানুষেব মনে একান্ত এই আশ্বাস জাগে যে, আছে, এই শেষ নয় এমন দেশ আছে, যেখানে অশেষের রসের উন্মেষে—সবই নিতুই নূতন। এই প্রতীতিকে ভিত্তি করিয়া মানুষের প্রাণ-ধর্ম্ম বলিষ্ঠ হয় এবং তাহার সমাজ-জীবন ও সভ্যতা বিচিত্র গতিতে বিকশিত হইযা থাকে।

প্রকৃতপক্ষে এই জীবনই শেষ, ইহাব পবে কিছুই নাই, এমন ক্ষণিকতাকে স্বীকার করা মানুষের ধর্ম্ম নহে। মানুষ তাহা পারে না, যদি সেই নশ্বরত্ব এবং ক্ষণিকতাই তাহার মনেব একান্ত আশ্রয় হইত, তবে এই জীবনকে যত খুশি ভোগ করিয়া যাই, মানুষের পক্ষে এই ধরণের যুক্তি স্বীকাব করা সম্ভব হইত। তাহার ফলে চার্ব্বাক বা লোকায়ত মতবাদ মানব-সমাজে বিস্তার লাভ করিত, ঋণ করিয়া ঘি খাইবাব জন্যই মানুষ মাতিয়া উঠিত এবং কাম সাধনাই মানুষের মনেব মূলে একমাত্র প্রেরণা যোগাইত। তাহার ফলে মানুষেব সামাজিক সংস্কৃতি বলিতে কিছু থাকিত না। বলা বাহুল্য, চার্ব্বাক বা লোকায়ত মতবাদ শুধু ব্যক্তিকেই বিভ্রান্ত করিয়াছে, শুধু বুদ্ধির কসরৎ হিসাবেই গবেষণাব উপাদান যোগাইয়াছে, কিন্তু কোনদিনই মানুষের সমাজ জীবনে তাহা সংক্রামিত হইতে পারে নাই। বস্তুত বহু বিপর্য্যয়েব মধ্যেও মানুষের জীবনের অনন্ত সত্তা সম্বন্ধে সচেতনত্ব তাহাকে সংস্থিত রাখিয়াছে এবং সেই আশ্বাসে সে আপনাব মহিমাকে পশু জীবনেব উর্দ্ধে উদারভাবে প্রসারিত করিয়াছে।

আমাদের চারিদিকে এই যে জগৎ রহিয়াছে, এখানে আমরা হঠাৎ আসিয়া পড়ি নাই। এই জগতের সঙ্গে আমাদের যে সম্বন্ধ তাহাকে কিছুতেই আকস্মিক বলা চলে না। বাস্তবিকপক্ষে জগতের সঙ্গে আমাদের

সম্বন্ধ যদি তেমনই আকস্মিক হইত এবং একান্তই অপরিচিতের মত এখানে আমাদের আবির্ভাব ঘটিত তবে ইহার সঙ্গে ভাবের সম্বন্ধ আমাদের পক্ষে এমন করিয়া জমাইয়া তোলা সম্ভব হইত না; কারণ সব সম্বন্ধের মূলে সূক্ষ্মভাবে স্মৃতিই কাজ করিয়া থাকে। প্রকৃতপক্ষে আমাদের মনের মূলে একটি পরম আশ্রয় রহিয়াছে। বিশ্ব-প্রকৃতিরও সেই আশ্রয় এবং এই আশ্রয়ের সম্বন্ধসূত্রেই জগতের সঙ্গে আমাদের আন্তরিক ভাবের আদান প্রদানের সম্পর্ক গড়িয়া উঠিয়াছে। আমাদের যিনি আত্মা বিশ্বেরও তিনিই আত্মা। আমাদের অন্তরে থাকিয়া বিশ্বের সঙ্গে তিনি আমাদের আপন ভাবনা "সূত্রে মণিগণা ইব" যোজনা করিয়া দিতেছেন। তাঁহারই আত্ম-চেতনার প্রণোদনার আলোকে আমরা বিশ্বকে আপনার করিয়া পাইতেছি; ভিতরে আশ্রয়ের সত্যময় অভিব্যক্তিতে বাহিরের মিথ্যা বিপর্য্যয়কে ভুলিতেছি। সুতরাং জগতের বিভিন্ন সম্বন্ধের ছন্দে আমাদের অস্তিত্ব বা জীবনের চেতনা সেই পরম আশ্রয়েব ভিত্তির উপরই প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। এই যে আশ্রয়, এ-আশ্রয়কে হারাইবার কোন মানুষের আশঙ্কা নাই। বাহিরের জগতের পরিবর্ত্তন ঘটিবে সত্য, কিন্তু অন্তরের আশ্রয়ে আমাদের সনাতন জগৎ আমাদের কাছেই থাকিবে। এই আশ্রয়ের অক্ষয়, অব্যয় এবং অনপেক্ষ ও অনায়াস সম্বলই মানুষের মনের মহিমাকে উজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছে এবং অনেকটা আমাদের অজানায় সেই আশ্রয়েরই বল আমাদের জীবনকে পূর্ণাভিব্যক্তির পথে লইয়া চলিয়াছে। প্রকৃতপক্ষে এই একান্ত আশ্রয়ের অসম্প্রজ্ঞাত অনুভূতি মানুষের জীবনের মূলে নিরবচ্ছিন্ন একটা সঙ্গতিকে জাগ্রত রাখিয়াছে। সেই সঙ্গতির জোরেই মানুষ মানুষ হইয়াছে, সে ত্যাগ করিতে শিখিয়াছে এবং ত্যাগের পথে সুখেরও সন্ধান পাইয়াছে।

মানুষ সুখ চায়—রামায়ণে রামচন্দ্র ভরতকে বলিলেন, "সুখভাজঃ প্রজাঃ স্মৃতাঃ"। এই সুখ মানুষকে অন্তর-রসে উজ্জীবিত ত্যাগের মূল্যেই ক্রয় করিতে হয়। ধন-জন প্রভৃতি স্বার্থের সম্পর্কে মানুষ অপেক্ষাকৃত যে সামান্য সুখ, তাহাও সে ত্যাগের মূল্যেই ক্রয় করে। ত্যাগ না হইলে কোন সুখই নাই। মোটামুটি ইহা সত্য যে, সুখের আকাঙ্ক্ষা মানুষের সহজাত এবং সেজন্য ত্যাগের প্রবৃত্তিও তাহার পক্ষে স্বাভাবিক। এই ত্যাগ বা যজ্ঞের পথে নিজেকে আহুতি দিয়া এবং দণ্ডে দণ্ডে পলে পলে এইভাবে মৃত্যুকে

বরণ করিয়া লইয়াই মানুষ জীবনের পথে অগ্রসর হইতেছে। অন্ধ জীবনের গতি কোন্ দিকে সম্প্রসারিত হইতেছে, সে জীবন কোথায় কেমন, মানুষ ইহা জানে না, বুঝে না। সে সম্বন্ধে তাহার সাক্ষাৎ-সম্পর্কে কোন জ্ঞান নাই এবং এই অজ্ঞানতার ফলেই মরণের হিসাবে সে যখন স্বার্থের রূঢ় আঘাতে সচেতন হয়, তখন বিভীষিকার মধ্যে পড়ে। নিত্য জীবনের ধারার মধ্যে একটা অন্ধ যবনিকার ব্যবচ্ছেদ দেখিয়া মানুষ যেন দিশাহারা হইয়া উঠে। মৃত্যুর এই যবনিকা কে উন্মোচন করিবে?

এ দেশের তত্ত্বদর্শী সাধকগণ এই যবনিকার উন্মোচন করিয়াছেন। তাঁহারা জীবনের সম্বন্ধে অত্যন্ত রকমের কোন অনিশ্চয়তার অবকাশ রাখেন নাই। অন্ধ প্রতিবেশের মধ্যে জীবনকে তাঁহারা আবদ্ধ রাখেন নাই। জীবনের একটা পরিপূর্ণতার অনুভূতিতে মৃত্যুর ব্যবচ্ছেদজনক বিভীষিকাকে তাঁহারা খণ্ডন করিয়াছেন। তাঁহারা বিশেষ জোরের সঙ্গেই একথা বলিয়া গিয়াছেন যে, বর্ত্তমান কালের অবস্থা অর্থাৎ শীত, বসন্ত প্রভৃতি ঋতু দেখিয়া যেমন অতীত এবং ভবিষ্যতের ঐ সব ঋতুর সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করা সম্ভব হয়, সেইরূপ বর্ত্তমান জীবনের সংস্থিতি এবং সঙ্গতি হইতে ভবিষ্যৎ জীবনের উপলব্ধিও সম্ভব হইতে পারে। কথাটা শুনিতে একটু অস্পষ্ট বলিয়া মনে হইবে। "মনঃ এব মনুষ্যাণাং কারণং বন্ধ মোক্ষয়োঃ", এ কথার অর্থ বরং বুঝা যায়; কিন্তু পরিবর্ত্তনশীল দেশ-কাল এবং পাত্রের পরিপ্রেক্ষায় পরিচ্ছিন্ন এই জীবনের কুজ্ঝটিকা ভেদ করিয়া ভবিষ্যৎ জীবনের সম্বন্ধে নিশ্চয়তা কিম্বা তজ্জনিত নিশ্চিন্ততা উপলব্ধি হইবে, অনুমান হইতে প্রমাণের পথে তেমন নিঃসংশয়িত প্রতিপত্তি সত্যই কঠিন হইয়া পড়ে। এদেশের সাধকগণ এই সমস্যার সমাধান করিতে গিয়া বলিয়াছেন, আমাদের বর্ত্তমান জীবনের এই যে প্রতিবেশ, তাহাও আমাদের গড়া নয়। গড়া নয় এই হিসাবে বলা চলে যে, আমরা বুদ্ধি খাটাইয়াও তৎসম্পর্কিত সিদ্ধান্তে বিনিশ্চিত থাকিতে পারি না। আশ্রয়তত্ত্বের আলোকেই তাহা আমাদের কাছে সাড়া দিতেছে। অর্থাৎ মনের মূলে ভাবঘন যে সংস্থান রহিয়াছে, তাহা হইতেই আমরা এ সম্বন্ধে আমাদের বিশিষ্ট জ্ঞান লাভ করিতেছি। দেহাত্ম-বুদ্ধির জন্য জীবনের মূলীভূত সেই স্বাশ্রয়ের দিব্যস্বরূপ আমরা উপলব্ধি করিতে পারিতেছি না; তাহার অনাময় প্রকাশ আমাদের কাছে উন্মুক্ত হইতেছে না। সে আশ্রয়ের

প্রতি আমাদের মন যতই নিষ্ঠিত হইবে, ততই এই পরিবর্ত্তনশীল প্রতিবেশের মধ্যেও অপরিবর্ত্তনীয় সনাতন জীবনের সত্যগুলি আমাদের দৃষ্টিতে উজ্জ্বল হইয়া উঠিবে।

প্রকৃতপক্ষে অন্তরের এই আশ্রয়ের প্রতি আমাদের মনের ঘনিষ্ঠতার উপরই তাহার বলিষ্ঠতা নির্ভর করে এবং বলিষ্ঠ মনের কাছেই সনাতন-জীবনে প্রতিষ্ঠার ব্রহ্মসূত্রটি অধিগত হইয়া থাকে। আমাদের হৃদয়ে যে দেবতা অন্তর্যামীস্বরূপে রহিয়াছেন, তাঁহার সঙ্গে প্রীতির সম্পর্ক স্থাপিত হইলেই আমাদের যমের ভয় দূর হয়, আমরা যতাত্ম অবস্থা লাভ করি। আমাদের প্রতি বিশ্বাত্ম দেবতায় প্রীতির ছন্দের উদার ও প্রাণময় স্পর্শে আমরা স্বচ্ছন্দ হইয়া উঠি; আমরা স্বারাজ্য পাই। ফলতঃ দেহগত স্বার্থের সঙ্কোচ আমাদের এইভাবে যতই কাটিয়া যায়, ততই জীবন ও গৌরবের প্রাচুর্য্য আমাদের সমগ্র প্রতিবেশকে মাধুর্য্যের মহিমায় অভিষিক্ত করে। আমাদের হৃদয়-শতদল তখন উজ্জ্বল হইয়া ফোটে, গন্ধ দেয়, ছন্দ দেয়, রূপকে জাগায়, রসকে ছড়ায়। ইহা হইতেই যজ্ঞের প্রতিষ্ঠা। কিন্তু বাহিরের আকর্ষণে আশ্রয়তত্ত্বের উদার অভিব্যক্তির এ গূঢ় এবং গভীর রহস্য যখন আমরা উপলব্ধি করিতে পারি না। ইহা সত্ত্বেও সুখের জন্য আমাদিগকে ত্যাগই করিতে হয়, যজ্ঞই করিতে হয়, কিন্তু সেই যে ত্যাগ, সে-ই যে যজ্ঞ, তাহা হয় স্বল্পার্থে। আমাদের আশ্রয় সেখানে প্রজ্ঞায় প্রদ্যোতিত নয়, স্বার্থের কুয়াশায় অস্পষ্ট, আভাসিত এবং অন্তবান্। নিত্যের সঙ্গে আমাদের মন সেক্ষেত্রে সংস্থিত নয়, এজন্য সত্যের প্রতি মনের চিরন্তন বিচিকিৎসার কাছে তাহা বিকৃত হইয়া পড়ে। স্থূলকে লইয়া এই যে আমাদের মূঢ়ভাবে ত্যাগ স্বীকার, অদক্ষিণ এই যে আমাদের যজ্ঞ বা দেহদান ইহাই মরণ, ইহাতেই আমাদের কর্মবন্ধন স্বীকার; অদৃষ্টের দুর্ভোগ এইখানেই। পক্ষান্তরে স্থূলকে ছাড়িয়া যাহা হইতে আমাদের মনে পুরাণী প্রবৃত্তি প্রসৃত হইতেছে, আমরা যখন সেই মূলকে ধরিতে পারি, অনিত্য বস্তুকে অতিক্রম করিয়া একান্ত সত্যের দিব্য লীলায় যখন আমাদের চিত্ত সংস্থিত হয়, সেই দিক আলো-করা রূপে যখন আমরা ডুব দেই, যখন প্রজ্ঞানঘন সেই প্রাণময় রসে নিমগ্ন হই, তখন আমাদের যে ত্যাগ, যে যজ্ঞ, নিজেকে উৎসর্গ করিয়া অন্তরের দেবতার চরণে তখন যে আমাদের দেহদান, তাহাতেই প্রকৃত জীবনে

আমাদের প্রতিষ্ঠা ঘটে। ভাগবতের ঋষি প্রশ্ন করিয়াছেন,—ভাবিয়া দেখ, কাহাকে তোমার দেহটি দান করিবে, শৃগালকে, কুক্কুরকে, শ্মশানের আগুনকে, না চিদৈশ্বর্য্য পরিপূর্ণ বিগ্রহ যাঁহার, এমন ভগবানকে ?

"কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম"—এ প্রশ্ন মানুষের চিরন্তন প্রশ্ন। দেখিতেছি তো আমাদের এই যে দেহ, ইহা লইয়া যাইবার জন্য নয়, লইয়া যাওয়াও যায় না ; কিন্তু কারে দিয়া যাব ? এ এমনই বস্তু যে, কাহাকেও প্রাণে ধরিয়া একান্ত করিয়া দেওয়া যায় না ; বীরবলের ভাষায় "রমণী ধরিলে ক্রোড়ে সব বুক নাহি জুড়ে।" আবার অন্য দিক হইতেও এই দেহ লইয়া আমাদের এক অদ্ভুত সমস্যা। যাহাকে এই দেহ দিতে যাওয়া যায়, তাহার কাছেই ইহা ভারী হইয়া উঠে এবং ছাড়াছাড়ির ব্যবধান বাড়িয়া মনের বঞ্চনা ও চাতুরী ধরা পড়িয়া যায়। "পরস্পরং মিথোভয়ং"। পরস্পরের মধ্যে ভয়কে কে জয় করিতে পারে ? খুঁজিলে এই সত্যই প্রতিপন্ন হইবে যে, এই দেহ সকলের পক্ষে বোঝা, কেহ এক মুহূর্ত্তের জন্যও এই দেহের সমগ্র ভার বহন করিয়া সাজা পাইতে রাজী নয়। এক মুহূর্ত্তও এই দেহকে স্বীকার করিয়া ইহার বিকার হইতে আমাকে একান্তভাবে রক্ষা করিতে পারে, এ জগতে এমন বুঝি কেহই নাই। তবে কাহার জন্য এই দেহভার বহন করিয়া ফিরিতেছি ? কোথায় সে মনের মানুষ ? যদি বলা যায়, তেমন কেহই নাই। ভ্রান্ত তুমি, একা আসিয়াছ, একাই তোমাকে যাইতে হইবে। সে কথাও যেন ফাঁকা হইয়া পড়ে। কারণ এই যে আমার দেহ এবং দেহসম্পর্কিত আমার ইন্দ্রিয়নিচয়, এগুলি তো আমি নিজে গড়িয়া লইয়া আসি নাই। আমার একান্ত অনুধ্যানের ফলেই আমাতে এগুলির উন্মেষ ঘটিয়াছে। যদি বলা যায়, অনুধ্যানও তোমার অবাস্তব কিন্তু তবে আমিও যে অবাস্তব হইয়া পড়ি এবং মননকেও অস্বীকার করিতে হয় ; কিন্তু আমি নিজেকে যতই অবাস্তব বলিয়া সিদ্ধান্ত করিতে চাই না কেন, মননের বাস্তব প্রভাব আমার ভিতরে কাজ করিবেই; সুতরাং মনের মূলে কাহারও খেলা চলিতেছেই। আমার অন্তরে এমন কেহ আপন আছে, যাহার সম্বন্ধে আমি সর্ব্বদা সচেতন রহিয়াছি। তাহার অস্তিত্বের প্রত্যক্ষ অনুভূতির আলোকের ঝলকে পলকে পলকে আমার চেতনা হইতেছে। কিন্তু যাঁহার পূজা করিব বলিয়া পাঁচ ফুলের এই ডালা সাজাইয়া ফিরিতেছি,

কোথায় সে ? কাহারো সঙ্গের রঙেই ভঙ্গহীন স্থায়ী ভাব আমাদের জীবনে যে জাগে না, মন গুমরিয়া উঠে। ছুটিয়া সরিয়া যায়—এ নয়, এ নয়।

এ দেশের সাধকেরা বলিলেন—আছে, সে একান্ত গোপন—অনঙ্গ দীপন। তোমার অন্তরের আগুন জ্বালাইয়া তোল, আহ্বান কর অগ্নিকে। বহ্নিকে পুরোগামী করিয়া অন্তরের দেবতার অভিসারে বাহির হও। যজ্ঞধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত হও। সে আগুন কোন সময়ের জন্য যেন নিভে না। সাগ্নিক তুমি, যজ্ঞপুরুষের সাক্ষাৎ মিলিবে। বহ্নিমধ্যে তাঁহার ধ্যানমঙ্গলরূপ স্মরণের পথে জাগিবে। তাঁহাকে পাইলে তোমার সব পাওয়ার শেষ হইবে—"নৈবাত্মলাভাৎ অধিমন্যতে পরং"। সেখানে অশেষ রসের উন্মেষ হইতেছে, তখন তুমি সেই রাজ্যে প্রবেশ করিবে। দেবতাকে সকল দানে তুমি প্রাণ পাইবে, সেই দানের অগ্নিময় ঝর্ণা-ধারায় একবার স্নান কর—তোমাব সকল অঙ্গ শীতল হইবে।

ঋষিরা বলিলেন, দেখিয়াছি, আমবা তাঁহাকে দেখিয়াছি, দেখিয়াছি সেই আদিত্যবর্ণ পুরুষকে, আগুনের মেখলায় জ্বালা বিস্তার করিয়া আমার অন্তরে তাঁহার লীলা চলিতেছে। আমার সব অবীর্য্য নিজের তাপে দগ্ধ করিয়া তিনি আমাকে জড়াইয়া ধরিতে চাহিতেছেন। দেখিয়াছি, অন্তরের বিজন বিপিনে সে চির নবীনকে, যাহার চাহনির চাতুরী আমাকে ভিখারী করিয়া বাহির করিয়াছে। এ দেহ নিরর্থক নয়, তাঁহাকে সমর্পণ করিবার জন্যই এই দেহ। পঞ্চেন্দ্রিয়ের দীপে সেই প্রাণের দেবতাকে আবত্তি করিতে পারিলেই আমার নিবৃত্তি। তিনি "সদা জনানাং হৃদিসন্নিবিষ্টঃ"। তিনি সর্ব্বদা আছেন এবং আমাদিগকে এক সময়ের জন্যও ছাড়েন নাই। সব দীপ যখন নিভিয়া যায়, তখনও তিনি আমার দিকে চাহিয়া শিবরূপে স্মিতমুখে জাগিয়া থাকেন। সব আলো যখন কালো হইয়া পড়ে, তখনও তিনি শরতের পূর্ণ শশধরের ন্যায় রজনীমুখ উজ্জ্বল করিয়া আমার মনের মূলে শুক্ল পক্ষের সুখময় জ্যোৎস্নার তরঙ্গধারা বিস্তার করেন। 'জ্যোৎস্নায়ৈ চেন্দুরূপিণ্যৈ সুখায়ৈ সততং নমঃ।'

সাধারণ দৃষ্টিতে আমরা দেহদান বলিতে যাহা বুঝি, বড় একটা কাজের বিপর্য্যয়কর আড়ম্বর এবং ভয়াবহ প্রতিবেশের মধ্যে নিজেকে বিসর্জ্জন দিবার প্রাণান্তকর উদ্যম সেক্ষেত্রে যেভাবে আমাদের কাছে ধরা পড়ে

এবং আমাদের মনে ভীতি ও দুঃসাহসিকতা জনিত একটা বিস্ময়ের সঞ্চার হয়, সাধনার ক্ষেত্রে দেহদান কিন্তু সাধকের পক্ষে ঠিক তেমন ব্যাপার নয়। এ ততটা দেওয়া নয়, যতটা পাওয়া। আমাদের কাজের হিসাব সেখানে থাকে না, থাকে শুধু প্রভাব। এই প্রভাবের মধ্যে সেখানে আপনাকে পূর্ণ করিয়া পাওয়ার প্রজ্ঞানময় স্পর্শ আছে। বস্তুতঃ বাহ্য-ইন্দ্রিয়ের ব্যবধানাত্মক সন্ধানে প্রাণরসের তেমন পূর্ণতা লাভ করা সম্ভব হয় না। সাধক পরম আত্মীয়তার লীলাময় অনুধ্যানে ডুবিয়া গিয়া দেহমন ও প্রাণের অভূতপূর্ব্ব এক পরম সঙ্গতি এক্ষেত্রে লাভ করিয়া থাকেন। আপনাকে দিয়া আপনার সবস উন্মেষের সার্থকতাই তিনি আস্বাদন করেন। হৃদয়ের প্রগাঢ় একাত্মতার সংবেদনে দেহ সেখানে নিত্য জীবনের দিব্য-চেতনাতে আপনাকে পায়। অভীষ্টের মাধুর্য্যময় সূর্য্যকিরণের অনুদিন স্নানে তাঁহার জীবন শতদলের মত বিকশিত হইয়া অপরিম্লান আত্মমহিমায় প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকে। বৈষ্ণব বলেন, 'কৃষ্ণ অর্থে সেই ত্যাগ, ত্যাগ কভু নয়'।

পরম আশ্রযেব আত্যন্তিক প্রগাঢ় স্পর্শপ্রভাবে চিত্তেব এই যে প্রদীপ্তি এবং দেহ ও তৎসম্পর্কিত ইন্দ্রিয়নিচয়ের এমন যে সরস পবিস্ফূর্ত্তি, জীবনের এই যে দ্বিজত্ব, ইহার একটা ধারা আছে অর্থাৎ ক্রম রহিয়াছে। অন্তর যতই আশ্রয়ের সংস্পর্শ নিবিড়ভাবে লাভ করিবাব জন্য উন্মুখ হয়, ততই অনন্ত জীবনের উদযেব রাজ্যে অভয়ত্বেব বীর্য্য এবং প্রাণের প্রাচুর্য্য ও বসের প্রাখর্য্য উন্মুক্ত হইতে থাকে এবং অন্তরে নিষ্ঠিত পরম আশ্রয় হইতে পরিব্যাপ্ত উচ্ছল শক্তিব উন্মেষ ও আনুকূল্য সাধকের সমগ্র প্রতিবেশকে ছন্দোময় এবং আনন্দময় করিয়া তোলে। এই অবস্থায় ঋষিগণ, মুনিগণ তাঁহাকে সাহায্য করিতে অগ্রসর হন। দেবগণ তাঁহার সহযোগিতা করিতে ব্যাকুল হইয়া পড়েন।

কথাগুলি বাহিরের বিচারে নিতান্তই ভাবুকতা বলিয়া মনে হইতে পারে ; কিন্তু আধুনিক বৈজ্ঞানিক জগতেও প্রেততত্ত্বের অনুশীলনের পথে লোকান্তরিত আত্মার সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টার কথা তো আমাদের অপরিজ্ঞাত নহে। কিন্তু এ সম্বন্ধে আধুনিক যে পদ্ধতি, তাহাতে মননের

প্রগাঢ়তার একান্ত অভাব রহিয়াছে বলিয়া মনে হয়। এজন্য পরলোকগত আত্মার সঙ্গে তাহার দ্বারা সাময়িকভাবে সম্পর্ক স্থাপন সম্ভব হইলেও সমস্যা তাহাতে মিটে না; প্রত্যক্ষতার বল মনের সব অংশকে উদ্দীপ্ত করিয়া তাঁহাদের আবির্ভাব একান্ত এবং অব্যবহিত করিতে সমর্থ হয় না। বস্তুতঃ জাগতিক স্থূল সম্পর্কগত আত্মীয়তার যে তাপ, লোকান্তরে তাহা আর তেমন থাকে না, তাহার মাপ ব্যবধানের জন্য বদলাইয়া যায়। এইরূপ পরিবর্ত্তনের দুইটি কারণ আছে; প্রধানতঃ নূতন পরিবেশেব মধ্যে গিয়া আত্মা সংমূঢ় হইয়া পড়ে, তাহার স্মৃতিভ্রংশ দেখা দেয় এবং কোন কোন আত্মা আবার দীপ্ততর মহিমায় অধিষ্ঠিত হইয়া থাকেন। প্রথমোক্ত আত্মার পক্ষে আমাদের স্থূল মননের ধারায় বিস্তার করিবার মত বেদনার প্রখরতা থাকে না কিম্বা সে সামর্থ্যের অভাব ঘটে। দ্বিতীয়ত, ব্যাপ্ততর জীবনের মহিমায় সে সব আত্মা অধিষ্ঠিত হন, আমাদের জিজ্ঞাসার স্থূলতায় শিথিল মনন সে রাজ্যে প্রবেশ করিতে পারে না। আমাদের সম্পর্কে তাঁহাদের ক্রিয়াকে আমরা ধরিতে বা বুঝিতেও পারি না। সেগুলি আমাদের জীবনে পরোক্ষ হইয়া পড়ে।

প্রকৃতপক্ষে যাঁহারা এই জীবনকে ব্যাপ্তির বেদনায় উদ্দীপ্ত করিয়া নিত্য সত্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন, বস্তুতঃ যাঁহারা ঋষিত্ব লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের জীবন, বচন এবং আদর্শের মনন ও অনুধ্যানের পথেই মনকে অনাবিল কবিয়া তবে ততখানি উঁচুতে তোলা সম্ভব হইতে পারে। এই সব লোক-গুরুগণের সর্ব্বতোদীপ্ত বেদনার সঙ্গে আমাদের চিত্তকে যোজনা করিয়া আমাদের জিজ্ঞাসাকে দেশ, কাল এবং পাত্রেব পরিচ্ছিন্নতা হইতে মুক্ত করিতে পারি এবং তখনই সুদূর-প্রসারী সত্য সম্পর্কে আমাদের মন সম্যক্‌রূপে উদ্বুদ্ধ হয়। ইহা কৌতূহল নিবৃত্তির জন্য একটা খেলাখেলি ব্যাপার নয়। প্রকৃতপক্ষে মন্ত্রের সাধনায় গুরুতত্ত্বে নিবিষ্ট আমাদের মন ঋষিদের কৃপায় যুক্ত হইলেই আমাদিগকে পুষ্ট করিতে সমর্থ হয়। মন তখন ক্ষুদ্রতার বন্ধন হইতে ত্রাণ পায়। অন্ধকার তখন কাটিয়া যায় এবং যাহা অদৃষ্ট বলিয়া অনিশ্চিত আতঙ্কের বিষয় থাকে, তাহাও দৃষ্ট হইয়া পড়ে এবং আমাদের বুদ্ধি বিনিশ্চিত হইয়া থাকে। চিত্তের অশান্ত বিক্ষোভ এবং উত্তেজনা সে অবস্থায় দূর হইয়া যায়, এবং একান্ত সান্ত্বনা লাভ করিয়া

আমরা স্থির হইতে সমর্থ হই। আমাদের বিভিন্ন শাস্ত্রে এই ঋষিবর্গের উল্লেখ করা হইয়াছে। ভাগবত বলেন,—

"কুমারো নারদ ঋভুরঙ্গিরা দেবলোঽসিতঃ,
অপান্তরতমা ব্যাসো মার্কণ্ডেয়ো চ গৌতমঃ,
বশিষ্ঠো ভগবান্ রামঃ কপিলো বাদরায়নি।
দুর্ব্বাসা যাজ্ঞবল্ক্যশ্চ জাতুকর্ণস্তথারুণিঃ,
রোমশশ্চ্যবনো দত্ত আসুরিঃ সপতঞ্জলিঃ,
ঋষির্বেদশিরা ধৌম্যো মুনেঃ পঞ্চশিখস্তথা,
হিরণ্যনাভঃ কৌশল্যঃ শ্রুতদেব ঋতধ্বজঃ,
এতে পরে চ সিদ্ধেশাশ্চরন্তি জ্ঞানহেতবঃ"॥

বৈষ্ণবশাস্ত্রে ইহাদিগকে শক্ত্যাবেশ অবতার বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে—"শক্ত্যাবেশ সনকাদি পৃথু ব্যাস মুনি।" দক্ষ প্রজাপতির শাপে নারদের পা দুখানার বিবাম নাই। দক্ষের ছেলেদিগকে সন্ন্যাসী করিয়া ঘরের বাহির করেন, এইজন্য দক্ষ তাঁহাকে শাপ দিয়াছিলেন। নারদ সেই শাপকে বররূপে গ্রহণ করিয়া স্বর-ব্রহ্মের ঝঙ্কারে আবিষ্ট থাকিয়া হৃষীকেশের পদাম্বুজে অখণ্ডভাবে চিত্তকে নিবিষ্ট করিয়া সকলের দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। নারদ বলেন, আমার নিজের কোন কষ্ট নাই; কিন্তু জগতের লোকের বেদনাতে আমি স্থির থাকিতে পারি না। তাহাদের দুঃখ কষ্টের নিবৃত্তি-সাধনই আমার পরম ব্রত। প্রকৃত পক্ষে ঋষিগণই সদ্ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠাতা। আমাদের প্রতি তাঁহাদের কৃপার পার নাই। সে কৃপার কথা স্মরণ করিলে অঙ্গ পুলকিত হইয়া উঠে। তাঁহারা আমাদের অধিকারের উপযোগীভাবে ভগবানকে সাজাইয়া গোজাইয়া আমাদের মনের মত করিয়া আমাদের জন্য উপস্থিত করিতেছেন। তাঁহারা বিশ্বাশ্রয় যে দেবতা তাঁহার আশ্রয় আমাদিগকে দিতেছেন। তাঁহাদের কৃপা হইতে আমরা কেহই বঞ্চিত নহি। বহুর মধ্যে একত্বের প্রতিষ্ঠা ভারতীয় সভ্যতার এই বৈশিষ্ট্য, ঋষিদেরই শক্তিতে নিত্য পরিস্ফূর্ত্ত রহিয়াছে এবং বিশ্বমানবের মিলনের ক্ষেত্র প্রশস্ত করিতেছে।

আবির্ভাবকে উপলব্ধি করা অত্যন্তই বিরল। প্রকৃতপক্ষে ধর্ম্মপদের এই শ্লোকটি খুবই তাৎপর্য্যপূর্ণ। ইহার দ্বারা গোটা সাধন-পদ্ধতিকে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। বস্তুতঃ মানুষের মন সর্ব্বদা চঞ্চল এবং বিক্ষিপ্ত। ঋষিগণ সেই মনকে একান্ত আশ্রয় দিতে পারেন। তাঁহাদেরই কৃপায় জীবন বন্ধন হইতে মুক্ত হয়; সাধ্যকর মন প্রথমে বহিরাকাশের উন্মুক্ত প্রাণপূর্ণ বাতাসের স্পর্শ পায়। বহিরাকাশ হইতে অন্তরাকাশে, অন্তরাকাশ হইতে হৃদয়াকাশে মন প্রবিষ্ট হইয়া পবে চিৎশক্তির বিলাস-রসে প্রাণের প্রাচুর্য্যে পরিপুষ্টি লাভ করিয়া থাকে। ভগবান নরনারায়ণ ঋষিগণের নিয়ন্তা বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন। তিনি ঋষিদের ঋষভ এবং পরমহংস-পরমগুরু। এই ভারতে পৃথিবীব তাপিত জনগণের প্রতি অনুগ্রহ করিবার উদ্দেশ্যে তিনি আকল্প দুরন্ত তপস্যায় প্রবৃত্ত আছেন। নারদাদি ঋষিগণ ইঁহাব দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকেন। বৈষ্ণব শাস্ত্র বলেন—"কৃষ্ণকে কহযে কেহ নবনারায়ণ"।

প্রকৃতপক্ষে ঋষিদের কৃপায় আত্মতাময় এবং অভয়ত্বপূর্ণ অভিব্যক্তি মনকে সংস্থিতি দেয় এবং তখনই মন্ত্রের সাধনা আরম্ভ হয়, দীক্ষা বা গুরুকরণ ঘটে। জড় মনকে নিজেদেব উদার মহিমায় অশেষ বিকাব হইতে উদ্ধাব কবিতে ঋষিরাই সমর্থ। যিনি মনকে সকল সময়ে সঙ্গ দিতে পারেন, তিনিই গুরু। সাধু বহু, কিন্তু গুরু এক। সাধুর উপাধি আছে, কিন্তু গুরুর উপাধি নাই। মনের মূলে সাধুদেব সন্তর্পণ যখন তখন, গুরুর সন্তর্পণ সর্ব্বক্ষণ। কিন্তু সাধুদের ধবিয়া তবে গুরুর কাছে যাইতে হয।

এই সব লোক-গুরু কিংবা ঋষিবর্গের সম্পর্কে গিয়া মন যে একান্ত আশ্রয় লাভ কবে, তাহা সনাতন এবং চিন্ময়। বৈষ্ণব সাধকগণ বলেন, মূল সঙ্কর্ষণ হইতেই ঋষি ও গুরুবর্গের বিস্তার ঘটিয়া থাকে। তিনি ভক্তস্বরূপ। ভগবানেরই ক্রিয়াশক্তি। মহাভারতে ঋষি সনৎ-সুজাত মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের কাছে এই তত্ত্বের ব্যাখ্যা করিতে গিয়া বলিয়াছেন, "পুরাণ অর্থাৎ সনাতন এবং নিত্য-নূতন এই যে আশ্রয়, ইহাতে যাঁহাদের মন নিষ্ঠিত হয়, প্রকৃত-পক্ষে তাঁহারাই মনীষী। এই আশ্রয়ে মন প্রতিষ্ঠিত হইলে তখন নিঃশ্রেয়স লাভ হয়। শ্রেয়ের সংযোগ হইলে মনের সর্ব্ববিধ বিকার কাটিয়া যায়। সাধক তখন ইহকাল ও পরকালের ব্যবধান অতিক্রম করিয়া নিরবচ্ছিন্ন জীবন লাভ করিয়া থাকেন। ভাগবতেও আমরা এই উক্তিরই প্রতিধ্বনি

শুনিতে পাই। ভাগবত বলেন, মনের একান্ত তৃষ্ণা লইয়া অধ্যাত্মসাধনার অনুশীলন করিতে করিতে ভাগবত বা ভক্তের সঙ্গ লাভ হইলে নিশ্রেয়সকে উপলব্ধি করা যায়। এ অবস্থায় ভগবানে মন অচলভাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকে। বলা বাহুল্য, এখানে ভাগবত বা ভক্তের সঙ্গ বলিতে ভক্তের স্বরূপ তত্ত্বগত আত্মভাবেব সহিত চিত্তের সংশ্লেষ বা ঘনিষ্টতার কথাই বলা হইয়াছে। ভক্তের সম্বন্ধে মর্ত্ত্যবুদ্ধিতে মন বাধিত হইলে স্মরণ ও মননের পথে তাঁহাদের সন্নিকর্ষ বা আনুকূল্য লাভ করা সম্ভব নয় এবং সঙ্গ বলিতে অন্তরের একান্ত সংযোগেব ভাবই প্রকৃতপক্ষে বোঝায়। এইরূপে আমরা ভক্তের সহিত ঘনিষ্ঠতায় ভক্তের তৎগত চিত্তবৃত্তিকে আশ্রয় করিয়া শ্রীভগবানের প্রেমের প্রভাবে পড়ি। তুলসীজী এই তত্ত্বেরই একটু বিস্তার করিয়া বলিয়াছেন—"রাম সিন্ধু, ঘন সজ্জন ধীরা, চন্দনতরু হরি, সন্ত সমীরা। তাতঃ ভকতি অনুপম সুখ মূলা, মিলই যো সন্ত হোই অনুকূলা।"

বাঙলার বৈষ্ণব একেবারে আশ্রয়তত্ত্বের স্বরূপের গোড়ায় গিয়া ধরিয়াছেন, বিস্তাব ছাড়িয়া তাঁহারা সাক্ষাৎ-সম্পর্কেই স্বরূপের সাক্ষাৎ চিদাকারের সম্পর্কে যাইবারই সৌভাগ্য লাভ করিয়াছেন। তাঁহাদের ভগবানই নিজে আসিয়া তাঁহাদের কাছে ধরা দিয়াছেন। বোধ হয়, সেইজন্যই বিশ্বকর্ম্মে তাঁহার ক্রিয়াশক্তির সাড়া ধবিয়া ফেলা তাঁহাদের পক্ষে কঠিন হয় নাই। প্রত্যুত, ভগবানই তাঁহাদের জন্য ভাবিতে বসিয়াছেন, এই সত্যের অনুভূতিতে ভাবিতভগবানের অর্থাৎ প্রেম-প্রভাবিত অচল ভাবটি অধিগত হওয়া তাঁহাদের পক্ষে স্বাভাবিক হইয়াছে। তাঁহাবা বলেন, "প্রেমসিন্ধু গোরা রায়, নিতাই তরঙ্গ তায়।" "সনকাদি ভাগবত শুনে তাঁব কাছে।" ঋষিরা গুরুরই অনুগত।

অচল ভাবের বৈভবেব এ উজ্জ্বল রাজ্য। সেখানে রঙ্গ বিনা নাহি অঙ্গ, ভাব বিনা নাহি সঙ্গ। বস্তুতঃ আশ্রয়তত্ত্বের স্বরূপে একান্ত সমাহিত না হইলে এ উদয়ের রাজ্যে প্রবেশের অধিকার জন্মে না। প্রকৃতপক্ষে লোক-গুরুগণের আশ্রয়ে মনের গতি উত্তরোত্তর সম্প্রসারিত হয় এবং তাঁহাদের আনুকূল্যমূলক সংবেদনে স্নিগ্ধ হইয়া ও আপ্যায়নশীল অনুগ্রহের আত্মন্নপনধর্মে শুদ্ধতা লাভ করিয়া আমাদের অন্তর তখন দিব্য রসের ছন্দে উপচিয়া উঠে ; এই অবস্থায় চিৎশক্তির বিলাস আমাদের দেহে, মনে প্রাণে বিক্রীড়িত এবং উল্লসিত হয়।

সে রাজ্য এমন যেখানে সকলেই আপন। কেহ আর কাহাকেও দূরে ফেলিতে চায় না। স্পর্শদোষের বাতিক বা ছুঁৎমার্গের প্রভাব সে দেশের মলয়ঙ্গ-মহিমায় নাই। কোন সঙ্কোচ বা দ্বিধা সেখানকার আলিঙ্গনে ব্যবধান সৃষ্টি করে না। সেখানে সকলেই অপরকে কোলে তুলিয়া লইবার জন্য বাহু বাড়ায় এবং মিষ্ট কথায় দৃষ্টি ছড়ায়। সে রাজ্যে আর ছাড়াছাড়ি নাই, আছে কেবল কে কাহাকে কেমন করিয়া আপনার করিবে, এজন্য কাড়াকাড়ি। প্রাকৃত এ জগতে এমন অতীন্দ্রিয় রসের রীতি বা প্রকৃতি জানা যায় না। এ জগৎ সে রহস্য বুঝে না। চিন্ময় সে রস-স্ফূর্ত্তির আনন্দে যাঁহাদের গতি স্বচ্ছন্দ হইয়া উঠে, এই বিষয়-বিচারের বাছাবাছি এবং বৈষম্যময় জগৎ তাঁহাদের কাছে বিলীন হইয়া পড়ে। এ জগতের কাছে অনেক ক্ষেত্রেই এমন অবস্থায় সাধকদের বিচার-বিমূঢ়তাই প্রতীত হয়। আত্মীয়তার অবাধ এবং উন্মুক্ত আকাশতলে অনাহত ছন্দে ঝঙ্কৃত আত্মমাধুরীর আপন-ভোলানো, আপন-মজানো সেই উজ্জ্বল প্রতিবেশে লৌকিক সংস্কার-সম্মত নীতির হিসাবের সকল দৈন্য চুকিয়া যায়।

বস্তুতঃ প্রকৃত যিনি প্রেমিক লৌকিক নীতির 'কোড' তাঁহার কাছে অকেজো হইয়া পড়ে। তাঁহার জীবন বিশ্বজগতের মূলীভূত সত্যের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হওয়াতে সব নীতি তাঁহার জীবন-চেতনাতে স্বাভাবিক-ভাবেই সার্থক হইয়া উঠে। এমন স্তরেব যাঁহারা সাধক রাজপথের ল্যাম্পপোষ্টের আলো দেখিয়া চলিবার ভীরুতা তাঁহাদের থাকে না এবং নিজেদের নিরাপত্তার জন্য পৌর-পুলিশের পাহারার সম্বন্ধেও তাঁহাদের সতর্ক চেতনার প্রয়োজন হয় না। বস্তুতঃ আত্মমহিমার অনিরুদ্ধ ঔদার্য্য এবং মাধুর্য্যের আকর্ষণে আপনাকে নিবেদন করিবার কণ্টকময় অ-পথে ও বিপথেই তাঁহাদিগকে ছুটিতে হয়। উদ্ধব শুধু জ্ঞানী ছিলেন না, তিনি রসিক ছিলেন, চতুরও ছিলেন যথেষ্ট। এজন্যই মথুরার রাজপথ ছাড়িয়া তিনি বৃন্দাবনের অ-পথ-বিপথের ধারে তৃণ-গুল্ম, লতা হইতে কামনা করেন। তিনি জানিতেন, গোপিকাদের কৃষ্ণাভিসারে গতির রীতি। সাধারণ দৃষ্টিতে সাধকদিগকে এমনই বোকা হইয়া পড়িতে হয়, কিন্তু উপায় কি? প্রেম এমনই অন্ধ। প্রকৃত প্রেমের রাজ্যে লৌকিক নীতির স্থান খুব উচ্চ নয়, সেগুলি নিম্নস্তরেরই নিরিখ। নিজের হিসাবে সতর্ক থাকিয়া দৃষ্টিপূতভাবে পা ফেলাতেই সে

পন্থের গতিতে যত জ্বালা। এসব কার্পণ্য, দৈন্য—লাবণ্যময় জীবনের বদান্য-মহিমা ইহাতে নাই। প্রকৃতপক্ষে নিজের হিসাব ভুলিবার মধ্যে আমরা যে অদ্ভুতা দেখিতে পাই, শ্রীভগবানের প্রতি একান্ত অনুরাগান্ধ সেই আলোক-ধারার উজ্জ্বল ছন্দে চলাই লীলা এবং সেই লীলারসেই জগতের মূলীভূত নীতি বা নিয়ম বিধৃত রহিয়াছে। এইটি জীবনে সহজ করিয়া লইতে পারিলে আর রাজদণ্ডে সাজার ভয় থাকে না। বিশ্ব-বিধাতার বিধান প্রাণের মহিমায় প্রদ্যোতিত হয় এবং সর্বত্র তাহার মাধুর্য্য আমাদিগকে অবীর্য্য হইতে রক্ষা করে। এই অবীর্য্য অতিক্রম করিয়া মানুষের স্বরূপ ধর্ম্মের মূলীভূত উদার মাধুর্য্যের মর্ম্মে অনুপ্রবিষ্ট হওয়াতেই দেহদানের সার্থকতা রহিয়াছে। ইহা মরণ নহে, নিত্য সত্যের প্রগাঢ় সংস্পর্শে "রসময় দেহের গঠনে" উজ্জীবন লাভ। এ অবস্থায় সাধন করিলে আমরা বিশ্বের মধ্যে ভগবৎ-কার্য উপলব্ধি করি, ভগবানের কর্মময় মূর্ত্তি আমরা প্রত্যক্ষ করি, তাঁহার যজ্ঞমূর্ত্তি দেখি। বিশ্বের সকল ভাবে আমরা আমাদের জন্য তাঁহার তাপ অনুভব করি। আমাদের জীবনে তখন যৌবনের মহিমা জাগিয়া উঠে। শীতের অবসানে আড়ষ্ট দেহের আচ্ছাদন ফেলিয়া দিয়া মুক্তমলয়জের লীলাকে আস্বাদনের মতই প্রাণময় সে অনুভূতি। প্রকৃতপক্ষে "দেহে আত্মবুদ্ধি হয় বিবর্ত্তের স্থান"। আমাদের হৃদয়ে সেবার প্রবৃত্তির সর্বাঙ্গীণ উন্মেষে এই বুদ্ধির যখন নির্ব্বাণ ঘটে, অর্থাৎ দেহটি অভীষ্টের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে উৎসর্গীকৃত হয়, তখনই জীবনের মূলীভূত নিত্য সত্য প্রাচুর্য্যের মধ্যে পরিস্ফূর্ত্ত হইয়া উঠে। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়—

"তখনই বুঝিতে পারি,
আছি আমি, একান্তই আছি।
মহাকাল-দেবতার অন্তরের
অতি কাছাকাছি মহেন্দ্র-মন্দিরে।
জাগ্রত জীবন-লক্ষ্মী পরায় বিজয় মাল্যখানি
উন্নমিত শিরে।"

মরণ রে তুঁহু মম শ্যাম সমান

বাংলা দেশের বৈষ্ণব সাধনা, শুধু বৈষ্ণব-সাধনা কেন, সমগ্র ভক্তি-সাধনায় ঋষিদের ভাবনা এবং তাঁহাদের ক্রিয়া সম্বন্ধে সচেতনতা অনেকটা

চাপা পড়িয়া ভাবের দিকটা ফাঁপিয়া উঠিয়াছে বলিয়া মনে হয়। প্রকৃতপক্ষে অনেকটা স্থূলরূপেই এই বিচার। সাধনায় অন্তর্নিহিত উপলব্ধির দিক হইতে ইহা নয়। বাংলার ভক্ত সাধকেরা একেবারে গোড়াকে ধরিয়া ফেলিয়াছেন, একথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, কিন্তু গোড়াকে ধরিলে পত্র-পল্লব-পুষ্পসমন্বিত গোটা গাছটিকেই ধরা হয়। ব্যাপারটা এই যে, গৌড়ীয় বৈষ্ণবের অন্তরঙ্গ-সাধনায় ঋষিদের ক্রিয়া মন্ত্রলিঙ্গে ব্যবচ্ছিন্নভাবে ধরা পড়ে না। ভগবানের নিজস্ব মূল বীজের গুপ্তলীলায় সেই সাধনায় দীপ্ত হইয়া ফুটে। এ সাধনায় ঋষিদের ক্রিয়ায় অনুভবের ক্ষেত্রে স্বতন্ত্রভাব থাকে না, কারণ, উজ্জ্বলপ্রেমের আত্মারামগণা-কর্ষী মহিমায় সে ক্রিয়া অনুভাবিত হইয়া পড়ে। প্রকৃতপক্ষে ভাব বস্তুটি হার্দ্দ্য হইলেও তাহাকে জ্ঞানেরই সূক্ষ্মক্রিয়া বলিতে হয় এবং অহঙ্কারের বীজ তাহাতে খুব সূক্ষ্ম আকারে হইলেও কিছু না কিছু থাকে, কিন্তু প্রত্যক্ষানুভূতি উচ্চতর ব্যাপার। নিজ সুখ-স্বার্থের সম্বন্ধ সেখানে কিছুই থাকে না। এ অবস্থায় ভগবৎ-প্রেম দেহ এবং জগৎ সব আচ্ছন্ন করিয়া সেবাকেই সর্ব্বভাবে দীপ্ত করিয়া তোলে। বাংলার বৈষ্ণব-সাধন-মার্গে ঋষিদের গুরুভাব এমন অনুভবের প্রভাবে সেবার চাতুরীরসে সঞ্চারী হইয়া থাকে। বস্তুতঃ ক্রিয়াটি থাকেই এবং ঋষিদের সে ক্রিয়ার বহুবিধ বিচিত্র বিলাস এ সাধনাতেও রহিয়াছে, অনেক রহস্যও তাহার সঙ্গে বিজড়িত আছে। বস্তুতঃ শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং তাঁহার পার্ষদগণের কৃপায় বৈষ্ণব-মন্ত্রের বীর্য্যের মধ্যে ঋষিশক্তির অশেষ ঔদার্য পরম মাধুর্য্যে অভিব্যক্ত হইয়াছে। "কৃষ্ণ যবে অবতরে সর্ব্বাংশ আশ্রয়"—অংশাবতার, গুণাবতার এবং শক্ত্যাবেশ অবতার, ইঁহারাও সেই সঙ্গে থাকেন, সকলে আসিয়া তাঁহার সঙ্গে মিলিত হন, সুতরাং কৃষ্ণের সঙ্গে নরনারায়ণও থাকিবেন এবং তাঁহার নিয়ন্ত্রণাধীনে ঋষিগণও থাকিবেন, ইহা স্বতঃসিদ্ধ ব্যাপার। কৃষ্ণের সঙ্গে যখন ইঁহারা আছেন, তখন মহাপ্রভুর সঙ্গেই বা থাকিবেন না কেন? মহাপ্রভু তো কৃষ্ণতত্ত্বেরই পরিস্ফূর্ত্ত প্রকাশ, সেই প্রেমলীলারই তাহাতে বিবর্ত্তবিলাস। সুতরাং মহাপ্রভুর সঙ্গে নরনারায়ণও আছেন এবং তাঁহার নিয়ন্ত্রণাধীনে ঋষিদের কাজও চলিতেছে। নরনারায়ণের নিয়ন্ত্রণাধীনে ঋষিদের ক্রিয়াকে আশ্রয় করিয়া ভারতের বিশিষ্ট সভ্যতা বহু বিপর্য্যয়ের মধ্যেও যুগে যুগে অখণ্ডভাবে বিকশিত হইয়া

উঠিতেছে এবং বিশ্বের উপর প্রভাব বিস্তার করিতেছে। এমন কোন শক্তি নাই, যাহা ইহার অন্যথা ঘটাইতে পারে। ভারতকে খণ্ড করিবার যত দম্ভ, যত দর্প সবই এই হিসাবে দুই দিনের বলিয়া মনে হইবে।

লঘু ভাগবতামৃতে এ-তত্ত্বের বিস্তার আছে এবং ললিতমাধবে তাহার একান্ত গূঢ় তাৎপর্য্য নিহিত রহিয়াছে। ঠাকুর নরোত্তম সাধনার নির্দ্দেশ দিতে গিয়া বলিয়াছেন, "সাধু, গুরু, শাস্ত্রবাক্য, হৃদয়ে করিয়া ঐক্য।" প্রকৃত পক্ষে ঋষিদের শক্তি সাধু এবং গুরুর ভিতর দিয়া প্রকটিত হইয়া থাকে এবং শাস্ত্রসমূহের বিধান নির্ণয় এবং প্রয়োগের কর্ত্তৃত্ব তাঁহাদেরই হাতে। ঋষিরাই এইরূপে প্রত্যক্ষভাবে আমাদের জীবনের পরিপালন, পরিরক্ষণ এবং পরিপোষণ করিতেছেন। তাঁহাদের শাসন-বিধি স্বরূপে শাস্ত্র আমাদিগকে যে ভাবেই হোক্ মানিয়া চলিতে হইতেছে। গীতায় শ্রীভগবান বলিয়াছেন, 'পিতাঽহমস্য জগতো মাতা ধাতা পিতামহঃ'— বিশ্বের সঙ্গে ভগবৎ-শক্তির প্রত্যক্ষ প্রভাবের এই যে সম্পর্ক, কেহ কেহ ইহা স্বীকার করিতে চাহেন না। তাঁহাদের যুক্তি এই যে, জগতের সঙ্গে ভগবানের যদি ঐরূপ আত্মীয়তার সম্পর্কই সত্য হইত তবে এ জগতে দুঃখকষ্ট বলিতে কিছুই থাকিত না। বাস্তবিক বিচারে ইহাদের এমন যুক্তি নিতান্তই স্থূল। মনে হয়, ইহারা জগতের কেবল জড় দিকটাই বুঝেন অর্থাৎ আপাতগ্রাহ্য বাহ্য দিকটাই শুধু ইহাদের নজরে পড়ে। ইহার চিৎ এবং আনন্দের দিকও যে ইহার একটি রহিয়াছে, ইহারা গভীরভাবে তাহা উপলব্ধি করিতে চাহেন না। কিন্তু জগতের সঙ্গে আমাদের মনের সম্পর্ক স্বচ্ছন্দভাবে ফুটাইয়া তুলিতে হইলে জগতের সঙ্গে আমাদের চিৎ-সম্বন্ধের এই দিকটাও মানিতে হয়। এইভাবে বিশ্বের মূল নীতির সঙ্গে আমাদের পরিচয় ঘটে। আধুনিক জ্ঞান, বিজ্ঞানেরও ইহাই পথ। সুতরাং এ জগতে শুধু সৎ-ই নাই, চিৎ আছে এবং আনন্দও রহিয়াছে। প্রকৃত প্রস্তাবে অসৎস্বরূপে প্রতীয়মান এই পরিবর্ত্তনশীল জগতের মধ্যে বহুরূপে বিক্রীড়িত ভগবানের শক্তি রহিয়াছে। ইহাকে সন্ধিনী-শক্তি বলা হয়। ভগবান্ এই শক্তিকে আশ্রয় করিয়া সর্ব্বভূতে অনুপ্রবিষ্ট আছেন। এই অনুপ্রবেশ আবার চিৎ-শক্তিতে অর্থাৎ খণ্ড হইতে অখণ্ডের অব্যবহিত উপলব্ধির আলোকে উদ্ভাসিত হইতেছে, অর্থাৎ একের পথে নিষ্ঠার মধ্যে

যাইতেছে, অর্থাৎ ভগবান্ বহু হইয়া আপনাকেই উপলব্ধি করিতে চাহিতেছেন এবং সর্ব্বোপরি আনন্দময়ী তাঁহার অন্তরঙ্গা শক্তি তাঁহাকে প্রভাবিত করিতেছে। আনন্দই এ লীলার মুখ্য উদ্দেশ্য। ভগবানের এই স্বরূপতত্ত্ব উপলব্ধিব ভিতর দিয়াই এবং তাঁহারই অংশস্বরূপে বা তাঁহার সেবাকে স্বীকার করিয়াই আমাদেরও স্বরূপতত্ত্ব উপলব্ধি সম্ভব হইতে পারে। তাঁহাকে স্বীকার করিতে পারিলে তবে আমাদের মনের স্থিতি হয়, স্ফূর্ত্তি হয় এবং পরে নিবৃত্তি ঘটিয়া থাকে। সৃষ্টির ভিতর দিয়া ভগবৎ-শক্তির প্রতিনিয়ত এইরূপ অনুলোম-প্রতিলোম ক্রিয়া চলিতেছে। তিনি সৃষ্টির দিকে নিজে নামিয়া আসিতেছেন, আর আমরা তাঁহার দিকে দৃষ্টি করিয়া বীজের দিকে চলিয়াছি। বস্তুতঃ ভগবৎ-তত্ত্বের নিত্য সম্পর্কের উপলব্ধির পথেই আমাদের মনোধর্ম্মের সর্ব্বাঙ্গীণ বিকাশ বা ক্রমোন্নতির অবকাশ রহিয়াছে এবং এই ভাবে আমাদের ইন্দ্রিয়-বৃত্তি সমূহ সব বাহ্যস্পর্শে মননের মূলে গিয়া নিত্য সত্যের রসটুকু আস্বাদ করিতেছে—আমাদের জীবনকে পলে পলে বিচিত্রভাবে প্রাণরসে সঞ্জীবিত করিয়া তুলিতেছে।

সত্যের জন্য এই যে আমাদের সাধনা, নিত্যের জন্য আমাদের এই যে বেদনা, আমরা কিছুতেই ইহাকে বঞ্চনা করিতে পারি না। সুতরাং যিনি এই বিশ্ব গড়িয়াছেন, তাঁহার অন্তরের ধর্ম্ম, আমাদের মর্ম্মে রহিয়াছে এবং এই বিশ্বে তাঁহারই নর্ম্ম-লীলার বিস্তার হইতেছে। বস্তুতঃ বাহির হইতে তিনি কোন উপাদান সংগ্রহ করিয়া সৃষ্টি করেন নাই; আর বাহির পাইবেনই বা কোথায়? সৃষ্টি কি কৌশলে হয়, এ সম্বন্ধে যাঁহাদের অভিজ্ঞতা কিছু আছে, তাঁহারা সকলেই জানেন, সার্থক যত সৃষ্টি সবই নিবৃত্তি-ধর্ম্মী অর্থাৎ অন্তর-রসে নিজকে ডুবাইয়া তবে তেমন সৃষ্টি করা সম্ভব হয়। নিজবীজের ঘনিষ্ঠতর সম্পর্কের উপলব্ধি সূত্রেই নিজকে সৃষ্টিতে উৎসৃষ্ট করা প্রয়োজন হইয়া পড়ে এবং আত্ম-ভাবনার বেদনাকে আশ্রয় করিয়াই আমাদের অন্তরে প্রকৃত সৃষ্টির চেতনা জাগিয়া থাকে। ঐ সময় স্রষ্টার অন্তরে অব্যবহিত একাত্মতার রস-সঞ্চারী এক অপূর্ব্ব আলোক-স্পর্শ আসিয়া পড়ে এবং নিভৃত পুলকে সেক্ষেত্রে নিজের সৃষ্টির প্রতি স্রষ্টার দৃষ্টি পলকবিহীন হইয়া যায়, তবেই অন্তরের রস অখণ্ড উৎস-মুখ হইতে ছড়াইয়া বাহিরে গড়া জিনিষে দাঁড়ায়। বিশ্ব যিনি গড়িয়াছেন, তিনিও

এইভাবে নিজের মাধুর্য্যকেই সৃষ্টির ভিতর দিয়া পরম ঔদার্য্যে আস্বাদন করিতেছেন। প্রকৃত প্রস্তাবে তিনি তাঁহার সৃষ্টি হইতে দূরে নহেন। পরন্তু অন্তর-ধর্ম্মে সৃষ্টির মর্ম্মে মর্ম্মে তিনি একান্তভাবে অনুপ্রবিষ্ট রহিয়াছেন। ফলতঃ শুধু মানুষই বিশ্বপিতা হইতে উদ্ভবের গৌরবের অধিকারী নয়। কীট-পতঙ্গ, গাছ, লতা, পাতা, এমন কি ধূলা-বালু পর্য্যন্ত সেই পরমদেবতার অন্তরের আলোকে এক পুলকময় লোকে নিত্যলীলায় উদ্দীপ্ত রহিয়াছে। সকলেই সেখানে পূর্ণভাবে পূর্ণকে আস্বাদন করিতেছে। যিনি বিশ্বপিতা, তাঁহার সত্তায় ইঁহাদের সকলেরই আনন্দরূপ আছে। তাঁহার দানের মহোচ্চ মহিমায় ইঁহারা সেখানে সকলেই চিন্ময়, প্রাণময় এবং ছন্দোময়। কেহই মরা নহে, সকলেই নড়াচড়া, বাঁচা এবং সাচ্চা।

তথাপি বিরাট, বিপুল এই বিশ্বসৃষ্টিতে মানুষের বিশেষত্ব নিশ্চয়ই আছে। সে বিশেষত্ব এই যে, মানুষ বিশ্ব-ব্যাপারে বিশ্ব-বিধাতার দিব্য রূপ অন্তরে উপলব্ধি করিতে পারে। সে তাঁহার সকল মজানো, সকল জড়ানো, সর্ব্বচিত্ত-আকর্ষণকারী চাতুরীকে ব্যতিরেকের বিভ্রম অতিক্রম করিয়া অন্বয়ের পথে উপলব্ধি করিতে সমর্থ হয়। দেহ দিয়া সেই নিত্যস্বরূপের সেবায় সে অধিকারী। বাস্তবিকপক্ষে মানুষের ধর্ম্ম বলিতে সেই সাধনাকেই বুঝায়। প্রকৃত প্রস্তাবে যিনি এই বিশ্ব গড়িয়াছেন, বিশ্বভাবন যিনি, তিনি যে সৃষ্টি করিবার পরই আমাদের সঙ্গে তাঁহার সব সম্পর্ক চুকাইয়া দিয়াছেন এবং কাকের বাসায় কোকিলের শাবকের মত আমাদিগকে নেহাৎ পরের রাজ্যে ফেলিয়া স্বর্গ-সুখের জন্য অন্যত্র পাড়ি জমাইয়াছেন এবং সাধারণ জীবেরও সৃষ্ট পদার্থের প্রতি যেটুকু মায়া আছে, উদাসীনবৎ আসীন বলিয়া ভগবানের তাহাও নাই, অধিকন্তু তেমন নির্ম্মম হওয়াতেই যত তাঁহার মাহাত্ম্য, এমন ধারণা অপরিণত মস্তিষ্ক হইতেই উদ্ভূত হইতে পারে।

সুতরাং আছেন, তিনি আছেন। আমি যখন আছি, তখন তিনিও আছেন এবং তৎস্বরূপে এইজ্ঞানের ভিত্তি যদি না আমার থাকিত তবে আমার অস্তিত্ববোধ বা সংজ্ঞানও থাকিত না। বস্তুতঃ আমার অস্তিত্বকে বলিষ্ঠভাবে উপলব্ধি করিতে হইলে তৎজ্ঞানকেও সুবিষ্ট করিয়া তুলিতে হয়। সে অবস্থায় ভগবানের সর্ব্বতোময় প্রভাবকে নিজভাবে উপলব্ধি করা প্রয়োজন হইয়া পড়ে। অন্য কথায় আমি তাঁহার, ভগবানকে এমন ভাবে জানিতে হয়, বুঝিতে

হয়।……ইউরোপের ঝাঁকুনিতে আমাদের অধিকাংশ লোকেব মন ঘুলিয়ে গেছে। সেই মনকে স্বচ্ছ করতে না পারলে তাতে কিছু প্রতিবিম্বিত হবে না।" ….(ইউরোপের শিক্ষার দোষ দেখিয়ে বলছেন) বর্তমান ইউরোপও অতীত ভারতবর্ষের এ উভয়েব দোটানায পড়ে বাংলা প্রায ভুলে গেছি……ইংবাজী শিক্ষার বীজ অতীত ভারতের ক্ষেত্রে প্রথমে বপন করলেও তার চারা তুলে বাংলায় মাটিতে বসাতে হবে। নইলে স্বদেশী সাহিত্যের ফুল ফুটবে না। পশ্চিমের প্রাণবায়ু যে ভাবের বীজ বহন করে আনছে তা দেশের মাটিতে শিকড় গাড়তে পারছে না বলে মনে হয় শুকিয়ে যাচ্ছে, পরগাছা হচ্ছে।… ..আমাদের 'বাংলা ঘরের' খিড়কি দরজার ভিতর প্রাচীন ভারতবর্ষের হাতী গলাবার চেষ্টা করতে হবে। আমাদের গৌড় ভাষার মৃৎকুণ্ডের মধ্যে সাতসমুদ্রকে পাত্রস্থ করতে হবে। এ সাধনা অবশ্য কঠিন, কিন্তু স্বজাতির মুক্তির জন্য অপর কোন সহজ সাধনপদ্ধতি আমাদের জানা নেই।"

বাংলা দেশে স্বদেশী যুগের পর (১৯০৫ সালের পর) আবার যখন জড়তা দেখে গেছে—প্রথম যুদ্ধের গোড়ার দিকে যখন জাতীয় আন্দোলনে ভাঁটা চলেছে তখন সাহিত্য মন ভেজায়, নিদ্রায় অধিকার হরণ করে, গতানুগতিকতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে, জাতিকে আত্মহত্যার থেকে রক্ষা করে প্রভৃতি বলে সাহিত্যের যে ভূমিকা প্রথমবাবু নির্দেশ করেছেন—তার সামান্য আভাসই নরেশবাবুর লেখায় মেলে। ইউরোপের ধাক্কা ও ইউরোপ থেকে জ্ঞান লাভ করার সম্পর্কে প্রথমবাবু যখন বলছেন যে ভাবের বীজ্ যে দেশ থেকে আনা হোক না কেন এদেশের মাটিতে তার চাষ করতে হবে……নইলে স্বদেশী সাহিত্যের ফুল ফুটবে না—তখন তার জাতীয় কর্তব্যবোধ কত সুস্থ এবং বিজ্ঞানসম্মতভাবে প্রকাশ পেয়েছে। সাহিত্যে সৌখিনতা ও হাম-বড়া ভাবকে বিদ্রূপ করে তিনি সুস্থ, স্বচ্ছন্দ, মননশীল, স্বচ্ছ ও যত্নবান হতে যে উপদেশ দিয়েছেন তা দীর্ঘকাল ধরে নবীন সাহিত্যিকদের পক্ষে অবধারিত নির্দেশ হয়ে থাকবে। মানুষের দৈনন্দিন জীবন সম্পর্কে তাঁর যে সংক্ষিপ্ত মন্তব্য তা' ১৯১৪-১৫ সালে তাঁদের মত বুর্জোয়া গণতান্ত্রিকদের পক্ষে প্রায় অনিবার্য ত্রুটি। তখনো এদেশের রাজনৈতিক আন্দোলনেও এই ধরনের দাবী কদাচিৎ শোনা গেছে।

অপরপক্ষে এর ২৩ বছর পর যখন ভারতে শ্রমিক আন্দোলন প্রবল হয়েছে, জাতীয় কংগ্রেস শ্রমিক এবং কৃষকদের দাবী স্বীকার করছে, যুক্তফ্রন্ট গঠন করছে, তখন সংস্কৃতি ক্ষেত্রে যুক্তফ্রন্ট গঠনকারী মার্কসবাদী সম্পাদকদ্বয় লিখছেন

সাহিত্যিককে সমাজ সমস্যা সম্পর্কে নির্বিকার না হলেই এবং সামাজিক চৈতন্য সাহিত্যসৃষ্টির পরিপন্থী নয়—এই মানলেই চলবে। আর সেই যুক্তফ্রণ্টের উদারনৈতিক ও গণতান্ত্রিক সভাপতি শ্রীযুক্ত সেনগুপ্ত সাহিত্য বিচারের অতি পুরাতন সূত্র "বাক্যং রসাত্মকং কাব্যম্" ধরে বলেছেন: "প্রগতি সাহিত্য প্রধানত রস সাহিত্য; নূতন রসে সাহিত্য সার্থক ও প্রগতিশীল হয়। রসের নূতনত্বের বিচারে সাহিত্যের স্থায়ীমূল্য নির্ধারিত হয়। যুগে যুগে মানুষের জীবনে যে পরিবর্তন হচ্ছে—সাহিত্য সেই রূপান্তরিত জীবনের রসমূর্তি প্রকাশ করে সার্থক হচ্ছে। কাজেই সাহিত্য মাত্রই প্রগতিশীল; প্রগতি ও সাহিত্যের সম্বন্ধ নিত্য।"

এর পরও যদি ঐক্য না হয় তো ঐক্য আর কিসে হবে। স্বভাবতই নরেশবাবু এই প্রবন্ধে সাহিত্যের ব্যাপারে সাহিত্যিককে দর্শক বা বড জোর ঘটনা লিপিবদ্ধকারী করেছেন এবং সাহিত্যকে রূপসর্বস্বতাব (formalism) ভিত্তিতে দাঁড করিয়েছেন। কারণ রসের হিসাবে সাহিত্য বিচারের একমাত্র মানদণ্ড স্থির করার অর্থ হল—সামাজিক বাস্তবতার মানদণ্ড পরিত্যাগ করা। প্রমথবাবুর থেকে এটা পশ্চাদ্‌গতি। নরেশবাবুর অগ্রগতি হল পূর্ণাঙ্গ স্বাধীনতার দাবী এবং ধনতন্ত্রবাদ এবং হিংস্র শক্তির বিরুদ্ধে আন্দোলনের দাবীর মধ্যে। নূতন সমাজ গডার যে লক্ষ্যের কথা তিনি বলেছেন—তাও এত অস্পষ্ট যে তার থেকে সাধারণভাবে কিছু বোঝা যায় না। নরেশবাবুর লেখা থেকে প্রশ্ন করা যায়—প্রগতির শত্রু কারা? উত্তরঃ—'অতীতের সংস্কার, অসামাজিকের বিদ্রোহ, ধনিকের অর্থ লিপ্সা, দোর্দণ্ড প্রতাপ হিংস্র শক্তি ইত্যাদি। হীরেনবাবুদের মুখবন্ধের পর নরেশবাবুর প্রবন্ধ পডলে মনে হবে অতীতের সংস্কার, ধনতন্ত্র ও ফ্যাসিজম হল প্রগতি সাহিত্যের বিরুদ্ধপক্ষ। অবশ্য নরেশবাবু প্রকাশ্যভাবে কোথাও ফ্যাসিজম্ কথাটা উল্লেখ করেননি তাঁর প্রবন্ধের মধ্যে। কাজে কাজেই দোর্দণ্ড প্রতাপ হিংস্র শক্তি, কথাটা সাম্রাজ্যবাদ বা ফ্যাসিবাদ সব কিছুকেই বোঝাতে পারে। মোটের ওপর ভারতে বা বাংলাদেশে নানা ধরনের সাহিত্যগোষ্ঠীর মধ্যে এই নূতন গোষ্ঠীর জন্ম বা বিভিন্ন গোষ্ঠীকে সমসূত্রে গ্রথিত করার জন্য এই যে ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টা তার আদর্শগত বনিয়াদের, (রাজনৈতিক বা সাহিত্যগত) তত্ত্বের ও পথের কোন হদিস এই প্রবন্ধ থেকে পরিষ্কার পাওয়া যায় না। এই সাহিত্য সংগঠন কি কেবল যুদ্ধ ও ফ্যাসিজমের বিরুদ্ধে বিশ্বফ্রণ্টের একাংশ? না—সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্ততন্ত্রের

বিরুদ্ধে জাতীয় যুক্তফ্রন্টের সাংস্কৃতিক বিভাগ? হয়তো দুটোই; অন্ততঃ হীরেনবাবুদের যতখানি জানি—তার থেকে এবং তখনকার রাজনৈতিক সংগঠনের কথা থেকে এই সিদ্ধান্তে আসা যুক্তিযুক্ত। তবু একথা মানতেই হবে যে 'প্রগতি' সংকলনের মার্কসবাদী সম্পাদকদ্বয় এবং সংঘের সভাপতির বক্তব্যের স্বর প্রধানত ভারতের অবস্থার সঙ্গে না মিলিয়ে যান্ত্রিকভাবে ফ্যাসিজম-বিরোধিতার স্বর। দ্বিতীয়তঃ সংগঠনগত প্রশ্নে এমন একটা গতানুগতিক ধারার পক্ষে মত দেওয়া আছে—যাতে করে সমালোচনা বা আত্মসমালোচনার সুস্থ পরিবেশ প্রগতি লেখক সংঘে সৃষ্টি করার কোন চেষ্টা দেখা যায় নি।

দল বেঁধে সাহিত্য রচনা হয় না—কথাটি প্রমথ চৌধুরী, শরৎচন্দ্র বলেছেন, নরেশবাবুও বলেছেন এবং ১৯৩৮ সালে কলিকাতায় প্রগতি সাহিত্য সম্মেলন প্রসঙ্গে সজনীকান্ত দাসও বলেছেন। কিন্তু লক্ষ্ণৌ কংগ্রেসের সময় শরৎচন্দ্রকে যখন বলা হল যে দল বেঁধে সাহিত্য রচনা না করা গেলেও লেখক ও পাঠক রচনা নিয়ে আলাপ করলে সাহিত্যের উন্নতি হয়, তখন শরৎচন্দ্র তা মেনে নিয়েছিলেন। ১৯৪৫ সালে কংগ্রেসসাহিত্যসংঘ গঠন করার সময় সজনীবাবুও দলাদলির আগ্রহে বোধ করি নিজের উক্তি ভুলেই গিয়েছিলেন।

কিন্তু আসল সমস্যা প্রগতি সাহিত্য সংঘের কাছে কি ছিল? ১৩৫৮ জ্যৈষ্ঠ মাসের 'অগ্রণী'তে নরেন্দ্র দেব লিখেছেন: 'বিভিন্ন মতবাদের দলাদলিতে বিভক্ত পৃথক পৃথক রাজনৈতিক শিবিরের মত সাহিত্যক্ষেত্রেও একাধিক পৃথক পৃথক দল আছে লজ্জার সঙ্গে একথা স্বীকার করি। এক একখানি সাময়িক পত্র বা পত্রিকা কেন্দ্র করেই বিশেষভাবে এক একটি সাহিত্যিক দল বা গোষ্ঠী গড়ে উঠেছে। তাঁরা সামনে বেশ হেসে কথা বলেন কিন্তু আড়ালে পরস্পরকে নিন্দা করেন। একে অন্যের যশ-খ্যাতির ঈর্ষা করেন। পরস্পরের গায়ে কাদা ছোড়েন ও পরস্পরকে দারুন অবজ্ঞা করেন। অথচ, একে অন্যের সংবর্ধনা উপলক্ষে প্রশস্তিপত্রও রচনা করেন।'

নরেন্দ্রবাবুর এই কথা কেবল আজকালের জন্য নয় বাংলাদেশের সাহিত্য জগতের অনেকদিনকার ইতিহাস। কাজেই এই পরিস্থিতিতে মার্কসবাদীরা নেতৃত্বের অংশে রয়েছেন এমন ধরনের সংগঠনে একদিকে যেমন যুক্তফ্রন্টের মূলনীতিগুলি পরিষ্কার বলা দরকার ছিল তেমনি প্রয়োজন ছিল সমালোচনা ও আত্মসমালোচনার ভিত্তিতে সেই ফ্রন্টের বাস্তব বনিয়াদ গড়ার দিকে লক্ষ্য রাখা। তাহলে বাংলা সাহিত্যে ব্যক্তির নৈসর্গিক প্রতিভার ভিত্তিতে

সাহিত্যগোষ্ঠী তৈরীর পরিবর্তে সাহিত্য হিসাবে ভারতের জনসাধারণের সেবায় আদর্শের ভিত্তি বড হয়ে উঠতো—এবং বন্ধুবাৎসল্য, সৌখিনতা ও পরস্পরের পিছনে কাদা ছোড়ার বদলে সমালোচনা ও আত্মসমালোচনার গণতান্ত্রিক পদ্ধতি প্রাধান্য লাভ করত। কিন্তু তার বদলে যা করা হল—তাকে সাহিত্য-ক্ষেত্রে মেনশেভিকবাদ ও আত্মঅবলোপবাদ বলা যায়। ফলে ১৯৩৯-৪২ সালের সংকটময় দিনে যুদ্ধ ও সাম্রাজ্যবাদের নতুন আক্রমণের যুগে যখন 'প্রগতি' নামধারী বিভিন্ন বামপন্থী দল জাতীয় সংস্কারবাদী নেতাদের সংগ্রাম-বিরোধিতাব সুরে সুব মিলিয়ে জাতীয় কর্তব্য থেকে সরে পডছে তখন প্রগতি লেখক সংঘের অস্তিত্বও প্রায় লোপ পেয়েছিল। কিন্তু সে কথা পরে হবে।

'প্রগতি' সংকলনের অন্য প্রবন্ধগুলিতে কিন্তু তার অভিনবত্ব সুনিশ্চিতভাবে প্রকাশ করেছে। সাহিত্যে প্রগতি কাকে বলে সে-সম্পর্কে যে একটি নূতন সামাজিক দৃষ্টিকোণ আছে এবং রস ছাডাও অন্যকিছু যে সাহিত্যবিচাবের মাপকাঠি হতে পারে—সে-বিষয়ে কয়েকটি প্রবন্ধ নিশ্চিতভাবে নির্দেশ দিয়েছে। এই প্রবন্ধগুলির সামান্য আলোচনা আমি করতে চাই। কারণ সেই সময়ে যারা আমাদের দেশে সাহিত্য ক্ষেত্রে নূতন ধরনের চিন্তা করতে সুরু করছিলেন তাদের মনে ও যে কি ধরনের আত্মবিরোধ, যান্ত্রিকভাবে তত্ত্বপ্রয়োগ করার চেষ্টা এবং অনেক ক্ষেত্রে ভারতের সামাজিক বিকাশ সম্পর্কে আবছা ধারণা প্রচলিত ছিল—তার কিছু নমুনা এই প্রবন্ধের উদ্ধৃতি থেকে দেখিয়ে দেবার চেষ্টা করব। এই চেষ্টাব মধ্যে আমার উদ্দেশ্য হচ্ছে উক্ত প্রবন্ধগুলির খ্যাতনামা লেখকদের অকারণে সমালোচনা করা নয়—আজ আমরা সেই প্রাথমিক যুগের স্বাভাবিক দুর্বলতা কাটিয়ে উঠতে পেরেছি কিনা বা এখনো অনেকাংশে সেই অবস্থায় পড়ে আছি, কিংবা তার থেকেও কোন কোন ক্ষেত্রে নেমে গেছি কিনা—সেইটেই হৃদয়ঙ্গম করা।

প্রথম প্রবন্ধ লিখেছেন অধ্যাপক ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। প্রগতি কাকে বলে এই সম্পর্কে তিনি বলেছেন: 'প্রগতির অর্থ পরিবর্তন এবং যে ব্যক্তি প্রগতি কথা ব্যবহার করছেন তাঁর মতানুযায়ী দিক পরিবর্তন।' এ উক্তি নিশ্চয় বিজ্ঞানসম্মত নয়। কিন্তু সে-কথা স্বীকার না করেও তিনি যখন সাহিত্য, সমাজ ও ব্যক্তির সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করছেন—তখন কিন্তু বাস্তববাদীর মত কথা বলেছেন। যেমন বলেছেন: "পূর্বে খাওয়া-পরার সংস্থান, পরে ভাব-সম্পদ। অতএব পূর্বে সেই সংস্থান সৃষ্টির পরিবর্তন ও তার ফলে ভাবসম্পদ

সৃষ্টির পরিবর্তন।' তথ্য, ঘটনা ও মূল্য প্রগতির তিনটি স্তর—এই বিভাগ দেখিয়ে তিনি তথ্য সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক, ঘটনার সম্পর্কে organismic এবং মূল্যের বেলায় দার্শনিক মনোভাব নিতে বলেছেন। এরপর তিনি বৈজ্ঞানিক মনোভাবের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন: 'যতদূর যান্ত্রিক ব্যাখ্যা চলে ততদূর গ্রহণ করা এবং তারপর যেখানে চলছে না সেখানে সে ব্যাখ্যা খাটাবার চেষ্টা করাই প্রগতিশীল লেখকদের তথ্য সম্বন্ধে কর্তব্য। যদি নেহাত অসম্ভব হয় তবে চুপ করে যাওয়াই ভাল, অন্তত এমার্জেণ্ট-এভোলিউশনের ব্যাখ্যা গ্রহণ করার চেয়ে—কারণ শেষোক্ত ব্যাখ্যায় অজ্ঞানতাকে গালভরা ব্যাখ্যা দিয়ে পদ্ধতিতে পরিণত করবার চেষ্টা অনেকস্থলে লক্ষ্য করেছি।' ধূর্জটিবাবু এই প্রবন্ধে কোথাও মার্কসবাদ বা ডায়েলেকটিক্যাল মেটিরিয়ালিজমের উল্লেখ করেন নি। কিন্তু তিনি যে ইতিহাস, সমাজ ও সাহিত্যের বস্তুতান্ত্রিক ব্যাখ্যা দিতে চেষ্টা করেছেন—তার অনেক দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়। আমি কেবল এই কথাই পূর্বোক্ত উদ্ধৃতি থেকে বোঝাতে চাই যে, তাঁর দার্শনিক মতামত তখনো বিভ্রান্তির স্তর অতিক্রম করেনি। বর্তমান লেখক কিছুদিন আগে ধূর্জটিবাবুকে এই প্রবন্ধ দেখাতে তিনি বলেন যে, এতে অনেক ত্রুটিপূর্ণ উক্তি আছে। ধূর্জটিবাবু অবশ্য পুরোপুরি মার্কসবাদ মানেন না। তবু তাঁর এই কথাগুলি মূল্যবান: "প্রগতিশীল লেখকদের তথ্য সংগ্রহ সম্পর্কে মনোভাব বর্তমান ও আগামীকালের বৈজ্ঞানিকের মনোভাবই হওয়া চাই। বলা বাহুল্য শ্রদ্ধা সহকারে তথ্যকে বোঝাটাই প্রথম কথা।" তারপর ঘটনা সম্পর্কে প্রগতি সাহিত্যিকের কি বিবেচনা হবে—সেই প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন: "তথ্যের পর ঘটনা। পুরাতন সাহিত্যের পরিণতি ছিল একটিমাত্র সংকটময় মুহূর্তে।……এরই নাম গল্প বলার টেকনিক ইত্যাদি। এখন সময় সম্বন্ধে ধারণা বদলেছে, অতএব সংকট ও কালান্তর এখন শেষে অবস্থান করে না। তারা গল্পের মধ্যে কবিতার মধ্যেও অধিষ্ঠিত হয়েছে। প্রগতিশীল সাহিত্যে ঘটনার স্থান নির্দিষ্ট নেই, কারণ কাল সম্বন্ধে পূর্বেকার ধারণা পরিত্যক্ত হয়েছে।" ইতিহাস কেবল পুনরাবৃত্তি করে এই ধারণাকে আক্রমণ করে তিনি লিখেছেন: "সমগ্র জীবনটাকে ঐ ভাবে দেখলে সাহিত্য হয় বিফলতার বিবরণ, ব্যর্থতার কাহিনী, অর্থাৎ মূল্যহীন।……প্রগতিশীল সাহিত্যে ঘটনার প্রত্যাশা করি, যাব বেগভার থাকবে, নতুন ঘটনা সৃষ্টি করার ক্ষমতা থাকবে। পারম্পর্য প্রগতির মূল কথা নয়। বেগভার প্রকাশ পাওয়ার ঠিক পূর্বেকার অবস্থা পর্যন্ত সমাবেশের প্রকৃতি বাঁধা ছাঁদা জৈব দেহের মতন,

অর্থাৎ তার ছক আছে। একটা ক্রাইসিস থেকে অন্য ক্রাইসিসে যাবার মধ্যে এই নক্সারই ছবি প্রগতিশীল সাহিত্যিককে আঁকতে হবে।' (ধূর্জটিবাবু আবার কি রকম যান্ত্রিক হয়ে উঠছেন এ তার নমুনা। শুধু তাই নয়—তাঁর স্ববিরোধিতা, খানিকদূর অগ্রসর হয়ে থেমে যাওয়ার আরো উদাহরণ দিচ্ছি।) বর্তমান জগতে যে প্রকার জীবন সম্ভব তাতে নক্সাগুলি অত্যন্ত একঘেয়ে (ইন ডিফেন্স অব ডেকাডেন্সের পক্ষে কি এই যুক্তি বলশালী হয় না?—) "এই সমাজে ব্যক্তিগত জীবনে ঘটনা ঘটতে পারে না, যা পারে তার নাম তথ্যের পুনরাবৃত্তি ও বিচ্ছিন্নতা।* সেইজন্য যন্ত্রকে দায়ী করা রোমান্টিকের সাজে। যুক্তিতে বলে, যন্ত্রের সঙ্গে গতানুগতিকতার সম্বন্ধ থাকলেও তার নিকটতম আত্মীয় হল যন্ত্রের উপর অধিকার বিভাগ এক কথায় সমাজে অধিকার বৈষম্যের জন্যই জনসাধারণের জীবন অত একঘেয়ে।

প্রগতিশীল লেখকদের এই সামাজিক তত্ত্বটুকু ধরতে হবে" ....মূল্যজ্ঞান সনাতন নয়—এই যুক্তি প্রতিষ্ঠা করে তিনি বলছেন—"পাছে বিপ্লব বাধে এই ভয়ে কর্তৃপক্ষ বল্লেন যে, মূল্যজ্ঞানটাই সনাতন, এবং বাকিটা মায়া। কোন মূল্যজ্ঞানকে শাশ্বতে পরিণত করার মধ্যে শ্রেণীস্বার্থ আছে। সাহিত্যে সনাতন তত্ত্বের ঐতিহ্যের নজীর দেখানোর মধ্যে একটি শ্রেণীর স্বার্থ বজায় রাখায়, কোন মুমূর্ষু মূল্যকে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টাই প্রতিফলিত হয়। শবের দৌরাত্ম প্রগতিশীল লেখক মানতে পারেন না। অস্বীকার করাটা মস্ত কাজ, কিন্তু নতুন সৃষ্টি করাটাই উদ্দেশ্য। প্রথমটা না হলে দ্বিতীয়টি অসম্ভব।

এর পরে ধূর্জটিবাবু তখনকার বাংলা সাহিত্য সম্পর্কে যে কথা বলেছেন তা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি লিখেছেন প্রবন্ধের শেষ প্যারায়ঃ "শুনেছি বাংলা সাহিত্যে প্রগতিশীল লেখক আছেন। তাঁরা কেউ কেউ আঙ্গিকের উন্নতি করেছেন। ভাবের দিকে বিশেষ কোন নতুনত্ব পাইনি। সকলে এখনো ব্যক্তিবাদী। রবীন্দ্রনাথ, প্রমথবাবু ও শরৎচন্দ্রের যুগে হিন্দু সমাজের বিপক্ষে লড়াই করার প্রয়োজন, তাই ব্যক্তিবাদ তখন ছিল প্রগতিশীলতার মূলমন্ত্র। এখন সমাজ বদলেছে। (??সু.প্র) নতুন সাহিত্যিকের লেখার পরিবর্তন

* বার্ট্রাণ্ড রাসেলের সহকর্মী দার্শনিক হোয়াইটহেডের "অ্যাডভেঞ্চার অব আইডিয়াস" বই-এর প্রভাব ধূর্জটিবাবুর উপর যে তখন ছিল—তা তিনি এই প্রবন্ধে লেখককে বলেছেন।

সম্বন্ধে সন্দেহের সাক্ষাত পাই, কিন্তু কেন হল কিভাবে হল এই জ্ঞানের কোন পরিচয় পাই না। ভদ্রলোকের ছেলে, লেখাপড়া শিখে খেতে পাচ্ছে না, তাই কষ্ট পাচ্ছে, কষ্টের কারণ সে নিজে বুঝতে পারছে না—মাত্র এইটুকুই কথা সাহিত্যে ফুটেছে। (যদি তাই হয় তো তাকে প্রগতি বলতে ধূর্জটিবাবুর আপত্তি কেন?) কবিতায় বিষাদের ছায়া দেখছি কিন্তু কিসের বিষাদ? সেই একই কারণে অর্থাৎ কবি নিজে ভালভাবে থাকতে পারছেন না। এঁরা যেন সকলে ভাল চাকরী খুঁজছেন। বাংলা কবিতা ও কথাসাহিত্য বড় চাকরীর দরখাস্ত লেখার সামিল হয়েছে। যাঁরা গরীব গৃহস্থের দুঃখে হা-হুতাশ করেন তাঁরা লোক ভাল, কিন্তু রোমান্টিক। আমাদের সাহিত্য-সৃষ্টির পেছনে তথ্য, ঘটনা ও মূল্য-জ্ঞানের কোন তাগিদ নেই। যখন তা নেই তখন আঙ্গিকের কেরামতি ঝুটা মনে হয়। আগে জীবন সম্বন্ধে জ্ঞান আসুক, তার উপর রূপ সৃষ্টি হোক্, তবেই প্রগতিশীল সাহিত্য রচনা হবে।……অন্যদেশে তা' সৃষ্টি হচ্ছে জানি এবং সেই সঙ্গে আমাদের দেশে আঙ্গিকের অনুকরণ হচ্ছে। তার বেশী কিছু হচ্ছে না আমার বিশ্বাস—তাই স্বাদেশিকতা জলাঞ্জলি দিয়ে শেষ প্যারাগ্রাফটি লিখলাম। সমাজ জীবনের রূপ-পরিবর্তনের কারণ সম্বন্ধে জ্ঞান না থাকলেও যে নতুনত্ব সাহিত্যে আনা যায় তাকে প্রগতিশীল সাহিত্যের অভিনবত্ব বলে আমি ভুল করতে রাজী নই।"

ধূর্জটিবাবুর এই উক্তির মধ্যে অনেক কিছুই অত্যন্ত মূল্যবান হলেও দৃষ্টিভঙ্গী সম্পূর্ণ সমর্থনযোগ্য নয়। সমাজের রূপ পরিবর্তনের কারণ অর্থাৎ Historical Materialism না জানলে কোন সাহিত্যই প্রগতিশীল হবে না—এমন একটা আভাস ধূর্জটিবাবু দিয়েছেন। এই উক্তিটি ঠিক নয়। Historical Materialism না জেনেও বঙ্কিমচন্দ্র থেকে শরৎচন্দ্র পর্যন্ত যে সাহিত্যে প্রগতি এনেছেন—তা নির্ভেজাল না হলেও তার বিচারের মাপকাঠি কেবল পূর্বোক্ত লেখকদের সমাজ বিজ্ঞানের জ্ঞান থাকা না-থাকার ওপর নির্ভর করছে না—একথা আজ ধূর্জটিবাবু হয়ত স্বীকার করবেন। এ যুগের প্রগতিশীল লেখকদের সমাজ বিজ্ঞান সম্পর্কে যত জ্ঞান থাকা হয়—ততই তাঁদের ও আমাদের পক্ষে মঙ্গল—একথা বলে তিনি ভালই করেছেন। কিন্তু ভারতীয় বাস্তবতায় এই সমাজ জীবনের রূপ পরিবর্তনের রূপরেখা কি হতে পারে অর্থাৎ ভারতের ক্ষেত্রে সমাজ পরিবর্তনের মূল গতি কি তার আভাস যদি তিনি দিতেন—সেই আলোকে প্রমথ চৌধুরী, রবীন্দ্রনাথ এবং শরৎচন্দ্রকে বিচার করে প্রগতি

সাহিত্যের কর্তব্য নির্দেশ করতে পারতেন তা হলে ব্যাপারটি পরিষ্কার হত। রবীন্দ্রনাথ, প্রমথবাবু ও শরৎচন্দ্রের যুগে কেবল ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের স্বপক্ষে হিন্দু সমাজের বিরুদ্ধে লড়াই করার প্রয়োজন ছিল, এভাবে কথাটা পাড়া ধূর্জটিবাবুর মত সমাজবিজ্ঞানবিদ (এবং অনেকখানি পরিমাণে মার্ক্সবাদী) লেখকের মানসিক বিভ্রান্তিরই পরিচায়ক। কারণ রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র বা প্রমথ চৌধুরীর সম্পর্কে উক্ত ধরনের বক্তব্য তাঁদেরকে প্রায় নস্যাৎ করারই সামিল হয়। তাদের কোন্‌টি গ্রহণযোগ্য বা কোন্‌টি বর্জনীয়, তা প্রকাশ করে না। তবু ধূর্জটিবাবুর প্রবন্ধ প্রগতি লেখক আন্দোলনকে চিন্তাশীল হতে উদ্বুদ্ধ করেছিল এবিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ।

"Bourgeois literary scholars have never really seriously posed the problem of the popular element in literature nor could they do so. Their fundamental error in treating of social and literary problems has always been the assumption that it is individual who plays decisive role in the historical process, in the development of culture and civilisation. It will be remembered that basic tenet of bourgeois humanism has always been the 'sovereign individual standing above the masses."

A Ivashchenko in Soviet Literature No. 10-1951 P.110.

ধূর্জটিবাবুর প্রবন্ধের পর আঁদ্রে জিদের "ব্যষ্টি ও সমষ্টি" প্রবন্ধটি আছে। এই প্রবন্ধটি আন্তর্জাতিক প্রগতি লেখক সঙ্ঘের অধিবেশনে জিদের বক্তৃতা। যারা এই সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন এবং পরে প্রগতি শিবির ছেড়ে চলে গেছেন তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য আঁদ্রে মালরো, অল্‌ডাস হাক্সলে, জন ষ্ট্রেচি এবং জিদ নিজে। অথচ জিদ এই প্রবন্ধে অনেক ভালো কথা বলেছেন। কিন্তু জিদের মধ্যেকার বিরোধও এই প্রবন্ধে আছে। সেই হিসাবে জিদের এই প্রবন্ধ আজ মূল্যবান। জিদ প্রথমে বলছেন যে, তিনি প্রখরভাবে ফরাসী থেকেও আন্তর্জাতিকতাবাদী এবং এইভাবে তিনি একান্ত ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদী হয়েও কমিউনিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত। "প্রকৃতপক্ষে কমিউনিজম আমার ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদের সহায়ক। আমি সব সময় বলেছি যে প্রত্যেক ব্যক্তি তার স্বকীয় বৈশিষ্ট্য বজায় রাখলেই সমষ্টিকে প্রকৃষ্টভাবে সেবা করতে পারে।

এরই সঙ্গে আজ করোলারী হিসাবে জুড়ে দেওয়া যেতে পারে যে, এক কমিউনিষ্ট সমাজেই ব্যক্তি ও তার বৈশিষ্ট্যের সবচেয়ে বেশী বিকাশ হতে পারে।" ব্যক্তির সম্বন্ধে যা সত্য জাতি সম্বন্ধেও তাই—এই কথা বলে তিনি সোভিয়েট রুশিয়াকে প্রশংসা করেছেন এই কারণে যে, সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যকার বিভিন্ন জাতি ও রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্যের প্রতি সোভিয়েট সরকারের শ্রদ্ধার বাস্তব পরিচয় আছে। এর পর ফরাসী ক্লাসিক্যাল সাহিত্যের ত্রুটি দেখাতে গিয়ে তিনি যথার্থই বলেছেন" এ সাহিত্যের গ্রন্থকার, দর্শক বা পাঠক এবং অভিনেতৃবর্গ (উপন্যাস ও নাটকের চরিত্র) সকলেই অভাব থেকে দূরে থাকেন। সাহিত্যিকের কাজ এখানে অর্থবানদের কাহিনী রচনা করা : আর লেখক যদি অভাবগ্রস্ত হন তবে তাঁকে সেকথা চেপে রাখতে হবে।" ফরাসী সাহিত্য জীবনের বাস্তবতা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে কিরূপ কৃত্রিম ও প্রাণহীন হয়ে পড়েছিল—তার বিবরণ দিতে দিতে তিনি বলেন : "ছাঁচ এবং সম্ভবতঃ রূপের প্রতি অত্যধিক প্রীতির জন্যে ফরাসী সাহিত্য অনবরত কৃত্রিমতার রাজ্যে আকৃষ্ট হয়েছে। ক্লাসিক যুগের সাহিত্যের কৃত্রিমতা নষ্ট করার জন্যে রোমান্টিসিষ্ট আন্দোলন যে-চেষ্টা করেছিল তাতে আরো বেশী কৃত্রিম সাহিত্যেরই সৃষ্টি হয়েছিল।"

এই কৃত্রিমতার বিরুদ্ধে লড়াই করতে হবে—একথা বলতে গিয়ে জিদ কি রকম স্ববিরোধী ও অবৈজ্ঞানিক উক্তি করেছেন—তা এখানে দেখতে পাবেন : 'কৃত্রিম আবেষ্টনিতে লালিত সংস্কৃতির দিন চলে গেছে, যদি জাতীয়তাবাদীরা তাকে সমর্থন করেন তবে ভালই ; তাতে আমরা পরিস্কার ভাবে দেখতে পাই এবং বুঝতে পারি যে, সংস্কৃতির প্রকৃত রক্ষকেরা আজ তাঁদের দিকে নেই, তারা বিপক্ষ শিবিরে রয়েছে। অবশ্য আমি বলতে চাই যে, এই সংস্কৃতিকে আক্রমণ করতে আমি আদৌ ইচ্ছুক নই—তার দানের আমি প্রশংসা করি। অতীতকে অস্বীকার করা নিষ্ফল ও হাস্যকর। এমন কি একথাও আমি স্বীকার করব যে, সে সংস্কৃতির উপক্রমনিকারূপে একটা মিথ্যাচারী সংস্কৃতি প্রথমে নিশ্চয়ই আসবে (??সুপ্র) তাছাড়া ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা যতই হোক, আমাদের ঈপ্সিত কমিউনিজমে পৌছবার পথে ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা একটা আবশ্যকীয় পর্যায়। কিন্তু আমি জোর গলায় বলছি যে সাহিত্য, সংস্কৃতি, সভ্যতা এই অতীত সংস্কৃতির বিরোধিতা করেই শুধু বিকশিত হতে পারে। এই সংস্কৃতির জের টেনে আর সে বাড়তে পারে না।...আমার বিরোধিতা আমাদের বর্তমান সংস্কৃতির বিরুদ্ধে নয়—তার ঝুটা রীতিনীতির বিরুদ্ধে।'

এরপর তিনি দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করেছেন যে সংস্কৃতির শত্রু আজ ফাশিস্তরা, নাৎসীরা, তাঁদের দেশের জাতীয়তাবাদীরা।

"যে সাহিত্যের পাঁচ-সাতজন মাত্র অধিকারী, সে সাহিত্যের জগতে কোন প্রয়োজন নাই।"—বঙ্কিমচন্দ্র।

"If I, a writer, an artist, a critic or a party worker do not count on being understood by my contemporaries for whom then do I live and work ?"—A. Zhdanov.

প্রতিভাশালী সাহিত্যিকরা জীবিতকালে বেশী পাঠক পান না—এর কারণ দেখাতে গিয়ে তিনি বলেছেন যে কপট সমাজ জনসাধারণকে এমনভাবে দাসত্ব শৃঙ্খলিত, এমন পশুবৎ ও অজ্ঞ করে রেখেছে যে জনগণ নিজেরাই জানে না, তারা আমাদের কাছে কি বলতে চায়, যদিও জনসাধারণের ইচ্ছার সঙ্গে পরিচয় হলে যে কোন উৎকৃষ্ট সংস্কৃতিই লাভবান হতে পারে। সুতরাং জিদের মতে তাঁর মত যারা বুর্জোয়া সমাজ থেকে প্রগতিশীল লেখক হয়েছেন তাঁদেব পক্ষে নিজের শ্রেণীর কাছে কথা বলা অসম্ভব—কারণ তাঁদের ধনতান্ত্রিক সমাজেব বিরোধিতা করতে হবে। আর জনগণের কাছেও কথা বলা অসম্ভব। "যতদিন জনগণ আজকের মত অবস্থায় থাকবে, তারা যা হতে পারে, তাদেব যা হওয়া উচিত এবং আমরা সাহায্য কবলে তারা যা হবে তা যতদিন তারা না হয, ততদিন তাদেব কাছে কথা বলা অসম্ভব। এক্ষেত্রে একমাত্র উপায় হচ্ছে ভবিষ্যতেব অজ্ঞাত পাঠকের জন্য লেখা।"

"এই দৃঢ় বিশ্বাস নিয়ে লেখা যে, আমাদের নিজেদের মধ্যে একবার যদি আমবা মানব সত্তাকে গভীরভাবে উপলব্ধি করতে পারি তবে আমাদেব কথা তার কাছে পৌঁছবেই।' (আমাদের দেশে একদল মার্কসবাদী লেখক ও সম্পাদক—অনেকেই এখনো জিদের স্বপক্ষে যুক্তি দেন—তাঁদের লেখার অবোধ্যতা সম্পর্কে পাঠকদের অভিযোগের উত্তরে সবিনয়ে পাঠকদের আরো লেখাপড়া শিখতে অনুরোধ করেছেন—সু.প্র)। মস্কোর লেখক সম্মেলনে শ্রমিকরা লেখকদের কাছে তাদের জীবনের কথা লিখতে অনুরোধ করায় পীড়া বোধ করে জিদ বলেছেন, দর্পণ হওয়া সাহিত্যের উদ্দেশ্য নয়—অন্তত সমগ্র উদ্দেশ্য নয়। অবশ্য তিনি শুনে খুশী হয়েছেন যে বুখারিন বা গোর্কী ভিন্ন ধারণা পোষণ করেন। সোভিয়েটে পুশকিনের বই পুনর্মুদ্রণ ও শেক্সপীয়রের নাটক অভিনয় করার জন্য তিনি তাদের সংস্কৃতির প্রতি আন্তরিকতা দেখে খুশি। কিন্তু ঐ সব

রচনায় কি কি জিনিসের প্রতি মনোযোগ দেওয়া উচিত তার ওপর বেশী জোর দেওয়াতে তাঁব আপত্তি। কারণ "যে কোন রচনা শিক্ষা দেয় সম্পূর্ণ তার সৌন্দর্য্যের দ্বারা।" জনসাধারণকে অজ্ঞ রাখাকে জিদ যেমন আপত্তির কারণ বলে মনে করেন তেমনি তাকে শিক্ষা দেওয়াতে তাঁর আপত্তি। কারণ তিনি যে ভবিষ্যৎ মানুষের জন্য লিখছেন যারা তার সাহিত্যের সৌন্দর্য্যগুলোর মারফতে শিক্ষা পাবে। তা ছাডা সোভিয়েট রাষ্ট্র ভাল হলে কি হবে শেষ পর্যন্ত সে যদি সরকারী শিক্ষার নামে আবাব সংস্কৃতিকে শৃঙ্খলিত করে? কিন্তু জিদ এ পাপ চিন্তাকে মনে স্থান দিতে নারাজ? তাই পরের লাইনেই বলেছেন: "শুধু কমিউনিজমের শত্রুরাই কমিউনিজমের মধ্যেই সকলকে এক ছাঁচে ঢালবার অভিপ্রায় দেখতে পায়। সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রে......প্রত্যেক মানুষ তার পূর্ণ বিকাশের সুযোগ পায়।"

এই প্রবন্ধে জিদ সাহিত্যের সমস্যা থেকেও কমিউনিজমকে বোঝাবার চেষ্ট অনেক বেশী করেছেন। বিশেষ করে বুর্জোয়া ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদী লেখকদের বোঝাবার চেষ্টা করেছেন যে, সাম্যবাদ তাঁদের পক্ষে প্রতিকূল নয়। সর্বহাবা জাতীয়তাবাদ ও আন্তর্জাতিকতার পরিবর্তে কস্মোপলিটানিজম, শ্রেণী সংঘর্ষের পরিবর্তে আবর্তনবাদ (মিথ্যাচারী সমাজের ও ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার আবশ্যকতার পক্ষে যুক্তি) এবং বর্তমানে প্রলেতারিয়েত নেতৃত্বের পরিবর্তে বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবি নেতৃত্বের (সে নেতৃত্ব আবার তাদের জীবিত কালে জনসাধারণেব বোধগম্য হবে না!) সাহায্যে কমিউনিজম বোঝাতে গেলে মে বিড়ম্বনা হয় তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত আজ আঁদ্রে জিদ স্বয়ং। তাঁর মহামূল্য ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য নিয়ে তাঁকে শেষ পর্যন্ত প্রগতি শিবির থেকে সরে পড়তে হয়েছিল।

জিদের বক্তৃতার পর ই. এম. ফর্ষ্টারের বক্তৃতা আছে। ফর্ষ্টারের বক্তৃতার বিষয় ছিল ইংলণ্ডের স্বাধীনতা। ফর্ষ্টার কমিউনিষ্ট মনোভাবাপন্ন না হলেও প্রথমেই এমন একটি কথা বলেছেন—যা এক হিসাবে জিদের তুলনায় প্রগতিশীল। তিনি প্রথমেই বলেছেন ইংলণ্ডের স্বাধীনতা ইংরেজদের জন্য—তার সাম্রাজ্যভুক্ত অশ্বেতাঙ্গদের জন্য নয়। জিদ ফরাসীদেশের সাহিত্যিক এবং সে দেশেরও অনেক সাম্রাজ্য আছে—যার শোষনের ভিত্তিতে ফরাসী দেশের অনেক "সুকুমাব কলার" বিকাশ সম্ভব হয়েছে। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী জিদ একবারও ঐ বক্তৃতায় সে কথায় উল্লেখ করেন নি। ফর্ষ্টার তারপর বলেছেন: ইংলণ্ডে স্বাধীনতা তারাই ভোগ করে যাদের ট্যাকে পয়সা আছে। আমাদের

লেখকদের আত্মপ্রকাশের স্বর্গাধিকার যত অমূল্য হোক, সরকারী মুষ্টিভিক্ষার উপর যার দিন-গুজরান, এসব নিয়ে মাথা ঘামানো তার পোষায় না। এরপর ফর্স্টার অবশ্য নিতান্ত হতাশাব্যঞ্জক উক্তি করেছেন। তিনি বলেছেন: "নিরন্ন ও নিরাশ্রয় যারা তারা স্বাধীনতার জন্য উদ্‌গ্রীব নয়, সংস্কৃতির ঐতিহ্য নিয়েও বিচলিত নয়। একথা স্বীকার করতে না চাওয়া নিছক ভণ্ডামি। (ফর্স্টার যা স্বীকার করতে পারেন নি তা হল নিরন্নরা তাঁদের গিল্টি করা সংস্কৃতি সম্পর্কে তত উৎসাহী নয়)⋯ ⋯"যুদ্ধের সম্ভাবনা বাদ দিলে ফ্যাশিজমকে ভয় করার কারণ তেমন নেই, আর যুদ্ধ একবার বাধলে যে-কোন অঘটন ঘটবে তা যুদ্ধের দেবতাই জানেন। আমদের শত্রুরা আসবে অন্য পথ দিয়ে, শান্তশিষ্ট ভালমানুষটি সেজে, আমি তাদের নাম দিয়েছি ফেবিও ফ্যাসিষ্ট। ফর্স্টার এই প্রসঙ্গে পরোক্ষে লেবার পার্টিকে বেশ এক হাত নিয়েছেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি বলেছেন যে ইংলণ্ডে "লেখকদের সৃজন শক্তি ব্যাহত হচ্ছে যৌন প্রসঙ্গে তাঁরা স্বচ্ছন্দে লিখতে পারছেন না বলে; আমি চাই একথার অকুণ্ঠ স্বীকৃতি যে ঐ প্রসঙ্গটির গভীর বিশ্লেষণ ও লঘু বিবরণ দুইই আবশ্যক।" ফর্স্টারের বক্তৃতার শেষটি বিশেষভাবে করুণ। "আর একবার যুদ্ধ বাধলে মিঃ অল্‌ড্যাস হাক্সলে কিংবা আমার মতো ব্যক্তিবাদী ও উদারপন্থী লেখকদের পাততাড়ি গুটাতে হবে। এটা নিশ্চিত যে আমাদের দিন ফুরিয়েছে এবং আগামী যুদ্ধও আসন্নপ্রায়।" যুদ্ধ অনিবার্য ঘোষণা করে তিনি বলেছেন: "অবস্থা যখন এইরূপ তখন আমার ও আমার সমানুভব ব্যক্তিদের কাজ হচ্ছে ইতিমধ্যের কাজ। আমাদের মরচে পড়া যন্ত্রপাতি দিয়ে টুকিটাকি এটা ওটা করে যেতে হবে যতদিন না সভ্যতার ইমারত শুদ্ধ ভেঙে পড়ে। ভেঙে যখন পড়বে, কিছুই আর কোন কাজে লাগবে না, তার পরে—যদি 'তারপরে' বলবার কিছু থাকে, সভ্যতার নব অভিযানে যারা এসে যোগ দেবে, তারা নতুনশিক্ষণ, নতুনমন্ত্র নিয়ে আসবে।" ফর্স্টারের এই উক্তির পর মন্তব্যের প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না। আজ মনে হয় ফর্স্টার নৈরাশ্যবাদী হলেও অনেক বেশী আন্তরিক—তখনকার দিনের ষ্টিফেন স্পেণ্ডার প্রভৃতি বামপন্থী লেখকদের তুলনায়—যারা যুদ্ধ বাধলেই প্রগতিশিবির ত্যাগ করেছেন এবং এখন আমেরিকার পক্ষপুটে বিরাজ করছেন। এদেশে এর একমাত্র তুলনা মেলে সুধীন্দ্রনাথ দত্ত ও বুদ্ধদেব

বসুর সঙ্গে। সুধীনবাবু প্রগতি সম্মেলনের সভাপতিবৃন্দের একজন হয়েও বলেছিলেন যে তিনি প্রগতি লেখক নন—এবং নিজের সম্পর্কে ঐ ধরনেব নৈরাশ্যবাদী উক্তি করেছিলেন। কিন্তু বুদ্ধদেববাবু ১৯৪২ পর্যন্ত প্রগতি-লেখক সংঘে নাম রেখেছিলেন, ফ্যাশিজমের বিরুদ্ধে এবং সোভিয়েটের পক্ষে প্রবন্ধ লিখেছিলেন—কিন্তু আজ তিনি ছোটেন ষ্টিফেন স্পেণ্ডারের সঙ্গে বম্বের আমেরিকা আয়োজিত 'সংস্কৃতির স্বাধীনতা' সম্মেলনে।

ফর্ষ্টারের প্রবন্ধের পর ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের "সাহিত্যে প্রগতি" প্রবন্ধ বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। ডঃ দত্তের লেখার কিছু অংশ উদ্ধৃত করার পর আমার যা সামান্য বক্তব্য আছে তা বলব। প্রগতির অর্থ কি তা বোঝাতে গিয়ে তিনি লিখছেন:

"আমাদের দেশের সাহিত্যিকরা সাধারণত সনাতনপন্থী; অতীতকে আঁকড়াইয়া থাকিয়া তাহাকেই সাহিত্যচর্চার পরম লক্ষ্য মনে করেন।" তারপর তিনি স্বীয় মাতৃভাষায় লিখিত যাবতীয় পুস্তককে সাহিত্যের অন্তর্গত করার দাবী কবে বলেছেন: "এদেশে সাধারণেব নিকট এখনও সাহিত্যের অর্থ কাব্য, নাটক ও অলংকার।" বিদেশের সাহিত্যকে যে তিনটি স্তরে অর্থাৎ আইডিয়ালিজম, রোমান্টিসিজম ও রিয়ালিজমের স্তরে ভাগ করা হয়ে থাকে তার উল্লেখ কবে ডঃ দত্ত প্রগতিশীল লেখকদেব জন্য, উপরন্তু প্রাচীন যুগ, সামন্ততান্ত্রিক যুগ, বুর্জোয়া যুগ ও প্রলেটারিয়ান যুগের সীমানা মনে করিয়ে দিয়েছেন। ডঃ দত্ত সাহিত্য কাকে বলে এবং তাব ভাব প্রচারের সক্রিয় ভূমিকার কথা উল্লেখ করে ভারতীয় সাহিত্যের উপর শেষোক্ত বিভাগ অনুযায়ী সমাজতাত্ত্বিক আলোচনা করেছেন। ঋগ্‌বেদ থেকে কৃষ্ণ মিশ্রের "প্রবোধচন্দ্রোদয়" নাটকাদি উল্লেখ করে তিনি মন্তব্য করেছেন: 'এই যে ব্রাহ্মণদের দ্বারা বিরচিত বিস্তৃত সংস্কৃত সাহিত্য লইয়া আজও আমরা গৌরব বোধ করি, তাহার স্বরূপ কি? বিশ্লেষণ দ্বারা ইহাই নিরূপিত হইবে: বর্ণাশ্রম ধর্মের প্রাধান্য, কুল ও বংশের মহিমা, স্বামীধর্ম, সামন্ত-রাজাদের অস্তিত্ব, বাজারে শিক্ষিতা গণিকার প্রাদুর্ভাব, গোলামশ্রেণীর অস্তিত্ব, স্ত্রীলোকের অবরোধ প্রথা, স্ত্রীলোক আইনের অধিকার হইতে বঞ্চিতা (যদিচ বৈদিক যুগের পর স্ত্রী ও পুরুষ উভয়ের সমানাধিকার আছে বলিয়া স্বীকার করিতেন)। এই সব পুস্তকে সামন্ততান্ত্রিক যুগ পূর্ণ মাত্রায় প্রকাশ পায়। সেইজন্য তাহাতে জনের ও গণের সংবাদ বিশেষ পাওয়া যায় না। কেবল রাজা-রাণী, সেনাপতি, মন্ত্রী, রাজা ও রাজকন্যার প্রনয়িনী। এই প্রাচীন সামন্ততান্ত্রিক

যুগের ইতিহাসে একটা ঘটনা দ্রষ্টব্য যে, ভাস হইতে হর্ষবর্দ্ধন পর্যন্ত সকলেই এক ছাঁচে নিজেদের নাটক রচনা করিয়াছেন। গল্পের বেশী বাহুল্য নাই। যাহা আছে ঐতিহাসিকরা বলেন তাহা সকলেই গুণাঢ্যের পৈশাচী প্রাকৃত ভাষায় লিখিত "বৃহৎকথা" হইতে Plagiarise করিয়া লিখিয়াছেন। এইসব পুস্তক একটি শ্রেণীর বিষয় ক্রমাগত বর্ণনা করিয়াছে বলিয়া সব পুস্তকই এক ছাঁচে ঢালা।"

ব্রাহ্মণাধিপত্য ও বর্ণাশ্রমের মাহাত্ম্যের যে সময় প্রচাব চলছিল সেই সময় "নাগরকগণ" লোকায়তবাদ. নাস্তিকতা, বাস্তবিকতা ও সুখভোগবাদ প্রচার করে। প্রাচীন হিন্দুর সুখ-সমৃদ্ধির কালে যখন নানা সমুদ্র বহন করে হিন্দুর অর্নবপোতগুলি নানাদেশ থেকে সুক্তাব বদলে মুক্তা, জিরার বদলে হীরা আনত তখন সেই সব অর্নবপোতদের মালিকদের মধ্যে 'নাগবিক শ্রেণী' উদ্ভূত হয়। বাৎসায়ন বলেন, এই নাগবকগণ লোকায়তধর্মের অনুরাগী হয়। ডঃ দত্ত এই ঘটনা সম্পর্কে মন্তব্য করছেন : আসল কথা, দেশে ধনবৃদ্ধির সঙ্গে সামন্ততন্ত্রী আভিজাত্যের পাশে একটা বুর্জোয়াশ্রেণী বিবর্তিত হয়। এই শ্রেণীর নাগরিকগণ পাশ্চাত্য দেশেব হালফ্যাশানেব ধনকুবেবগণের ন্যায় জীবন যাপন করিত।" ডঃ দত্ত ঐ শ্রেণীকে প্যাবীব বুলেভার্ডিয়ার সঙ্গে তুলনা কবেছেন :—

"ভাস ও মৃচ্ছকটিক নাটকেব চারু দত্ত তাহাবই একজন প্রতীক, যদিচ ধনহীন।" পুরাতন সাহিত্যে গণে'ব সন্ধান ডঃ দত্তেব মতে প্রধানত বৌদ্ধ অবদান ও অন্যান্য ধর্মপুস্তকে পাওয়া যায। গণে'রা সাম্যবাদী বৌদ্ধধর্ম্মের প্রতি অনুরাগী হয়। এরপব তিনি তান্ত্রিক মতেব সম্পর্কে বলেছেন যে তান্ত্রিক ধর্ম্ম সামাজিক হিসাবে বর্ণাশ্রমের বিপক্ষে যায় নি। এই সম্পর্কে তিনি রাজশেখরের "বিদ্ধশাল ভঞ্জিকা" ও ভবভূতির "মালতীমাধব" নাটকের উল্লেখ করেছেন। তিনি শেষ পর্যন্ত 'প্রবোধচন্দ্রোদয' নাটকের দৃষ্টান্ত দিযে ব্রাহ্মণদের National chauvinist & Imperialist রূপের বর্ণনা শেষ করেছেন। এইভাবে বাংলা সাহিত্যের এক হাজার বছরেব ইতিহাস সংক্ষেপে বলার সময় তিনি এই মন্তব্য করেছেন যে দাসজীবি গোপালের প্রতিষ্ঠিত পালবংশের রাজত্বেব কথা বাংলা সাহিত্যে উল্লেখ নেই—এক ছড়া বা গীতিতে ছাড়া। ব্রাহ্মণেরা মুছে দিয়েছে। "ধান ভানতে মহীপালের গীত"—এর স্থলে শিবের গীত হয়ে গেছে। পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মত উল্লেখ করে তিনি বলেছেন যে বাংলায় বৌদ্ধকৃষ্টির সমস্ত চিহ্ন ব্রাহ্মণেরা ধ্বংস করেছে, না হয় রূপান্তরিত করেছে। এবং এই হল

ধর্মের আবরণে ভীষণ শ্রেণী-সংগ্রাম। ডঃ দত্ত বলেছেন যে এই সময় গণশ্রেণীর পরিচয় পাওয়া যায় কেবল 'সূর্যের পাঁচালী', 'শূন্য পুরাণ' ও 'ধর্ম্ম-মঙ্গল' প্রভৃতির মধ্যে। তিনি এই প্রসঙ্গে বলেছেন যে 'ধর্মমঙ্গল'কে বাংলার এপিক বলে গণ্য করা উচিত। এই পুস্তকে জানা যায় যে সম্রাট ধর্ম্মপালের সেনাপতি লাউসেনের দক্ষিণ হস্ত ছিলেন কালু ডোম, ডোম ইন্দ্রমেটে গৌড়ের শহর কোটাল। এর পর তিনি মনসার ভাসানের থেকে কিছু উদ্ধৃত করে দেখান, উচ্চ শ্রেণীর শৈব ধর্ম্মের সঙ্গে গণশ্রেণীর ধর্ম্মের কি ধরণের সংঘর্ষ হচ্ছিল। ডঃ দত্ত আরো বলেছেন যে মুসলমান রাজারা বাংলা সাহিত্যের স্রষ্টা এবং মোগল শাসনের প্রচলনের সঙ্গে বাংলার রাজনীতিক্ষেত্রে সামন্ততন্ত্রেব যুগ শেষ হয়ে যায়। এই যুগের কবি কঙ্কণের চণ্ডীকে তৎকালীন বাংলার অত্যন্ত বাস্তববাদী ছবি বলে অভিহিত করে ডঃ দত্ত বিস্ময় প্রকাশ করেছেন যে সামন্ততন্ত্রের অবসান হল—কিন্তু কবি-কঙ্কন সংস্কৃত সাহিত্যের খাত পরিত্যাগ করতে পারলেন না। তিনি ভারত-চন্দ্রের "বিদ্যাসুন্দরের" মধ্যেও সেই প্রাচীন সামন্ততন্ত্রের ছাপ দেখতে পেয়েছেন এবং জার্ম্মান ফ্যাসিষ্ট সমাজতাত্ত্বিক Oswald Spenglar এব উক্তি উল্লেখ করে বলেছেন গ্রীক ও হিন্দু প্রভৃতি প্রাচীনের space এবং time অগ্রাহ্য করেছেন।

ডঃ দত্ত ইংরেজ শাসনের যুগে এসে বলছেন, 'ইংরেজ যে মধ্যবিত্ত শ্রেণী তৈরী করেছে—তারা সর্ববিষয়ে কর্তৃত্ব করছে। কিন্তু সাহিত্যক্ষেত্রে এরাও নাকি সামন্ত-তান্ত্রিক মোহ কাটাতে পারে নি। তিনি বঙ্কিম সাহিত্যকে পরোক্ষে কটাক্ষ করে বলেছেন: এই যুগের লেখকরা ভুলে যান যে বর্তমান কালের বুর্জোয়া অর্থাৎ ধনতান্ত্রিক সভ্যতার মধ্যে সামন্ততান্ত্রিক ভূস্বামী বা মোগল আমলের ভূস্বামীর স্থানে আর কেউ নেই, আর আজকালকার জমিদারেরা ইংরাজের জন্য প্রজার কাছে খাজনা আদায়কারী এজেণ্ট মাত্র।'

বাংলা সাহিত্যে কাল ব্যতিক্রমের উল্লেখ করে ডঃ দত্ত বলেছেন যে, যদিও ভারতীয় সমাজ সামন্ততান্ত্রিক অর্থনৈতিক ভিত্তিতে এখনও প্রতিষ্ঠিত,—কিন্তু ইংরেজ শাসনের জন্য এবং কলকারখানার জন্য যে মধ্যশ্রেণী বা বুর্জোয়া শ্রেণী সর্বত্র উদ্ভূত হয়েছে এবং যারা ভারত শাসনে ইংরেজের প্রতিদ্বন্দী তাদের বা শ্রমিক-কৃষকদের অস্তিত্বের চিহ্ন সাহিত্যে কই? এই প্রসঙ্গে তিনি শরৎচন্দ্রের 'বিপ্রদাস'কে তীব্র আক্রমণ করেছেন এবং বাংলায় একটা বুর্জোয়া সাহিত্য গড়ে উঠছে না কেন তার কারণ স্বরূপ বলেছেন বাংলার সমাজ এখনো সম্পূর্ণভাবে

'বুর্জোয়াত্ব' প্রাপ্ত হয় নি। বুর্জোয়ারা প্রাচীন আইন, সামন্ততান্ত্রিক বাধা নিষেধ, সমাজ-বন্ধন ছেদ করে সমাজকে নূতন ছাঁচে গড়তে চায়। কিন্তু ডঃ দত্ত বলছেন 'পনরক্ষা', 'হালদার গোষ্ঠী', 'চোখের বালি' প্রভৃতির দৃষ্টান্ত দিয়ে যে এসব পুস্তকেই সামন্ততন্ত্রের প্রতিধ্বনি রয়েছে। এর পর ডঃ দত্ত 'কল্লোল যুগের' কথা পরোক্ষে এনে প্রত্যক্ষভাবে 'শেষ প্রশ্নের' কথা তুলে বলেছেন: 'তবে হালে এক প্রকার নূতন সাহিত্যের উদয় হইয়াছে, তাহা একটি বুর্জোয়া সাহিত্যের অভিমূলে যাইতেছে মনে হয়। কিন্তু ইহা কেবল 'ইডিপাস কম্প্লেক্স' অনুসরণ করিয়াই পরিশ্রান্ত। ইহাতে সমাজকে আধুনিক ছাঁচে গড়িয়া তুলিবার কোন আদর্শই দিতে পারিতেছে না। ইহাতে জনের সন্ধান বিশেষ কিছু পাওয়া যায় না—গণের তো নয়ই। কেবল পাওয়া যায় যৌন সম্বন্ধেব কাহিনী।···শুধু যৌন সম্বন্ধের বিচাব করিলেই পুরুষ ও নাবীর শেষ প্রশ্নের সমাধা হয় না। আবার নারীব ক্রমাগত স্বামী বা প্রণয়ী পরিবর্তন করাই তাহার সামাজিক "শেষ প্রশ্ন" নয়। ইহা কোন্ সমাজের আদর্শ তাহা জানি না। অন্তত সাম্যবাদী গণশ্রেণী সমাজে তাহা নয়—ইহা নিশ্চিতভাবে জানি। এই জন্য এই সাহিত্যকে পূর্ণ ভাবে বুর্জোয়া সাহিত্য বলা যাইতে পাবে না। খুব সম্প্রতি আসিয়াছে একটি নূতব ধবণেব সাহিত্য ও তাহা গণশ্রেণীর জীবনবৃত্তান্ত আলোচনা কবে।···পুস্তকে গণশ্রেণীর জীবন সম্বন্ধে লিখিলেই তাহা গণসাহিত্য হয় না। গণশ্রেণীর দুঃখ, দারিদ্র্য, আকাঙ্ক্ষা ও আদর্শেব কথা, হৃদযের বেদনা ও সুখেচ্ছার কথা লইয়া এবং তাহাকে সমাজেব কেন্দ্রীভূত করিয়া তাহার World View নিয়া যে সাহিত্য গড়িয়া উঠিবে তাহাকে গণ-সাহিত্য বলা যায়। ভারতে অর্থনৈতিক কারণে একটি গণ আন্দোলন চলিতেছে বটে, কিন্তু তাহাব একটি সাহিত্য এখনও গডিযা উঠিতেছে না—ইহাও একটি কাল ব্যতিক্রম। যেদিন গণশ্রেণীর লোক সাহিত্যে লোক সমাজের চিত্র অঙ্কিত করিবে, সেই দিন একটি জীবন্ত গণসাহিত্য উদ্ভূত হইবে।···মোটের উপব দেখি আমাদেব সাহিত্য একদিকে সমাতনী খাতে প্রবাহিত হইতেছে, অন্যদিকে অদ্ভুতভাবে বৈদেশিক ভাব আসিতেছে। আমার মতে উভয়েই বেখাপ্পা। আমাদের সাহিত্যে realism-এর অভাব অত্যন্ত রহিয়াছে। আমরা space time-কে ঠিকভাবে ধরিয়া চলিতেছি না। তাই একদল নূতন লেখক প্রয়োজন যাঁহারা বিভিন্ন স্তরের যথার্থ অবস্থা সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জন ও পরিবেশন করিবেন, যাঁহাবা সমাজ ও সাহিত্যকে সনাতন গণ্ডী হইতে বাহির করিবেন এবং কাল ব্যতিক্রমের অসামঞ্জস্যের কবল হইতে রক্ষা করিবেন।

সাহিত্যে প্রগতি আনিতে হইলে এগুলির বিশেষ প্রয়োজন। যাহাতে সমাজ যথার্থই অগ্রগতিশীল হয়– তাহাই প্রগতি লেখকদের লক্ষ্য হওয়া প্রয়োজন।"

"প্রগতির" সমালোচনা প্রসঙ্গে ডঃ দত্তের প্রবন্ধকে আমি সর্বাপেক্ষা বেশি গুরুত্ব দিয়েছি এবং শেষ পর্যন্ত তার অনেকখানি উদ্ধৃত করেছি দুটি কারণে। প্রথমত সে যুগে এ ধরণের লেখা আর কারো কলম দিয়ে বার হয়নি। দ্বিতীয়তঃ ডঃ দত্ত 'প্রগতির' অন্য সব লেখকদের থেকে স্বতন্ত্র—তাঁর বিচিত্র রাজনৈতিক ও পণ্ডিতি জীবনের জন্য। ডঃ দত্ত অগ্নিযুগের নেতাদের মধ্যে বোধহয় সর্বপ্রথম যিনি মার্কসবাদে বিশ্বাসী হন—এবং কমিউনিষ্ট পার্টিতে যোগ না দিয়েও বাংলা দেশের সাম্যবাদী আন্দোলনের ওপর নানা প্রভাব সৃষ্টি করেন। আবার তিনি পণ্ডিতরূপেও পরিচিত। এই লেখার বেশ কিছুকাল পবে তিনি "সাহিত্যে প্রগতি" বলে একটি বইও লিখেছেন। আপাতত সে বই সম্পর্কে কোন আলোচনা না করে আমার মন্তব্য কেবল এই প্রবন্ধেব ওপর রাখবো। পূর্বেই বলেছি যে "প্রগতি" সংকলনের মধ্যে এই প্রবন্ধ সব থেকে উল্লেখযোগ্য এই কারণে যে, বাংলা সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত অথচ ধারাবাহিক আলোচনায তিনি "প্রগতি" সাহিত্য কি তা উদাহরণ দিয়ে বোঝাতে চেষ্টা ়রেছেন, সাহিত্য বিচারের সমাজতাত্ত্বিক পদ্ধতি নির্দেশ করেছেন, সাহিত্যের সঙ্গে সমাজেব অর্থনৈতিক বিকাশের সম্পর্ক অন্য প্রবন্ধের তুলনায় অনেক পরিষ্কার করে তুলে ধরেছেন এবং সমাজের অগ্রগতি যে প্রগতি সাহিত্যের লক্ষ্য সে বিষয়ে দৃঢ় ঘোষণা জানিয়েছেন। ডঃ সেনগুপ্তের রসবিচার বা অধ্যাপক ধূর্জটি মুখোপাধ্যায়ের ডায়ালেক্‌টিকাল মেটিরিয়ালিজমের বদলে মেকানিষ্টিক মেটিরিয়ালিজমের বুদ্ধিদীপ্ত উপদেশের তুলনায় অনেক বেশী বাংলা সাহিত্যের মাটিতে দাঁড়িযে কথা বলেছেন যা যে-কোন সাহিত্য-রসিককে নতুন পথে চিন্তা কবার সূত্র ধরিয়ে দেবে।

কিন্তু এসব সত্ত্বেও তাঁর কয়েকটি মন্তব্য গুরুতব বিভ্রান্তির সৃষ্টি করে। যেমন ব্রাহ্মণের অত্যাচাব বলে একটা যুগের সমস্ত সাহিত্যকে যেভাবে তিনি উড়িয়ে দিয়েছেন তা মার্কসবাদী সম্মত নয় বলে আমার ধারণা। কারণ যে আবশ্যকীয় সামাজিক শ্রম বিভাগের ফলে (Division of labour) ব্রাহ্মণের দ্বারা বেদ, পুরাণ, ধর্মশাস্ত্র প্রভৃতি সৃষ্টি হয়েছিল তাকে শুরুতেই ব্রাহ্মণের সাম্রাজ্যবাদ বলে নস্যাৎ করা ডঃ দত্তের-মত মার্কসবাদী সমাজতাত্ত্বিকের পক্ষে উচিত হয়েছে বলে মনে হয় না। কারণ শ্রম-বিভাগ ম্যানুফ্যাকচারিং যুগে এবং ধনতান্ত্রিক যুগেই

প্রধানত জনগণের অজ্ঞতা সৃষ্টির কারণ হয়েছে। ব্রাহ্মণের আধিপত্য যে সামন্ততান্ত্রিক যুগের এক অবস্থায় সামাজিক অগ্রগতির পথ রোধ করেছিল একথা অবশ্যই বলা যায়। কিন্তু প্রাথমিক অবস্থার কোন পরিচয় না দিয়ে কেবল শেষের দিকের দৃষ্টান্ত দিয়ে সে যুগের গোটা সাহিত্যকে নস্যাৎ করা যুক্তি সঙ্গত নয়। দ্বিতীয়ত ফ্যাসিষ্ট দার্শনিক স্পেঙলারের মত উল্লেখ করে তিনি হিন্দু ও গ্রীকদের Space-time বোধের অভাবের যে উল্লেখ করেছেন তাও মার্ক্সবাদী-সম্মত নয়। তিনি নিজে এই প্রবন্ধের এক জায়গায় লিখেছেন মোগল শাসনের প্রচলনের সংগে বাংলার রাজনীতি ক্ষেত্রে সামন্ততন্ত্রের যুগ শেষ হয়ে যায়, আবার প্রবন্ধের শেষে লিখেছেন এদেশের অর্থনৈতিক অবস্থা এখনো সামন্ত-তান্ত্রিক। ভারতীয় সমাজের অর্থনৈতিক কাঠামো সম্পর্কে স্থির বিচার না করে তিনি সাহিত্যের মার্কসবাদী ব্যাখ্যা করতে গিয়ে কাল-ব্যতিক্রমের ব্যাখ্যা করতে অক্ষম হয়েছে। এবং কেন এদেশের সাহিত্যে ইউরোপের বুর্জোয়ার দেখা মেলেনা তার জন্য অবাক হয়েছেন। "To study the connection between intellectual and material production, it is necessary above all to deal with the latter not as a general category but in a definite historical form. Thus for example, the kind of intellectual production corresponding to capitalist methods of production is different from that corresponding to medieval methods of production. If material production is not grasped in its specific historical form it is impossible to understand the concrete nature of the intellectual production corresponding to it and the interplay of both factors. If this is not done—the result is an absurdity."

"Furthermore, some definite form of material production there results, first, a definite structure of society and secondly, definite relationship of men to nature. Their state forms and intellectual outlook are determined by both. So is the nature of their intellectual production.

(K. Marx—'Literature and Art.' p. 27)

গ্রীস এবং তার আইন সম্পর্কে মার্কস্ ও এঙ্গেলসের আরো কয়েকটি কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন। এঙ্গেলস্ বলছেন :

It was slavery that first made possible division of labour between agriculture and industry on a considerable scale; —Without slavery no Greek art and science. "It is clear that so long as human labour was still so little productive that it proved but a small surplus over and above the necessary means of subsistence, any increase of the productive forces, extenison of trade, development of the state or beginning of art and science was only possible by means of greater division of labour and the few privilaged persons directing labour……and at a later stage, occupying themselves with art and science…In the historical conditions of the ancient world, and particularly of Greece, the advance to a society based on class antagonism could be accomplished in the form ot slavery.

গ্রীক ও হিন্দু সাহিত্যে কালব্যতিক্রম সম্পর্কে ডঃ দত্ত যে বিস্ময় প্রকাশ করেছেন এবং ঋগ্‌বেদপ্রমুখ পুরাতন সাহিত্যে দানস্তুতি, দশরাজার যুদ্ধ, ইন্দ্রের সম্বরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ প্রভৃতি সমাজের উচ্চস্তরের লোকদের ক্রিয়াকলাপ যে ভাবে আলোচনা করেছেন—সে সম্পর্কে মার্কসের আর একটি বক্তব্য বলে আমি ডঃ দত্তের উপর আলোচনা শেষ করতে চাই। মার্কস্ বলেছেন—

" It is well known that certain periods of highest development of art stand in no direct connection with the general development of society, nor with material basis and the skeleton structure of its organisation. Witness the example of the Greeks as compared with the modern nations or even Shakespeare. As regards of certain forms of art, as, e.g., the epics it is admitted that they can never be produced in the world-epoch making form as soon as art as such comes into existence; in other words that in the domain of art

certain important forms of it are only possible at a low stage of its development···It is a well known fact that Greek mythology was not only the arsenal of Greek art, but also the very ground from which it sprang, Greek art presupposes the existence of Greek mythologyt, i.e., that nature and even the form of society are wrought up in popular fancy in an unconciously artistic fashion. "

প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য সম্পর্কে ডঃ দত্ত যে রকমভাবে হিসাব করেছেন তাতে এই দৃষ্টিভঙ্গী প্রকাশ পায় না—বরং যান্ত্রিক বস্তুবাদের দৃষ্টিভঙ্গী প্রকাশ পায়। ডঃ দত্ত ভারতে সামন্ততন্ত্র, বর্জোয়াতন্ত্র ও সাম্রাজ্যবাদের ভূমিকা কাল ও সামাজিক অবস্থাব হিসাবে ঠিকমত বিচার করেন নি বলে আধুনিক বাংলা সাহিত্যের উপযুক্ত সমালোচনা করতে অক্ষম হয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র সম্পর্কে তাঁদের লেখার এবং দৃষ্টিভঙ্গীর দুর্বল জায়গাগুলি তুলে ধরে তাঁদের সম্পর্কে যথাযথ বস্তুতান্ত্রিক বিচারের দ্বারা তাঁদের জনপ্রিয়তার কারণ দেখানো সম্পর্কে নীরব রইলেন। ডঃ দত্তের পক্ষে এ মারাত্মক ত্রুটি। কারণ তাঁর স্থান অন্য সকলের উপরে। ডঃ দত্ত গত সংখ্যার "অগ্রণী"তে মার্কসের ভুল ধরতে গিয়ে আমেরিকার পণ্ডিত বুর্জোয়া লোই-এর যুক্তি উল্লেখ করেছেন। আমরা যারা ডঃ দত্তকে নানা কারণে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করি তাদের কাছে ডঃ দত্ত কর্তৃক মার্কসের সমর্থনে Bloomfield ও Oswald Spengler-এর উল্লেখ যেমন বিভ্রান্তিকর তেমনি আশ্চর্যজনক মার্কসের ভুল ধরার কাজে মার্কিনী পণ্ডিতের উল্লেখ। কারণ ডঃ দত্ত নিশ্চয় জানেন এই মার্কিন ভদ্রলোককে বুর্জোয়া পণ্ডিতরাও মানেন না।

এর পর আর দুটি প্রবন্ধ সাহিত্য সম্পর্কে আছে। একটি বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায় এবং অপরটি সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামীর। বিজয়লালবাবুর প্রবন্ধ "প্রগতি সাহিত্যের রূপ" বাহ্যতঃ খুবই প্রগতিশীল কিন্তু অত্যন্ত অগভীর। যেমন বলা আছে যে প্রগতি সাহিত্যের ভিত্তি বাস্তবের উপর। বাস্তবের নিষ্ফলতার মধ্যে প্রগতি সাহিত্যের পূজারীর আনন্দ নেই! প্রগতি সাহিত্য বাস্তবকে ভেঙে তাকে নতুন রূপ দিতে চায়, কর্মের সঙ্গে জ্ঞানের সর্বনেশে বিচ্ছেদ আর্টকে প্রাণহীন করেছে। শ্রেণীহীন সমাজ গড়ার অভিযানে সাহিত্যিককে অগ্রসর হতে হবে। কি হবে আর্টের কল্পলোকে বিচরণ করে যদি কোটি কোটি মানুষের জীবনের উপর

দুঃসহ দুঃখ জগদ্দল পাথরের মত চেপে থাকে ? সে আর্টের মূল্য কি, যা পুরাতন বুর্জোরা সমাজকে চূর্ণ করেতে সাহায্য না করে ? প্রগতি সাহিত্যকে নূতন যোদ্ধার রূপ নিতে হবে—অন্যায়ের বিরুদ্ধে বুর্জোয়া সমাজের শ্মশান-ভস্মের উপরে শ্রেণীহীন সমাজ গড়বার সুস্পষ্ট লক্ষ্য নিয়ে······ইত্যাদি। বিজয়লালের প্রবন্ধ প্রায় সবই প্রগতির ফেনা—তাই তা না থিতিয়েছে আমাদের জন্য, না তাঁর জন্য। প্রগতি সম্পর্কে বাগাডম্বর যে মানুষকে কোথায় নিয়ে যায়—তার পরিনতি বিজয়লাল স্বয়ং। "সাহিত্যে বাস্তব ও কল্পনা" প্রবন্ধে সুরেন্দ্রনাথ অবাস্তব এবং সমস্যা সমাধানের পক্ষে অপারগ কল্পনার বিকারকে টেকনিক বা আংগিক আখ্যা দিয়ে সাহিত্যের নামে চালাবার বিরুদ্ধে তীব্র মন্তব্য করেছেন। বিজ্ঞান ও সাহিত্য, বুদ্ধি ও কল্পনা পরস্পরের হাত ধরাধরি করে সমাজের ঐতিহাসিক অগ্রগতির যাত্রাপথে মানুষের মিছিলের সঙ্গে চলবে এই আশা তিনি পোষণ করেছেন। সুরেন্দ্রনাথ প্রধানত যুক্তির সাহায্যে সুস্থ কল্পনার স্থান নির্দেশ করেছেন।

এছাড়া 'প্রগতি' সংকলনে যে সব গল্প আছে তার বিস্তৃত আলোচনা আজ করে লাভ নেই। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়-এব "সই", বিধায়কের "ঠুন্‌কি" (একটি মুরগীর গল্প), প্রেমেন্দ্র মিত্রের "কল্পনা"য় গল্পগুলিতে গরীব লোকের দারিদ্র্যের লাঞ্ছনা দেখিয়ে সহানুভূতি সৃষ্টি কবা হয়েছে। "ঠুন্‌কি" প্রায় "মহেশের" মত কিন্তু 'মহেশ' ভাগচাষী বা ক্ষেত মজুবের যে পরিবেশ এবং সামাজিক অবস্থা বোঝা যায়, এতে তা নেই। প্রেমেনবাব "কল্পনায়" একটি খালাসীর জীবন দেখিয়েছেন। মৃত্যুপথযাত্রী স্ত্রীকে ফেলে জাহাজে ফিরে দেশ ছেড়ে যেতে হবে বলে সে আত্মহত্যা করল। এই ঘটনা সৃষ্টির সুযোগ নেওয়া ছাড়া "খালাসী" নাম দেওয়ার কোন সার্থকতা নেই। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়েব "প্রকৃতি" গল্পটি প্রকৃতপক্ষে অত্যন্ত প্রতিক্রিয়াশীল। এই সব লেখকরা এতদিন মধ্যবিত্তকেই সর্বগুণের আধার বলে মেনে এসেছেন। মানিক বাবু এই গল্পে প্রমাণ করেছেন যে টাকা থাকা যেমন খারাপ, না থাকাটাও তেমনি খারাপ। তবে টাকাওয়ালা লোকদের ঘৃণা করেও তাদের সঙ্গে বসে ভদ্র ব্যবহার করার অভিনয় করা সম্ভব। কিন্তু গরীবের সঙ্গে সেটুকুও সম্ভব নয়। কারণ দারিদ্র্য যে তাদের বহিরাবরণকে পর্যন্ত নোংরা করে ফেলেছে। আর এই নাকি মানুষেব প্রকৃতি !

গল্পগুলির মধ্যে প্রবোধ সান্যালের "আগ্নেয়গিরি" সে যুগে কেন আজকের যুগেও প্রগতিশীল বলে গণ্য হবে। একটি সংবাদপত্র, তার স্বদেশী মালিক,

প্রগতিশীল সম্পাদক আর সেখানকার কর্মচারীদের অবস্থা নিয়ে লেখা এই গল্প। স্বদেশী ম্যানেজিং ডিরেক্টার কিভাবে চাপ দিয়ে ধর্ম্মঘটে উদ্যত কর্মীদের মাইনের হার কমিয়ে দিলেন এবং যে সম্পাদক ওদের মাইনে যাতে না কমে তার জন্য চেষ্টা করছিলেন তাকে বুঝিয়ে দিলেন: মিথ্যে গরীবদের জন্য চেষ্টা করা— বিপদ দেখলে তারা কেটে পড়বে। কর্মচারীদের এই দুর্বলতায় সম্পাদক চাকুরী ছেড়ে দিলে এই আশায় যে, "এরা একদিন দাঁড়িয়ে উঠবে, একদিন আনবে প্রচণ্ড বিপ্লব; এদের সকলের উন্মত্ত অসন্তোষ ঝড় তুলবে ওদের প্রাসাদে প্রাসাদে, কঙ্কালসার নিরন্ন দুর্বলের বুকের আগুন চল্‌তি সমাজকে ছারখাব করে দেবে।" সংক্ষেপে এই হ'ল বাংলা সাহিত্যে প্রথম যুক্তফ্রণ্টেব সৃষ্টিশীল ক্রিয়া কর্মের পরিচয়।

"প্রগতি" সংকলনের পর যে সব কাগজপত্র যোগাড় করতে পেরেছি—তা তা হল কলকাতা প্রগতি লেখক সম্মেলন সম্পর্কে লক্ষ্ণৌ থেকে প্রকাশিত "নিউ ইণ্ডিয়ান লিটারেচার"-এর প্রথম সংখ্যা। এই পত্রিকা থেকে বাংলা ও ভারতীয় প্রগতি লেখক আন্দোলনের কয়েকজন মুখপত্রের তৎকালীন দৃষ্টিভঙ্গীর আভাস পাওয়া যাবে। কিন্তু এই প্রসঙ্গ শুরু করার আগে আমি আর একটি প্রবন্ধের আলোচনা করব—যার লেখকের সম্পর্কে আমাকে ১৯৪৩-৪৮ সনের ইতিহাস বার বার উল্লেখ করতে হবে।

প্রবন্ধটির নাম "ভবিষ্যতের শিল্প ও সাহিত্য"। লেখক হচ্ছেন বিখ্যাত কমিউনিষ্ট নেতা পাঁচুগোপাল ভাদুড়ী এবং প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়েছিল ১৩৪৩ সালের মাঘ মাসের 'পরিচয়ে'। আমি পাঁচুবাবুর কাছ থেকে শুনেছি এই প্রবন্ধ লেখা হয় বক্সা বন্দী নিবাসে আরো কযেক মাস আগে। অর্থাৎ 'প্রগতি' সংকলন প্রকাশের প্রায় বছর দেড়েক আগে।—কেন পাঁচুবাবুর প্রসঙ্গ আমি আলোচনা করছি তার কারণ বলছি।

পাঁচুবাবু এবারের নির্বাচনে শ্রীরামপুর থেকে কমিউনিষ্ট প্রার্থী হিসাবে দাঁড়িয়েছেন। তিনি কমিউনিষ্ট পার্টি'র বাংলা কমিটির সভ্য এবং এক সময়ে সম্পাদকও ছিলেন। বৃটিশ আমলে তিনি একবার হিজলী বন্দী-নিবাস থেকে পালান। ১৯৩০ সালে যখন মেদিনীপুরে সত্যাগ্রহী মেয়েদের ওপর পুলিসের অকথ্য অত্যাচার হচ্ছিল তখন তিনি গান্ধীজীর 'নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের" নীতির মধ্যে থেকে দিনের পর দিন যেভাবে নিজের শরীর দিয়ে এই অত্যাচাবকে থামাবার চেষ্টা করেছিলেন—তাতে শত্রু-মিত্র সকলের বিস্ময় অর্জ্জন করেছিল।

তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাল ছাত্র ছিলেন। এবং নানা বিষয়ে পড়াশুনা করেছিলেন।

গণনাট্য সংঘে যখন মাসিক ভাতা দিয়ে সর্বক্ষণের শিল্পীদল গঠন করা হ'ল তার শুরু থেকেই পাঁচুবাবু গণনাট্য আন্দোলনের কমিউনিষ্ট কর্মীদলের রাজনৈতিক উপদেষ্টার কাজ করেছেন এবং দ্বিতীয় কংগ্রেসের পর কমিউনিষ্ট পার্টি বে-আইনী হওয়া পর্যন্ত তিনি প্রাদেশিক কমিটির পক্ষে এই দায়িত্ব বহন করেছেন। গণনাট্য সংঘের উন্নতির ইতিহাসের যুগে ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট 'পিপ্‌লস রিলিফ কমিটির'ও তিনি বিশিষ্ট কর্মী ছিলেন এবং এই সব কারণে বাংলার শিল্পী ও সাহিত্যিকদের (কলিকাতাবাসী) কাছে থেকে সেই সময়কার বাংলার দুর্গত জনসাধারণের অবস্থা জানাবার জন্য তিনি কয়েকবার প্রগতি লেখক ও শিল্পী সংঘের ৪৬ নং ধর্মতলা ষ্ট্রীট (বর্তমানে লেনিন সরণী—লেখক) অফিসে লেখকদের বৈঠকে আসেন ও লেখার মাল-মশলা সরবরাহ করেন। প্রগতি লেখক সংঘের কমিউনিষ্ট কর্মীদের বৈঠকে তিনি না এলেও তাঁর প্রভাব ওখানকার প্রধান সংগঠকদের উপর ছিল। কাজেই তাঁর রাজনৈতিক মতামত ছাড়াও সাহিত্যিক মতামত নিশ্চয় আলোচনাযোগ্য। তা ছাড়া প্রগতি লেখক সংঘের কয়েকজন পুরাতন কর্মীদের খুব কম লোকই জানতেন যে পাঁচুবাবু সাহিত্য ও শিল্প নিয়ে অত্যন্ত গভীর ভাবে চিন্তা করেছেন এবং তাঁর ১০।১২ বছর আগেকার অনেক সিদ্ধান্ত আজো বহুলাংশে নির্ভুল, যদিচ তখনকার গণনাট্য সংঘের অনেক হাতুড়ে আর্ট-স্পেশালিষ্ট তাঁকে নিছক রাজনৈতিক নেতা এবং আর্টের ক্ষেত্রে 'অবাঞ্ছিত' হস্তক্ষেপকারী বলেই মনে করতেন।

আর্টের বাস্তববাদী সংজ্ঞা

আপাতত এইটুকু ভূমিকা করে পাঁচুবাবুর প্রবন্ধে আসা যাক। পাঠকরা মনে রাখবেন যে, এই প্রবন্ধ আজ থেকে ১৬ বছর আগে লেখা এবং জেলের মধ্যে বসে লেখা, যেখান থেকে প্রয়োজন মত পুঁথিপত্র যোগাড় করা খুবই দুঃসাধ্য। পাঁচুবাবু প্রথমে আর্ট কাকে বলে তার একটা সংজ্ঞা দিতে চেষ্টা করেছেন। তিনি লিখেছেন :

"অনুভূতি যখন সমষ্টিবোধ্য রূপের মধ্য দিয়ে প্রকাশ পায়, তখন সেই প্রকাশকে বলা হয় আর্ট…। আর একটা সংজ্ঞা আমরা দিতে পারি। যেমন লিও টলষ্টয় বলেছিলেন, 'Art is a means of emotionaly infecting men,' অর্থাৎ আর্ট অপরের অনুভূতি জাগাবার উপায় বিশেষ।" এই সংজ্ঞাকে

বুঝবার জন্য তিনি দুই দিক থেকে বিচার করতে বলেছেন: এক হ'ল—সীমা এবং আর একটি হ'ল অনুভূতির উৎপত্তি ও ক্রমবিবর্ত্তন। অর্থাৎ সমাজগত মানব জীবনের প্রগতি সম্পর্কে অনুসন্ধান করতে হবে। কিন্তু তার আগেই জানা দরকার অনুভূতির প্রকাশ মাত্রই কি আর্ট? তিনি উদাহরণ স্বরূপ বক্তার বক্তৃতা ও বিকলাঙ্গ ভিখারীর করুণ আবেদনের উল্লেখ করে বলেছেন যে, একে সুকুমার কলা বলা যায় না। তবে কাকে আর্ট বলব? যারা বলেন: 'যে প্রকাশ সত্যই কলাসঙ্গত সে নিজের সৌন্দর্য ও সৌকুমার্য্যের পরিচয় লিপি নিয়েই আসবে, আমার অর্থাৎ সমঝদারের কাজ তাকে তখন চিনে নেওয়া এবং আসল জিনিসকে চিনতে পারার ভিতরই ত আমার সমঝদারীর পরীক্ষা।' তাদের উত্তরে পাঁচুবাবু লিখেছেন, "আমি এবং আমার মত আরো যারা সাহিত্য-রসের আস্বাদ পেন, তাদের মধ্যে মিল কোথায় ও কেন, এবং আমাদের সঙ্গে সাহিত্য স্রষ্টারই বা যোগ কতখানি, আমি তাও জানাতে চাই। রসের স্বর্গলোকে কমলাকান্তের মত শুধু মসগুল হয়ে থেকেই আমি সন্তুষ্ট নই। আমার চরিতার্থতা এবং অপরের চরিতার্থতার হিসাব করতে গেলেই ব্যক্তিগত সীমা থেকে বেরিয়ে আসতে হয়। বেরিয়ে আসি রসলোকে যেখানে পরিবর্তনশীল সমাজের পরিপ্রেক্ষিতে নিত্য নূতন অনুভূতি জাগাচ্ছে এবং স্রষ্টার কারিগরীর ভেতর দিয়ে কলাসঙ্গত রূপ পাচ্ছে। আর্টিষ্ট ও সমঝদারের যোগ কোথায় এবং কেন—তার পরিচয় পেতে গিয়ে আমাকে হতে হবে বৈজ্ঞানিক।"

আর্টের উৎপত্তির বস্তুতান্ত্রিক ইতিহাস

এইভাবে কলাবিজ্ঞানের আলোচনায় স্থান, কাল ও সাম্প্রদায়িকতার কথা আসে। সাম্প্রদায়িকতা বলতে তিনি কমিউনিটি ও পরে শ্রেণীর কথা ভেবেছেন। আর্টের সার্বজনীন আবেদন বিচার করতে গেলে প্রত্যেক সমালোচককে যে এই স্থান, কাল ও শ্রেণীর দিকটা ভাবতে হবে—এ উক্তি করে তিনি নৃত্য গীত প্রভৃতির আদিম অবস্থার কথা বর্ণনা করেছেন। নৃত্য সম্পর্কে তিনি বলেছেন: "আদিম নৃত্য ছিল তখনকার গোষ্ঠীর সরল জীবন প্রণালীর প্রতিচ্ছবি, বন্য পশু শিকারের বা কৃষি কার্যের সময়কার পরস্পর সহযোগের প্রতীক স্বরূপ। তখনও ব্যষ্টিনৃত্য আসে নি—নৃত্য ছিল সমষ্টিগত গোষ্ঠীর সমাজ জীবন থেকেই আবদ্ধ। ছন্দের উৎপত্তি খুঁজতে গেলে তার কারণ মানুষের শরীর গঠনের ভিতর পাই। ইতর জীবের ভিতরও ছন্দ পাই—ঘোড়া কদমে চলে, ভারবাহী উট তালে তালে পা ফেলে। এখানে ছন্দোবদ্ধতার ভিতর আছে সাচ্ছন্দ্য, শক্তির স্বল্পতম

ব্যবহারের মধ্যে জীবদেহের সুস্থতার ইঙ্গিত। মানুষের সমষ্টিগত জীবনে ছন্দের আর একটি দিক আছে, সেটি হচ্ছে সহযোগিতার ভিতর দিয়ে সমষ্টিগত কার্যের সুবিধা।...উৎপাদন এবং মানসিক উৎকর্ষ দুদিক দিয়েই অতি নিম্নস্তরে থাকলেও আদিম গোষ্ঠীর মধ্যে জ্ঞান ও কর্ম (Intellectual and Physical labour) দ্বিধাবিভক্ত হয় নি। তাই তখন সমগ্র গোষ্ঠীই ছিল নৃত্যের স্রষ্টা ও বোদ্ধা এবং নৃত্য সামাজিক মানুষের জীবনযাত্রার প্রণালী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে নি।" ঠিক এইভাবে সঙ্গীত সম্পর্কেও উক্তি করে তিনি বলেছেন : "সমাজের পরিবর্তনে মানুষের সংগ্রাম নূতন নূতন রূপ নিয়েছে ; নূতন সমস্যা, নূতন সংগ্রাম, নূতন পরিণতির ভিতর দিয়ে অবচেতন মনের সমৃদ্ধিতে পুরাতনের সঙ্গে যোগ হয়েছে নূতনের—যাদের ঘাত-প্রতিঘাতের ও সংযোগ বিয়োগেব বহুরূপ সংমিশ্রণে আর্ট জটিল হতে জটিলতর হয়েছে, সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর হয়েছে এবং সমাজে সাম্প্রদায়িক ভাগের সঙ্গে ব্যবহারিক জীবনের প্রত্যেক প্রয়োজন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পৃথকতর রূপ নিয়েছে।"

জনসাধারণের সঙ্গে আর্টের বিচ্ছেদ

আর্ট যেমন নূতনতর এবং জটিলতর হয়েছে, তেমনি সমাজের মানুষ যারা প্রথমে সকলেই ছিল প্রাথমিক আর্টের সমষ্টিগত স্রষ্টা, তারা আজ সকলে স্রষ্টা তো নয়ই এমন কি বোদ্ধাও নয়। সমাজ তার সবল সহযোগিতা থেকে স্বার্থ বিভক্ত, দ্বন্দ্ব কুটিল রূপ নেয়ার পর অনেক মানুষই রয়ে গেল জীবনযাত্রার প্রাথমিক প্রয়োজন পূরণের চেষ্টার মধ্যে আবদ্ধ ......জীবন রক্ষার কার্য তাদের হয়ে উঠল দিন যাপনের গ্লানি। ছন্দোবদ্ধ অভিব্যক্তির মধ্যে আদিম জীবনের স্বাচ্ছন্দ্য ও স্বাস্থ্য তাদের আর রইল না। আর্টের নূতনতম আত্মপ্রকাশগুলোও তাদের কাছে ধরা দিল না, তাদের অবসরহীন জীবনের মধ্যে স্থূল অনুভূতিগুলোই রয়ে গেল।...সূক্ষ্ম অনুভূতিগুলো আশ্রয় নিল তাদের কাছে যারা জীবনযাত্রার স্থূল প্রয়োজন পূর্ণ হয়ে যাওয়ার অবসরের মধ্যে অন্তরের সুকুমার বৃত্তি গুলোকে লালন করতে পারল।"

এরপর তিনি ভাষার উৎপত্তি সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে লিখেছেন : "শব্দ তথা ভাষার জন্ম আদিম মানবগোষ্ঠীর Praxis-এর (ব্যবহারিক জীবনের) ভিতর। জীবন সংগ্রামের কার্য-প্রণালীর মধ্যে শব্দের উৎপত্তি ; শব্দগুলো প্রথম ছিল ক্রিয়াবাচক...পরে অন্য শব্দের সৃষ্টি হয়।...জীবন যাত্রার প্রত্যক্ষ প্রণালী থেকে উদ্ভূত হয়ে ভাষা. ভাবের প্রতীক হয়ে দাঁড়ালো।...তারপর লক্ষ লক্ষ

বছরের পরিবর্তনের ফলে আজ আর কাজ ও ভাবের সেই প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ পাওয়া যায় না। ভাবকে মানুষের সমগ্র অতীতের প্রবাহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে যখন তাকে স্বতন্ত্র সত্তা দেওয়া হয়, তার ভাষাকে মাত্র তার বাহন বলা হয়, তখন মাত্র এইটুকু ভুলে যাওয়া হয় যে সামাজিক মানুষের কার্যের ক্ষেত্রে ভাব ও ভাষা যমজ সহোদর এবং শব্দ বা ভাষাই হচ্ছে ভাবের প্রতীক।"

সাহিত্যে বিশ্বজনীনতার উৎস

সফোক্লিস থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত অনেক বিষয়ে ঐক্য পাচ্ছি কি করে? এই প্রশ্ন নিজেই তুলে জবাবে পাঁচুবাবু লিখেছেন ;—"দেশ ও কালের অনেকখানি ব্যবধান অতিক্রম করে অনেকের দৃষ্টি আমাদের মনকে অনুভূতির বিচিত্র লীলাছন্দে ও গীত সম্পদে সচল ও মুখর করে তোলে কি করে?···আজ পর্যন্ত সমস্ত মানুষের এক জায়গায় ঐক্য আছে। জৈব পদার্থে এভল্যুশনের ভিতর দিয়ে চেতনশীল মানুষ পর্যন্ত একটা বিষয়ে সকল জৈব পদার্থের ঐক্য আছে, সেটি হচ্ছে জীবন সংগ্রাম। মানুষের বেলায় জীবন সংগ্রামের রূপ আত্মপ্রকাশ করছে দুটি পরস্পব সংযুক্ত প্রণালীব মধ্য দিয়ে,—প্রথমে হচ্ছে বাহ্য প্রকৃতি থেকে আত্ম-রক্ষা—যার থেকে আসছে মানুষেব জ্ঞান-বিজ্ঞান এবং প্রকৃতির সৌন্দর্যও স্বীকাব এবং সামঞ্জস্য সম্বন্ধে স্পষ্ট ও অস্পষ্ট ইঙ্গিতগুলি; দ্বিতীয়টি হচ্ছে যৌন প্রণালী, যার থেকে আসছে সাহচয ও সন্তানসৃষ্টি। প্রথম ও দ্বিতীয় দুইটি প্রণালীই সাধারণভাবে আর্ট ও বিশেষ ভাবে সাহিত্যে স্থান পেয়েছে।"

এব পব বিজ্ঞান ও দর্শনেব ক্ষেত্র নির্দেশ করে তিনি লিখেছেন ;—"আর্টের পদ্ধতি হচ্ছে অন্তরাশ্রয়ী পদার্থকে বহিরাশ্রয়ী কবা। অনুভূতিকে বস্তু রূপ দেওয়া, যদিও সেই বস্তুরূপ বাইরের বস্তু থেকে অনেকটা ভিন্ন হয়ে যায়, অনেকটা মানবীয় সত্তা পায়,—তাই সাগর হয় মহান, আকাশ হয়েছে উদার, নির্ঝর হয়েছে গীতি-মুখর, বৈশাখের মধ্যাহ্ন পেয়েছে রুদ্রের ভ্রূকুটি।"

শ্রেণীবিভক্ত সমাজে আর্টেব বিকাশ বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি লিখেছেন ;—"চার্চ সংগীত ও ফিউডাল ব্যাবণের ক্যাস্‌ল-এ কাব্য-গল্প রচনা যখন আরম্ভ হল —তখন আর আর্ট জীবন যাত্রার প্রত্যক্ষ সংগ্রামে যুক্ত নয়। জীবনযাত্রার সংগ্রামের সঙ্গে যাদের রইল যোগ,—প্রকৃতির আলো, হাওয়া ও গন্ধের মধ্যে যারা মাটির বুকে সম্পদ সৃষ্টি করত, তাদের লাঙলটানা বলদ ও ঘোড়ার গাড়ীর প্রতি পায়ের ক্ষেপে তারা সৃষ্টি করেছে গান; যে জেলের দল ঝড়, জল, রৌদ্র বাতাসে এবং কালো আঁধারে নৌকায় পাড়ি দিত তারাও প্রকৃতির কল্যান ও রুদ্ররূপের

সম্মুখীন হয়ে গাথারূপী গান ও গাথা সৃষ্টি করেছে; সংসারের দুঃখে দুঃখী যে মায়ের দল, ছেলের কান্নাকে স্নেহের সুরে চাপা দিতে চেয়েছে তাদের কথাগুলো সারি বেঁধে হয়েছে ছড়া; গ্রামের অভ্যন্তরে পুরুষের পর পুরুষ যে জীবন চলে এসেছে সেখানকার সেই সাধারণ সুখও দুঃখ, ভালবাসা ও বিচ্ছেদের লক্ষ্য কাহিনী গ্রাম্য কথিকা ও গীতিকার মধ্য দিয়ে আমাদের কাছে এসে পৌঁচেছে। ধনীর ক্যাসেলে রচিত কাব্যের অলঙ্কার এতে নেই, চার্চ সংগীতের গাম্ভীর্যও এতে নেই, এতে আছে বয়ে যাওয়া জীবনের স্বতঃস্ফূর্ত্ত প্রকাশ, এর ভিতর মাটির গন্ধ পাওয়া যায়। আকাশের আলোর দিকে চেয়ে যেখানে মানুষের চেষ্টায় শতকোটি অঙ্কুর পৃথিবীর বুকে গজিয়ে উঠেছে, এরা তাদের সন্ধান দেয়।''

অপর দিকে দৈহিক শ্রমের ভিতর দিয়ে পৃথিবীর সঙ্গে প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ যাদের অস্পষ্ট ও আবৃত হ'ল তাদের জীবনের আকাশ কুসুমেব নেশাও সাহিত্যে আত্ম-প্রকাশ করল। ক্লাসিক্যাল যুগের রণনায়করা জীবনযাত্রার প্রত্যক্ষ সংগ্রাম থেকে খুব দূরে আসে নি, তাদের বীরত্ব গাথার মধ্যেও স্বাস্থ্য ছিল কিন্তু মধ্য যুগের ক্যাসেলের মধ্যেই স্বাস্থ্য নেই, বীরত্ব সেখানে দাসত্ব বরণ করেছে—তার সবচেয়ে বড় সফলতা হচ্ছে নারীর সৌন্দর্যের স্থূলতম প্রকাশের কাছে আত্মবিলোপ।

আর্টে বিজ্ঞানের ভিত্তি

ধনিক যুগের প্রথম দিকটায় তার যে প্রগতিকামী অভিযান ছিল – তার বর্ণনা করে তিনি লিখেছেন ;—"অভ্যুদয়শীল ধনিকের আত্মপ্রকাশের সে গতি আর নেই, যেমন ব্যবহারিক জীবনে তেমনি মনোজগতে তার প্রচণ্ড দুঃসাহসের জায়গায় এসেছে দুঃস্থ নৈরাশ্য।'' সমাজের মধ্যে আবার কিভাবে পরিবর্তনকামী ও পরিবর্তনবিরোধী শ্রেণী হয়েছে সে কথা উল্লেখ করে তিনি লিখেছেন যে, আর্টিষ্টের চেতনা তার সামাজিক ও প্রাকৃতিক আবেষ্টনী দ্বারা নির্ধারিত; সমাজের মধ্যে আবার সকলে তাব চেতনাকে সমান ভাবে উদ্দীপিত করে না। সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে যে সম্প্রদায়ের সঙ্গে জড়িত তার থেকে আসে তার চেতনার বেশীর ভাগ এবং তার থেকেই স্থির হয় তার মনোভাব···তাই আর্টিষ্ট সাম্প্র-দায়িকতা মুক্ত হতে পারে না। বর্তমান সমাজের অভিজাত মধ্যস্বত্বোপভোগীর দল অবসর-প্রমোদের আবিলতার মধ্যে নিমজ্জিত,—তাদের মনবৃত্তির একদিকে ফুটে উঠেছে উচ্ছৃঙ্খলতা, অপর দিকে নৈরাশ্য—যার থেকে আসছে অতীন্দ্রিয়বাদ, যোগসমাধি ও অলস কল্পনা।''

শিল্পীকে বিপ্লবী হতে হবে

আর্টিষ্টকে কি সমাজ-সংস্কারক বা বিপ্লবী হতে হবে? এই প্রশ্নের জবাবে তিনি লিখেছেন যে শিল্পীসমাজ থেকে পৃথক নন এবং প্রতিদিন নানাভাবে সমাজের নানা ঘাত-প্রতিঘাতের সঙ্গে জড়িত। তাছাড়া,—"যেমন বিপ্লবীর চোখে আর্টিষ্টের চোখেও যদি বর্তমান সমাজ তেমনি জরাগ্রস্ত, আপনার ভারে ন্যুব্জ-কব্জ বলে ধরা পড়ে তাহলে সে বর্তমান সংঘাতের মধ্যে সন্ধান পাবে নূতন সমাজের জন্মবেদনার,—স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্যে মণ্ডিত নূতন সমাজের প্রস্তুতি হিসাবে বর্তমান সমাজকে দেখতে পারলেই আর্টিষ্টের ব্যক্তি ও ঘটনাবলী সম্পর্কে ধারণা নূতন আলোয় উদ্ভাসিত হবে। তা না হয়ে যদি আর্টিষ্ট আভিজাত্যের দূষিত কল্পনার খোরাক যোগাতে থাকে, তাহলে বর্তমানে জরাগ্রস্ত কঙ্কালের রূপকে যত অলঙ্কার দিয়ে সাজাবার চেষ্টা হোক না কেন বৈরাগ্য ও স্থূলতার মধ্যে সেই জরা আত্মপ্রকাশ করবেই। বর্তমান পর্জোযাকালচারের "Heart-break House" এ যে উতরোল কান্নাররোল শোনা যাচ্ছে, মাত্র Snobbery-র আবরণ দিয়ে তাকে কে ঢাকবে?"

জনরুচির সঙ্গে আর্টের সম্পর্ক

বর্জনীয় আর্টকে বর্জন করবার জন্য কি পুলিশের লাঠি নিয়োগ করা সম্ভব হবে? এই প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেছেন, "ভবিষ্যৎ সমাজের জনরুচিই হবে বর্জনবিলাসিতা বর্জন করবার কর্তা, সেই জনরুচির বিরুদ্ধাচরণ করে কোনও আর্টবস্তু চলতে পারবে বলে মনে হয় না এবং যেহেতু আর্টের সত্য বিজ্ঞানের সত্যের মত ইতিহাস-নিরপেক্ষ নয় সেইজন্য অতীত ও বর্তমানের আদর পাওয়া অনেক কলাবিদও হয়ত পুরাতত্ত্বের মিউজিয়ামে স্থান পাবে। পরিবর্তনশীল সমাজের মধ্যে জনরুচিও পরিবর্তনশীল। তাই অনেক সময় জনরুচি পরিবর্তিত হবার আগেই প্রতিভাশালী দ্রষ্টা সেই পরিবর্তনের আভাস পেয়ে থাকেন এবং ভবিষ্যতে পরিবর্তিত জনরুচি তাঁকে মর্যাদা দেয়। আর্টিষ্টকে জনরুচির ক্রীতদাস হতে বলা নিশ্চয় অনুচিত, তাঁকে এইটুকু মাত্র বলা চলে যে, যে বাস্তব জীবনের পরিবর্তনশীল পরিপ্রেক্ষিতে জনরুচির পরিবর্তনের কারণ রয়েছে সেই বাস্তব-জীবনের গতি ও পরিণতি সম্পর্কে তিনি সচেতন হন। আর নিপীড়িত জনসাধারণের দিক থেকে আর্ট বর্জন করবার কথা যদি কখন শোনা যায়

তার কারণ বোধহয় এই যে, সবপ্রকার বিলাসিতার মত আর্টও ধনীর একচেটে।"

"Writer must not exist and write in order to make a living."—Marx. পাঁচুবাবুর এ প্রবন্ধের শেষ অনুচ্ছেদে মার্ক্সের এই উক্তিটি আমি যোগ করে দিতে চাই। বস্তুত তিনি এই ধরণের কথা বলেই প্রবন্ধ শেষ করেছেন। তিনি লিখেছেন যে আর্টিষ্টকে অস্বাস্থ্যকর বিকার থেকে মুক্ত হবার জন্য সাবধানে থাকা দরকার ও যেহেতু শিক্ষার সুবিধা বর্তমানে শ্রেণীগত, আর্টেরও সমজদার তাই বেশী শিক্ষিত শ্রেণীর মধ্যে থাকা সম্ভব। অথচ এই শ্রেণীর মধ্যে অবসরভোগী সম্প্রদায়ের জন্য সৃষ্ট আর্টে উক্ত সম্প্রদায়ের প্রতীক, গ্লানিপূর্ণ মনোবৃত্তি এবং জীবন যাত্রার সঙ্গে সম্পর্কহীন মানসিক বিকৃতির পরিচয় পাওয়া যায়। আর শিল্পীকে সেই রুচি মেটাতে গিয়ে নিজের রুচির বিকার ঘটে। তাই পাঁচুবাবু বীণার সঙ্গে গলা মিলিয়ে বলেছেন,—"আর্ট জীবন যাত্রার সঙ্গে সমান্তরালভাবে চলুক জীবনসংগ্রামের সঙ্গে আর্টেরও প্রত্যক্ষ সংযোগ হোক, আর্ট এর সাধনায় [illegible] থাকুক বেঁচে, পেশাদারী নষ্ট হোক।"

আমি যতদূর জানি সতেরো বছর আগে বাংলা ভাষায় সাহিত্যের উদ্দেশ্য ও কর্তব্য সম্পর্কে লেখা এই ধরণের মার্কসবাদ সম্মত প্রবন্ধ আর কেউ লেখেন নি। এবং আমি আগেই বলেছি প্রবন্ধটি জেল থেকে লেখা এবং জেলে সব রকমের পুঁথিপত্র পাওয়া মুস্কিল। পাঁচুবাবুর সঙ্গে আলাপ করে তাঁর সেই সময়কার সাহিত্যিক পুঁজি জানবার চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু তিনি নির্বাচনের কাজে এত ব্যস্ত যে আমি সময় করে তাঁর সুবিধামত সময়ে দেখা করতে পারিনি। তাই তাঁর প্রবন্ধের যে অংশে আমার খটকা লেগেছে সেই অংশ উদ্ধৃত করে এবং সে সম্পর্কে আমার আপত্তির বিষয় জানিয়ে এই প্রসঙ্গ শেষ করব।

অনুভূতি ও অবচেতনের ধাঁধা

মানুষের অনুভূতির উৎস সম্পর্কে [illegible] তিনি লিখেছেন: "মানুষের মন [illegible] যদি তাকে দুভাগে ভাগ [illegible] একটির নাম দেওয়া যায় চেতন, অপরটি অবচেতন। বাইরের সবকিছু [illegible], ঘটনার বৈচিত্র্য ও বহুলতা এই অবচেতন মনে ছাপ দেয়; মনের অচেতন অংশ থেকে সচেতন অংশে যখন বাইরের ছাপগুলি দেখা দেয় তখন [illegible], চেতনা মানে বাইরের ঘটনা বৈচিত্র্য

ও বহুলতার চেতনা। অবচেতন মন হচ্ছে একটা ভাণ্ডার বিশেষ, সেখানে সজ্জিত আছে লক্ষ দীপ। বাইরের একটা ইঙ্গিতে হয়ত এক সারি দীপ জলে ওঠে, অবচেতন মন চেতনার পর্দায় ফেলে ছবি, সেই ছবিগুলি অনেক সময় সচল, কখনও বা মুখর। কখনও বা তাদের নৃত্য-ছন্দে ও গীতি-কল্লোলে আমাদের মনে হয় যে যা দেখলাম, যা শুনলাম তা বুঝি সনাতন শাশ্বতের ইঙ্গিত, ভাবলোকে অনন্ত অস্তিত্বের ক্ষণিক আত্মপ্রকাশ করে ক্ষণিকত্বকে ছাপিয়ে উঠছে তাঁর ব্যঞ্জনা এবং যার ভিতর তার অমরত্বের ইঙ্গিত পাচ্ছে। বস্তুত জীবনের অন্তহীন সংগ্রামের মধ্যে প্রকৃতির যে-সব বস্তু ও শক্তি ইন্দ্রিয়ের দ্বার দিয়ে যত কিছু সংবাদ বয়ে নিয়ে এসেছে—আঘাতের ভিতর দিয়ে এবং বশ্যতার ভিতর দিয়ে—তাদেরই সাতরঙা ছবি, তাদেরই ছন্দবদ্ধতা, স্বরগ্রাম ও সুসমঞ্জস সৌকুমার্যে এবং তাদের অসামঞ্জস্য, বিকার ও বীভৎসতা মনের অবচেতন অংশে বাসা বেঁধেছে। যাকে শাশ্বত মনে হয় তা ক্ষণিকেরই আদর্শ রূপ। সামাজিক মানুষের জীবন সংগ্রামে আঘাতের ও প্রতিঘাতের বৈচিত্র্য ও বহুলতা অবচেতনের ভাণ্ডার বেশী করে পুষ্ট করে। এমন আর্ট তাকেই বলতে পারব যা চেতনার দিবালোকে সুস্পষ্ট নয়, যা প্রকাশ তার আবেদন, ইঙ্গিত ও ব্যঞ্জনার ভিতর দিয়ে অবচেতনাকে চেতনার স্তরে টেনে আনে তাকেই বলব আর্ট, তার সমঝদার তাকেই বলব যার অবচেতন মনের ভাণ্ডারে কলাশিল্পীর সৃষ্টির অনুরূপ ছবি আছে। সেইজন্য যে-সে আসল সমঝদার হতে পারে না, সমঝদারের চাই শিক্ষা এবং এইজন্যই কলাবিজ্ঞানের খাঁটি সমালোচক একাধারে সমঝদার ও সমালোচক দুই-ই।"

পাভলভ তত্ত্ব না ফ্রয়েড তত্ত্ব

এই উক্তির মধ্যে প্রথম খটকা লাগছে চেতনার সংজ্ঞা নিয়ে। যেমন পাঁচুবাবু বলেছেন: চেতনা মানে বাইরের ঘটনাবৈচিত্র্য ও বহুলতার চেতনা। আবার বলছেন: "মনের অবচেতন অংশ থেকে চেতন অংশে আসা কোন পদ্ধতির ওপর নির্ভর করে না।" দ্বিতীয়ত এই অবচেতন অংশ নিয়ে পাঁচুবাবুর আলোচনা খানিকটা ফ্রয়েডগন্ধী। অবচেতন ভাণ্ডারে লক্ষ দীপ আছে যা বাইরের আঘাতে জ্বলে উঠবে বা অবচেতন ভাণ্ডারে ছবির সঙ্গে বাইরের ছবি মিশানো হবে—প্রভৃতি কথা পাভলভ সম্মত বিজ্ঞানের কথা নয়। পাঁচুবাবু যে সময় এই প্রবন্ধ লিখেছেন তার সমসাময়িক বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে কথা উঠেছিল, বিশেষ করে সোভিয়েট ইউনিয়নের বাইরেই এই কথা ওঠে যে ফ্রয়েড ও

পাভলভের বক্তব্যের মধ্যে একটা যোগাযোগ আছে। সোভিয়েট ইউনিয়নে ১৯৫০ সালে একাডেমি অব সায়েন্সের অধিবেশনে এই কথা বলা হয়ঃ "At one time the opinion was expressed that attempt had been made here in the Soviet Union to combine Freudism with Pavlov's theory of the conditioned reflexes into a single system of "Reflexological Freudism." It must be said to the honour of our Soviet Physiology that there have been practically no attempts to create a "Reflexological Freudism". (Scientific session on the Physiological Teachings of Academician Pavlov. P. 68)

বাইরের ঘটনা মনের উপর ছবি তৈরী করে এবং তাই জমিয়ে অবচেতনার ভাণ্ডার বড় হয়—কথাটা এইভাবে পেড়ে পাঁচুবাবু মনকে প্রায় যন্ত্র করে ফেলেছেন, মন যে বাইরের এবং ভিতরের সংগ্রামের অংশীদার—সে পরিবর্তন করে এবং পরিবর্তিত হয়—তার অবচেতনের ভাণ্ডারের ছবিরও পরিবর্তন ঘটে, এই কথাটি পাঁচুবাবুর লেখায় বোঝা যায় না। যেমন তিনি বলেছেনঃ "বস্তুত কিন্তু জীবনের অন্তহীন সংগ্রামের মধ্যে প্রকৃতির যে সব বস্তু ও শক্তি ইন্দ্রিয়ের দ্বার দিয়ে যত কিছু সংবাদ বয়ে নিয়ে এসেছে—আঘাতের ভিতর দিয়ে এবং বঞ্চনার ভিতর দিয়ে—তাদেরই সাতরঙা ছবি···বিকার বিভৎসতা মনের অবচেতন অংশে বাসা বেঁধেছে।" এই ধরণের কথায় ফ্রয়েডীয় অবচেতনের (যা ১৯৩০—'৩৬ সালে প্রগতিশীল চিন্তাধারার মধ্যে প্রভাব বিস্তার করেছিল) গন্ধ পাওয়া যায়। পাভলভের—"a specific equlibrium between external environment and the internal process is established, organised by the cerebral cortex" এই ধারণার সঙ্গে মেলে না। এই গেল শরীরতত্ত্বের কথা।

তারপর পাঁচুবাবু বলেছেনঃ "আর্ট তাকেই বলতে পারবো যা চেতনার দিবালোকে সুস্পষ্ট নয়, যে প্রকাশ তার আবেদন, ইঙ্গিত ও ব্যঞ্জনার ভিতর দিয়ে অবচেতনকে চেতনার স্তরে টেনে আনে তাকেই বলব আর্ট, আর সমঝদার তাকেই বলব যার অবচেতন মনের ভাণ্ডারে কলা শিল্পীর সৃষ্টির অনুরূপ ছবি আছে। সেইজন্য যে-সে আসল সমঝদার হতে পারে না, সমঝদারের চাই শিক্ষা

এবং এই জন্যই কলা বিজ্ঞানের খাঁটি সমালোচক একাধারে সমঝদারও সমালোচক দুই-ই।" এই 'অবচেতনকে চেতনার দিবালোকে আনা' এবং সমঝদারের অবচেতন মনের ভাণ্ডারে কলা শিল্পীর সৃষ্টির অনুরূপ ছবির অস্তিত্ব থাকার মতবাদও বিতর্কমূলক। রাল্‌ফ্ ফক্সের এই বক্তব্যটি সে যুগে অনেক পরিষ্কার ছিল:

"Art is one of the means by which the writer grapples with and assimilates reality. On the forge of his own inner consciousness the writer takes the white hot metal of reality and hammers it out, refashions it to his own purpose, hits it out madly by the violences of thought." (The Novel and the people)

মার্কসীয় নন্দনতত্ত্বের গোড়ার কথা

সৌন্দর্য্যবোধের বিকাশ সম্পর্কে মার্কস্ যে কথা বলেছেন তার সঙ্গেও পাচুবাবুর উক্তি মেলে না। মার্কস্ বলছেন:

"Only through the objectively unfolding richness of the human being is the richness of subjective human conciousness, such as musical ear, an eye for the beauty of form, in short, senses capable of human enjoyment and which prove to be essentially human powers, partly developed and partly created. For not only the five senses but also the so called intellectual and practical senses (will, love etc.), in a word human senses and the humanity of senses, come to being as a result of the existence of man's object, as a result of humanised nature. The formation of the five senses is the work of the entire history of the world upto now. Senses limited by crudely practical needs have only a narrow meaning." এই প্রসঙ্গে মার্কস্ বলছেন মানুষ যাকে অখাদ্য বলে উপোসী মানুষের কাছে তাও খাদ্য হতে পারে। চিন্তাকাতর দরিদ্র মানুষ উৎকৃষ্ট নাটকের রস গ্রহণ করতে অক্ষম হতে পারে। তাই তিনি বলেছেন:

Hence the objectivization of human existence, both in a theoretical and practical way, means making man's senses human as well as creating human senses corresponding to the vast richness of human and natural life."

অবশ্য পাঁচুবাবু যে অবচেতনের কথা বলেছেন সে অবচেতন ফ্রয়েড প্রদর্শিত রোগগ্রস্ত কামনার কারাগার নয়, বরং মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির সংগ্রামলব্ধ জ্ঞান-বিজ্ঞানের অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার সে অবচেতন। কিন্তু তবু কথাগুলি এমন ভাবে বলা আছে যাতে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করতে পারে। তারপর তিনি খাঁটি সমঝদারের যে সংজ্ঞা দিয়েছেন তাতে সাধারণ মানুষের ভূমিকা অত্যন্ত নগণ্য হয়ে যায় এবং যে সব শিল্পবিলাসী শিল্পে দুর্বোধ্যতার পক্ষে সাফাই দিয়ে সাধারণ মানুষকে আগে পণ্ডিত হয়ে পরে শিল্পকলা বুঝতে নির্দেশ দেন তাদের যুক্তি সবল হবে। অবশ্য পাঁচুবাবুর সমস্ত প্রবন্ধ পড়লে সে রকম ভুল হওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম। দ্বিতীয়ত পাঁচুবাবুর এই ত্রুটিগুলি ১৯৩৫-'৩৮ সালের বহু বিপ্লবী শিল্প-রসিকদের ত্রুটি বলে আজ আলোচনা চলছে। কডওয়েল নিয়ে সম্প্রতি মডার্ণ কোয়ার্টার্লিতে যে সমালোচনামূলক প্রবন্ধ বেরিয়েছে তার থেকে আমি এই উক্তি করছি। বৃটেনের বহু নামজাদা মার্কসবাদী আজ কডয়েলের মধ্যে ভাববাদী বিচ্যুতি লক্ষ্য করেছেন।

মডার্ণ কোয়ার্টার্লিতে কডওয়েলের উপর যে আলোচনা চলছে তাতে যোগদান করেছেন মরিস্ কর্ণফোর্থ, জর্জ টমসন, জে. ডি. বার্ণাল প্রভৃতি বৃটেনের বড় বড় মার্কসবাদী পণ্ডিতরা। কর্ণফোর্থ ও বার্ণাল, কডওয়েলের নীতি কতকাংশে ভাববাদী বলে দৃঢ়মত প্রকাশ করেছেন। তাঁরা এই সম্পর্কে যে সব কথা বলেছেন—তার ২।৪টি উক্তি তুলে দিই। কারণ কডওয়েলের প্রভাব শুধু বাংলার পাঁচুবাবুর উপর নয়, পৃথিবীর আরো অনেকের উপর (আমাদের সকলেরই উপর) প্রভাব বিস্তার করেছে এবং বার্ণালের ভাষায় "কডওয়েল শত শত লোককে মার্কসবাদী নীতির সঙ্গে পরিচয় ঘটান।" তবু বার্ণাল বলছেন:
"There is only too ample evidence of truth of Cornforth's thesis that their (works of Caudwell) formulations are those of contemporary bourgeois-scientific philosophy, Einsteinian-Morganist-Freudian and not those of Marxism.

বার্ণাল আরো বলেছেন যে কডওয়েল তাঁর Illusion and Reality বইতে genotype and its unconscious drives-কে মূল চালকশক্তি করেই ভুল করেছেন। কর্ণফোর্থ বলেছেন: Closely connected with Caudwell's Freudism is his conception of "two worlds" of the inner as contrasted with the outer world and of "inner energy." এই ধারণার ফলে গানের সম্পর্কে Phycho-analytic theory of latent and manifest content এসেছে এবং কবিতা সম্পর্কে Depth psychology-র কথা উঠেছে। আপাতত কডওয়েল প্রসঙ্গ এখানেই শেষ করা যাক। বিনয় ঘোষের "শিল্প সংস্কৃতি ও সমাজ" বইখানি আলোচনা প্রসঙ্গে আবার কডওয়েল নিয়ে বিতর্কের কথা পাড়তে হবে বিলেতে এই নিয়ে মার্কসবাদী সংস্কৃতি মহল বেশ গরম কিন্তু আমাদের দেশে তার ধাক্কা কেন লাগলো না বুঝি না। রোগ চাপা চাপা দিয়ে রাখা আমাদের অভ্যাস বলে কি?

নিখিল ভারত প্রগতি লেখক সংঘের মুখপত্র

এবারে নিখিল ভারত প্রগতি লেখক সংঘের মুখপত্র 'নিউ ইণ্ডিয়ান লিটারেচার'-এর প্রসঙ্গে আসা যাক। এটি প্রকাশিত হয় ১৯৩৯ সালে এবং এই সংখ্যায় যে সমস্ত রচনা আছে তার মধ্যে কলকাতায় অনুষ্ঠিত উক্ত সংঘের দ্বিতীয় সম্মেলনে প্রদত্ত মুল্‌করাজ আনন্দ ও সুধীন্দ্রনাথ দত্তের বক্তৃতা ছাপা হয়েছে। এছাড়া প্রেমচন্দের 'কাফন' গল্প, আব্দুল আলিমের লেখা 'হিন্দুস্থানী'র সমস্যা, অধ্যাপক ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের "সমসাময়িক ভারতীয় চিত্রকলার সামাজিক পটভূমি" এবং বিভিন্ন পুস্তক সমালোচনার মধ্যে সমালোচনা করেছেন পণ্ডিত নেহেরু; আলি সর্দার জাফ্‌রী, লিওনার্ড শিফ্, জ্ঞানচাঁদ, সাজ্জাদ জহীর, মুল্‌করাজ আনন্দ প্রমুখ। তারপর নিখিল ভারত সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাবাবলী ও সংঘের গঠনতন্ত্র ও ঘোষণা প্রভৃতি আছে। এই পত্রিকার আর একটি সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছিল কিন্তু সে সংখ্যা আমার কাছে নেই। তাই এই সংখ্যার প্রবন্ধের সাহায্যে নিখিল ভারত সম্মেলন পর্ব শেষ করার আগে সর্দার জাফরী এবং সাজ্জাদ জহীরের মত খ্যাতনামা কমিউনিষ্ট নেতাদের সাংস্কৃতিক দৃষ্টিভঙ্গীর যে পরিচয় এই পত্রিকা মারফৎ পেয়েছি—তা আমাদের পাঠকদের জানাতে চাই। কারণ উক্ত সম্মেলনের আলোচনা শেষ করার পর আর নিখিল ভারতীয় নেতাদের প্রসঙ্গে আসা যাবে না।

সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে সাজ্জাদ জহীর

প্রথমে সাজ্জাদ জহীরের প্রবন্ধ নিয়ে শুরু করা যাক। উর্দু কবি মজাজ, আম্‌বাল্‌ভি ও সৈয়দ মুত্তাল্‌বীর কবিতা-গ্রন্থ প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন যে এঁরা স্বাধীনতাকামী ও বিপ্লবপন্থী কবি এবং এঁরা মানেন যে শ্রমিক ও কৃষক আমাদের দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে অগ্রণী হবে। এঁরা মানেন যে ধনতন্ত্র সকল বিপত্তির কারণ। তাই কবিতার মারফৎ কঠিন ধাক্কা দিয়ে এঁরা জনসাধারণকে জাগাতে চান। শত্রুর বিরুদ্ধে এঁরা এত কঠোর হতে চান যে মাঝে মাঝে এঁরা ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেন। সমগ্রভাবে দেখলে এঁদের বিপ্লব সম্বন্ধে ধারণা বড় বেশী সরল এবং অসম্পূর্ণ। এঁদের যুদ্ধ ঘোষণা এবং গালাগালির বহর অনেক সময় উল্টো ফল ফলাতে পারে।

এ সবের কারণ হচ্ছে আমাদের দেশের মধ্যবিত্তরা বিপ্লবী আন্দোলনে আসে—নিজেরা নিষ্পেষিত বলে এবং মানবতাবোধে উদ্বুদ্ধ বলে। কিন্তু প্রকৃত ঘটনা সম্পর্কে এঁদের জ্ঞান কম বলে এঁরা বিপ্লবে 'ঝাঁপ' দিতে চান এবং ঝাঁপ দিতে গেলেও যে কিছুকাল দৌড়াতে হয় এ বোধ তাঁদের নেই। এঁদের সঙ্গে জনসাধারণের সম্পর্ক নেই বলে—এঁরা সব জিনিস রোমান্টিক দৃষ্টিতে দেখেন এবং রচনায় ভাবালুতার বন্যা বহান। এই ধরণের দৃষ্টিভঙ্গী সাহিত্য এবং রাজনীতিতে সন্ত্রাসবাদ সৃষ্টির সহায়ক। কবি বা লেখক যদি সামাজিক অবস্থা সচেতনভাবে বুঝে বৈপ্লবিক পথে অগ্রসর না হন—তাহলে তার শিল্প সকল মহৎ শিল্পের ভিত্তি বাস্তবতাকে ফুটিয়ে তুলতে পারবে না। তাই লেখকদের গণ-আন্দোলনের অংশীদার হওয়া দরকার—কেবল তা হলেই ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা জন্মাবে এবং চিত্র বাস্তব হবে। কেবল মাত্র এই পথে লেখক বাস্তবধর্মী হতে পারেন। সুখের বিষয় যে পূর্বোক্ত কবিদের মধ্যে কেউ কেউ এই সব বুঝতে পারছেন। বর্তমানে তাঁদের রচনায় যা পাওয়া যাচ্ছে তা হল কেবল তাঁদের গভীর মানবপ্রীতি এবং পলায়নীবৃত্তির বিরোধিতা। এঁরা যতই সমাজ পরিবর্তন ও বৈপ্লবিক কাজে-কর্মে অভিজ্ঞ হবেন ততই শিল্পের মূলনীতিগুলিই এঁদের করায়ত্ত হবে।

সাজ্জাদ জহীরের এই প্রবন্ধ ছোট এবং আমি প্রায় সবই সংক্ষেপ করে দিয়েছি। এই প্রবন্ধ সম্পর্কে কোন মন্তব্য দরকার আছে বলে মনে করি না। অল্প কথায় তিনি লেখকদের যে পরিমাণ প্রশংসা করেছেন—তার থেকে অনেক

-বেশী গঠন মূলক সমালোচনা করেছেন—এবং সেখানে কোনরূপ গোঁজামিলের প্রশ্রয় দেন নি।

ইকবালের ফ্যাসিজম প্রীতি

আলি সর্দার জাফরী কবি ইকবাল সম্পর্কে কয়েকখানি বই-এর সমালোচনা প্রসঙ্গে ইক্‌বালের কবিজীবনের শেষ অধ্যায়ে প্রতিক্রিয়াশীল অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে তাঁর ফ্যাসিজমপ্রীতির কথা উল্লেখ করেছেন। এই প্রবন্ধ আমার আলোচনার পক্ষে বিশেষ জরুরী নয়—কিন্তু সংস্কৃতি আন্দোলনে যাঁরা নবাগত—এমন কি যাঁরা ১৯৪২ সালের পরে ইক্‌বালের জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে নানা মনোমুগ্ধকর প্রবন্ধ কমিউনিষ্ট কাগজপত্রে পড়েছিলেন—তারা এই প্রবন্ধ পড়লে অবাক হবেন আর ভাববেন যে জাফরীর মত বিপ্লবী ও মার্কসবাদী মুসলমানকে ইকবালের জাতীয়তাবাদ মানাতে এবং লীগকে তুষ্ট করার জন্য মুসলিম জাতির আত্মনিয়ন্ত্রাণাধিকার স্বীকার করাতে পি.সি. জোশীকে কত বেগ পেতে হয়েছিল। আমার প্রবন্ধের অকমিউনিষ্ট পাঠকদের এই প্রসঙ্গে একটা খবর জানিয়ে দিতে পারি যে কংগ্রেস-লীগ ঐক্যের জন্য লীগকে রাজী করানোর কাজে জোশীবাদী নেতৃত্ব যখন লীগের মধ্যকার দেশপ্রেমিকতাকে বড় করে তুলতে লাগেন এবং শেষ পর্যন্ত মুসলিম জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার মানতে শুরু করলেন—তখন তার বিরুদ্ধে সব থেকে প্রথম প্রবল প্রতিরোধ সৃষ্টি করেছিলেন কমিউনিষ্ট পার্টির মুসলিম সভ্যরা। যাক সে প্রসঙ্গ। আপাতত জাফরীর প্রবন্ধে ফিরে আসা যাক। সর্দার জাফরী বলেছেন যে মুসলমানদের স্তিমিত গৌরবের মধ্যে ইক্‌বালের উত্থান। ভারত, আফগানিস্তান, ইরাণ এবং তুরস্কে খিলাফতের পতন ইক্‌বালকে প্রবুদ্ধ করে। ইসলামের সংস্কৃতির নবজাগরণের জন্য তিনি ইসলামের গৌরব প্রচার করতে থাকেন। এর জন্য তিনি হিংসা প্রচার করতে থাকেন। অবশ্য তার প্রতীক হচ্ছে ঈগল। তাঁর জীবনের প্রথম দিককার জাতীয়তাবাদ প্যান-ইসলামবাদে পরিণত হয়। তিনি ধনতন্ত্রবাদের যে সমালোচনা করেছেন তা ঐ ইসলামের আদর্শের সঙ্গে তুলনা ক'রে। তিনি নিট্‌সে, সরেল এবং বের্গস-এর দর্শন থেকে নিজের মতবাদ পুষ্ট করতে থাকেন। মুসোলিনীর মত ইকবালের কাছেও যুদ্ধ প্রয়োজনীয় বলে মনে হয়। বস্তুত মুসোলিনীর রোম অভিযানের পর ইকবাল তাঁর প্রতি সশ্রদ্ধ হয়েছিলেন। এই প্রসঙ্গে সর্দার জাফরী মুসোলিনী

জাপানের প্রধান মন্ত্রী ও হিটলারের উক্তি উদ্ধৃত করে দেখান ফ্যাশিষ্ট শক্তি কিভাবে মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলগুলিকে সাম্যবাদ রোখার প্রাচীর বানাতে চাইছে। সর্দার জাফরী আরো জানান যে আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় নাজী মতবাদ প্রচারের একটি আড্ডা হয়েছিল। ইকবাল মুসোলিনীকে প্রশংসা-সূচক একটি বাণী পাঠিয়েছিলেন এবং লাহোরের "ইকবাল দিবসে" ইতালির কনসাল মারফৎ অনুরূপ একটি বাণী মুসোলিনীর কাছ থেকে আসে। সর্দার জাফরী বলছেন যে ইকবালের এবং তাঁর কবিতা আলোচনা করতে গেলে এই সব বিষয় মনে রাখা দরকার। তিনি আরো বলেছেন যে ভারতে অবশ্য ফ্যাসি-জমের অর্থনৈতিক মূল নেই তবু ইউরোপে তাদের সাফল্যের ফলে বিভিন্ন দেশের অসন্তুষ্ট লোকেরা ডিক্টেটরদের পক্ষে যাচ্ছে, এটা লক্ষ্য করা দরকার।

সর্দার জাফরীর এই শেষ লাইনটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। যুদ্ধ বাধার পর এবং জার্মান, ইতালি ও জাপানের কাছে ইংরাজ প্রভৃতিদের পরাজয়ে প্রথম দিকটা হিটলার-প্রীতি এদেশে কি পরিমানে বেড়েছিল তা সকলের মনে আছে।

১৯৩৮ সালের ২৪শে ও ২৫শে ডিসেম্বর আশুতোষ মেমোরিয়াল হলে নিখিল ভারত প্রগতি লেখক সংঘের দ্বিতীয় সম্মেলন হয়। সম্মেলনে রবীন্দ্রনাথ একটি ভাষণ পাঠান। তাতে তিনি কামাল পাশার মৃত্যুতে দুঃখ প্রকাশ করেন এবং জানান যে কামালের সাফল্য সমগ্র এশিয়ার জয়ের সূচনা। প্রাচ্য সংস্কৃতির অবনতির কারণ দেখাতে গিয়ে তিনি বলেন যে অতীতের প্রতি মোহ আমাদের সীমাহীন দুঃখ ও অপমানের পঙ্কে নিমজ্জিত করেছে এবং কালক্রমে পাশ্চাত্যের প্রভাব আমাদের নিজস্ব সভ্যতাকে ধ্বংস করেছে, আমাদের যে সংস্কৃতি দূর দূরান্তের গ্রামে বিস্তার লাভ করেছিল তার মূলোচ্ছেদ করেছে। বিদেশী শিক্ষকদের পদতলে বসে আমাদের ক্রমেই বিশ্বাস জন্মেছে যে আমাদের অক্ষমতা ও অজ্ঞতা জন্মগত, এবং মূর্খতার শিকল গলায় পরাই আমাদের কপালের লিখন।

এই সম্মেলনের অভ্যর্থনাসমিতির সভাপতি হিসাবে ডঃ নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত একটি ভাষণে বলেন যে প্রগতি বলতে তিনি স্বাধীনতা সম্ভোগের ব্যাপক অধিকার মনে করেন। সভ্যতার ইতিহাস স্বাধীনতা বৃদ্ধির ইতিহাস। এই স্বাধীনতা ফ্যাসিজমের হাতে কিভাবে বিপদগ্রস্ত হচ্ছে সে কথা বলে তিনি ফ্যাসিজমের বিরুদ্ধে মানবতার সমস্ত শক্তি সমাবেশ করতে বলেন।

সম্মেলনের সভাপতিমণ্ডলীতে ডঃ মুল্‌করাজ আনন্দ, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, বুদ্ধদেব বসু, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় এবং পণ্ডিত সুদর্শন ছিলেন।

সম্মেলনের বক্তৃতা, বিশেষ করে সভাপতিমণ্ডলীর সভ্যদের বক্তৃতা আলোচনা করার আগে সম্মেলনে প্রস্তাবাবলীর সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিই। সম্মেলনের প্রথম প্রস্তাবে বলা হয়েছিল যে বিদেশী সাম্রাজ্যবাদের অধীনে থাকাকালীন ভারতে পরিপূর্ণ সাংস্কৃতিক বিকাশ সম্ভব নয়। যেহেতু বৃটিশ শোষণের জন্য, বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের সুপরিকল্পিত দমন নীতি এবং অবহেলার জন্য ভারতের জনসাধারণের বিরাট অংশের নিরক্ষরতা, শিল্পকলায় অবনতি, অন্য দেশের তুলনায় ভারতীয় সাহিত্যের অনুন্নত অবস্থা, সেহেতু এই সম্মেলন ঘোষণা করছে যে যারা সংস্কৃতিকে ভালবাসেন তাঁদের পবিত্র কর্তব্য হচ্ছে যে সব শক্তি এই দেশের জাতীয় মুক্তির জন্য চেষ্টা করছে তাদের পক্ষ গ্রহণ করা এবং সাহিত্যের মারফতে, নৈতিক ও বাস্তব সাহায্যের দ্বারা ভারতীয় জনগণের স্বাধীনতা সংগ্রামকে পুষ্ট করা। দ্বিতীয় প্রস্তাবে বলা হয়েছিল যে দুনিয়ার অন্যত্র যেসব শিল্পী ও লেখক প্রতিক্রিয়া, ফ্যাসিজম ও সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করছে, বিশেষত জার্মানী, স্পেন ও চীনদেশের যেসব ব্যক্তি ও সংগঠন এই সংগ্রামে দুঃখ ভোগ করছে তাদের এই সম্মেলন অভিনন্দন জানাচ্ছে। এই সম্মেলনের মতে সাহিত্য ও শিল্প সমস্ত মানবতার সম্পত্তি এবং একে সম্প্রদায়, জাতি বা ভৌগোলিক সীমানায় বিভক্ত করা যায় না। সমতা, স্বাধীনতা ও শান্তির ভিত্তিতে যারা দুনিয়াব্যাপী নতুন সমাজব্যবস্থা গড়ার চেষ্টা নানা প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও করছে, ভারতের প্রগতিশীল লেখকরা তাদের দলে—এবং সংস্কৃতির শত্রু ফ্যাসিজম ও জঙ্গীবাদের বিপক্ষে। এই সম্মেলন আন্তর্জাতিক শান্তি রক্ষার শক্তিকে সাহায্য করবে এবং যে সকল জাতীয় আশাআকাঙ্ক্ষার সাফল্য এই শক্তির পক্ষে অনুকূল তাদের সমর্থন করবে।

তৃতীয় প্রস্তাবে কংগ্রেস মন্ত্রীসভা কতৃক ব্যক্তি-স্বাধীনতা প্রসারের চেষ্টাকে অভিনন্দন জানিয়ে বলা হয় যে কোন কোন প্রদেশে ও দেশীয় রাজ্যে বক্তৃতার স্বাধীনতা নেই এবং ভারত সরকার নানারকম বিধিনিষেধ দিয়ে বিদেশ থেকে প্রগতিসাহিত্য আসার পথ রুদ্ধ করছে। এর বিরুদ্ধে আন্দোলন করার আহ্বান জানানো হয়। চতুর্থ প্রস্তাবে প্রাদেশিক সরকার কর্তৃক শিক্ষা ব্যবস্থায় পরিবর্তন এবং নিরক্ষরতা দূর করার চেষ্টাকে অভিনন্দন জানিয়ে বলা

হয় যে সংস্কৃতি বিষয়ক শিক্ষাকে আত্মনির্ভরশীল ব্যবস্থার হাতে ছেড়ে দেওয়া যেতে পারে না। শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে সাম্প্রদায়িকতা এবং প্রতিক্রিয়াশীল আদর্শ প্রয়োগের বিরুদ্ধে প্রাদেশিক সরকারগুলিকে অবহিত থাকতে বলা হয়। স্কুল ও কলেজে প্রগতিশীল পাঠ্যপুস্তক প্রচলনের জন্য যোগ্য ব্যক্তিদের উপর নির্ভর করতে সরকারকে বলা হয়। সারা ভারতের সমস্ত প্রাইমারী স্কুলে হিন্দুস্থানী ভাষা শিক্ষা প্রবর্তনের দাবীকে সমর্থন জানিয়ে এই পরিকল্পনা কার্যকরী করার জন্য যোগ্য কমিটি গঠনের ব্যাপারে জাতীয় কংগ্রেসকে অনুরোধ জানানো হয়।

এই সম্মেলনে অধ্যাপক হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় "সংস্কৃতির সংকট" সম্পর্কে বক্তৃতা করেন। ফ্যাসিজমের দ্বারা সংস্কৃতি কিভাবে বিপন্ন হচ্ছে—তিনি তার বর্ণনা করে বলেন যে সকল শিল্পী ও লেখক, শ্রমিক ও কৃষকের পক্ষে—তারা অনিবার্য সংগ্রামে তাদের শিল্পকলাকে অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করার অত্যাবশ্যক প্রয়োজনীয়তা অনুভব করবেন। পাঞ্জাবের নবেন্দ্রনাথ "সাহিত্য ও মার্ক্স-বাদ" নামে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। বলরাজ সাহনী (তখন তিনি শান্তিনিকেতনে ছিলেন), আলি সদার জাফরী (লক্ষ্ণৌ থেকে) এবং অক্ষের সুন্দর শর্মা বিভিন্ন প্রদেশের সাহিত্যের উপর আলোচনা করেন। তৃতীয় অধিবেশনে বুদ্ধদেব বসু "আধুনিক বাংলা সাহিত্য", সাজ্জাদ জহীর "সাম্প্রতিক বৈপ্লবিক উর্দু কবিতা", ডঃ আবদুল আলিম "হিন্দুস্থানীর সমস্যা", আমেদ আলি "গ্রামের কবি ও ভারতীয় বিপ্লব" এবং সমর সেন "ক্ষয়িষ্ণুদের স্বপক্ষে" প্রবন্ধ পাঠ করেন।

সভাপতিমণ্ডলীর সদস্যদের বক্তৃতা এবং পূর্বোক্ত প্রবন্ধগুলির যতগুলি যোগাড় করতে পেরেছি—তার থেকে কিছু কিছু উদ্ধৃত করার প্রয়োজন আছে। কারণ যে সব প্রস্তাব নেওয়া হয়েছিল সেগুলি সম্পর্কে কোন রকম বিতণ্ডা হয় নি বা উক্ত প্রস্তাবের ভিত্তিতে কোন সাংগঠনিক সিদ্ধান্তও নেওয়া হয়নি। কিন্তু এই সম্মেলনের মারফৎ বাংলাদেশে এক ধরনের সাহিত্যিক মতাদর্শ ব্যক্ত হয়েছিল—তা শত্রু-মিত্র সকলের কাছেই নানাধরনের প্রশ্ন উত্থাপন করেছিল। প্রশ্নগুলির গুরুত্ব বেশী করে দেখা দেয় এই কারণে যে ওয়াকিবহাল মহল জানতে পারছিল যে এ যাবৎ যত সাহিত্য সম্মেলন হয়েছে—তার সঙ্গে এই সম্মেলনের মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। সে পার্থক্য হচ্ছে এই যে এই সম্মেলন এবং সম্মেলনের

উদ্যোক্তারা প্রথম থেকেই জাতীয় মুক্তি আন্দোলনকে সব কিছুর উপরে স্থাপন করেছে এবং সেই আন্দোলনকে সাহায্য করা শিল্পী ও সাহিত্যিকদের পবিত্র কর্তব্য বলে ঘোষণা করছে এদেশের জনসাধারণের নিরক্ষরতা, শিল্পকলার ধ্বংস, সাহিত্যের অনুন্নত অবস্থা প্রভৃতির জন্য মূলত বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদকে দায়ী করে এই সম্মেলন বাংলায় সাহিত্য ক্ষেত্রে সর্বপ্রথম সাহিত্যের উন্নতি বৃদ্ধি বিচারের নূতন মানদণ্ড স্থাপন করেছে ; সাহিত্যের উন্নতির জন্য "সৃজনশীল একক প্রতিভার আকস্মিক অভ্যুদয়ের" উপর নির্ভর না করে সাহিত্যিক ও সাহিত্য-রসিক জনসাধারণের সমবেত চেষ্টার উপর জোর দিয়েছে এবং দেশে ও বিদেশে সাহিত্যিকরা কোন্ পক্ষ অবলম্বন করবে—তারও একটা নির্দেশ দিয়েছে। শিল্পরস এবং শিল্প রসিকদের মধ্যে আলোচনা সীমাবদ্ধ না রেখে নিজ দেশের সামাজিক অবস্থা, অর্থনৈতিক অবস্থা, সাংস্কৃতিক অবস্থা এবং এই সব অবস্থার সঙ্গে আন্তর্জাতিক ঘটনার যোগাযোগ ও প্রভাব বিচার করে সাহিত্যিক ও শিল্পকলাকে জীবনের এমন একটা ব্যাপক ক্ষেত্রে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে যার সঙ্গে আগেকার কোন চেষ্টার তুলনা মেলে না।

অবশ্য অবস্থা অত্যন্ত সময়োপযোগী ছিল। দেশে জাতীয় মুক্তি আন্দোলন তখন আবার বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে সংগ্রামের আগ্রহে চঞ্চল। এই সম্মেলন ঐতিহাসিক ত্রিপুরী কংগ্রেসের চার মাস আগে হয়। এ দেশে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ পূর্ণ স্বাধীনতায় পরিবর্তে ফেডারেশন চাপাবার প্রস্তাব করছে এবং বিদেশে মিউনিক প্যাক্ট মারফৎ হিটলারকে দিয়ে চেকোশ্লোভাকিয়া অধিকার ও সোভিয়েত আক্রমণের পথ পরিষ্কার করছে। যুদ্ধ আসন্ন এবং এই যুদ্ধে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ নিজ সাম্রাজ্য রক্ষার খাতিরে হিটলারের পথ প্রশস্ত করছে দেখে ভারতের জনসাধারণ ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিল এবং বৃটিশ সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে সংগ্রাম দাবী করছিল। কংগ্রেসের দক্ষিণপন্থীরা ফেডারেশন গ্রহণে ভিতরে ভিতরে রাজী থাকলেও জনমতের অভিব্যক্তি দেখে (পরে গান্ধীজী সমর্থিত প্রার্থীর বিরুদ্ধে সুভাষচন্দ্রের সভাপতি পুনঃ নির্বাচনে) এই সময় থেকেই নিজেদের অভিসন্ধি গোপন রাখার জন্য নানারূপ ছলচাতুরী গ্রহণ করতে থাকে। কাজেই এই সময়ে কোন সাহিত্য সম্মেলনে পূর্বোক্ত ধরণের প্রস্তাব গ্রহণ করা সময়োপযোগী এবং অপেক্ষাকৃত সুবিধাজনক ছিল। কারণ এর বিরুদ্ধে যাওয়ার অর্থ ছিল—জাতীয়অভিব্যক্তির ও জাতীয় আশা-আকাঙ্ক্ষার বিরুদ্ধে যাওয়া। 'ষ্টেট্সম্যান' অবশ্য প্রকাশ্য বিরোধিতা করেছিল—কিন্তু তখনকার দিনে কোন

সম্মেলনে কমিউনিষ্টরা আছে বলে গালাগালি দেওয়াতে সাম্রাজ্যবাদী কৌশলের ব্যর্থতাই প্রকাশ পেয়েছিল—কারণ সাম্রাজ্যবাদী ও দক্ষিণপন্থীদের অনিচ্ছা-সত্ত্বেও কংগ্রেসের মধ্যে কমিউনিষ্টদের সঙ্গে কাজ করার প্রয়োজনীয়তা জাতীয় আন্দোলন সাধারণভাবে মেনে নিয়েছিল। তাই এই সম্মেলনের প্রতি যাদের যথেষ্ঠ উৎসাহ জাগ্রত হয়নি বা যারা মনে মনে বিরূপ ছিলেন—তারা এই সম্মেলনে সাহিত্যের, বিশেষ করে বাংলা সাহিত্যের নিজস্ব সমস্যা সম্পর্কে কি ধরনের আলোচনা হয় তার উপর লক্ষ্য রাখছিলেন। 'শনিবারের চিঠি' পত্রিকা এই সম্মেলনের আগের মাসের সংখ্যায় ঠিক এই ধরণের মন্তব্য করে। অমৃতবাজার পত্রিকা এই সম্মেলন প্রসঙ্গে ফ্যাসিজম ও সাম্রাজ্যবাদকে আক্রমণ করে। সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার এই সম্মেলনের অন্যতম উদ্যোক্তা ছিলেন এবং তিনি তখন আনন্দবাজার পত্রিকার সম্পাদক—কাজেই আনন্দবাজার পত্রিকা এই সম্মেলনের পক্ষে যথেষ্ট প্রচার করে।

কাজেই এই সম্মেলনে সাহিত্য ও শিল্প সম্পর্কে যে সকল বিশেষ আলোচনা হয়েছিল এবং সেই আলোচনায় যে সকল অংশ আমি যোগাড় করতে পেরেছি তার থেকে কিছু উদ্ধৃত করব। প্রথমেই সভাপতিপরিষদের অন্যতম সদস্য ডঃ মুল্‌করাজ আনন্দ প্রগতি লেখক আন্দোলনের জন্ম, উন্নতি বৃদ্ধি সম্পর্কে বলেন। তিনি জানান যে ১৯৩৫ সালের নভেম্বরে লণ্ডনের ডেনমার্ক ষ্ট্রীটের নানকিং রেস্তোঁরায় প্রথম ইস্তাহার পড়া হয়। এর পিছনে ছিল ১৯৩১ সালের ধনতান্ত্রিক সংকট এবং ভারতে আমাদের অশেষ দুঃখভোগ এবং নানা ধরনের হতাশা। দেশে ও বিদেশে এই ধরনের সংগঠনের প্রয়োজনীয়তাও অনেকে বোধ করছিলেন। ফলে লণ্ডনের ছোট ছোট বৈঠকে গৃহীত ঘোষণা পত্র ১৯৩৬ সালের লক্ষ্ণৌ সম্মেলনে ভারতের নাম করা লেখকদের একত্র করতে পেরেছে এবং দুনিয়াব্যাপী সংস্কৃতি রক্ষার ফ্রন্টে ভারতের বাহিনী সংখ্যার দিক থেকে অন্যতম বৃহৎ দল।

তিনি বলেছেন যে 'অনেকে মনে করেন' এই সংঘ এমন একটি নতুন দল বা গোষ্ঠী যারা সাহিত্যকে বাঁধাধরা নিয়মে বাঁধতে চাইছেন বা গোষ্ঠী আধিপত্য সৃষ্টি করতে চাইছেন। বস্তুত গোড়াতে আমরা লেখক ও পাঠকদের একটি গোষ্ঠী তৈরী করেছিলাম যেখানে আমাদের পৃথক ব্যক্তিত্ব নিয়েও আমরা সমআদর্শে পৌঁছাতে চেষ্টা করেছি। সংঘের পাঠক সভ্যরা

অবশ্য প্রশ্ন করেন "প্রগতি সাহিত্য কাকে বলে?" এই প্রসঙ্গে তিনি ইংলণ্ডের বার্নার্ড শ, ওয়েলস্ এবং গলসওয়ার্দির উদারনৈতিক প্রভাবের ফল ইংলণ্ডের সমাজে যে কিভাবে ফলেছে তার উল্লেখ করে বলেন ভারতে বুদ্ধিজীবিরা ছাড়াও বহুলোক এই ধরনের সংগঠন—ইউনাইটেড কালচারাল ফ্রন্টের প্রয়োজনীয়তা বোধ করেছেন বলে সংগঠন এত দ্রুত তাৎপর্যপূর্ণ এবং প্রাণবন্ত হয়েছে। এর পিছনে রয়েছে গত পঁচিশ বছরের ভারতে রাজনৈতিক ও সামাজিক দুরবস্থা যার মধ্যে থেকে একদল শ্রেণীচ্যুত বুদ্ধিজীবি বার হয়েছেন যারা সংস্কৃতি সংকটের রূপ দেখে মনে করেছেন—সংস্কৃতির শ্রীবৃদ্ধি করতে হলে জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের অংশীদার হওয়া দরকার। এই সমস্ত বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রেখে প্রগতি লেখক সংঘের উদ্দেশ্য কি বোঝাবার জন্য একটি ইস্তাহার প্রকাশিত হয় এবং এখনো পর্যন্ত সেই ইস্তাহারই এই সংঘের পক্ষে সবচেয়ে সুস্পষ্ট বিবৃতি।

গত দুই বছর সাহিত্যক্ষেত্রে যে সব সৃষ্টি হয়েছে তার থেকে বোঝা যাবে এই ইস্তাহারের সারমর্ম সাহিত্যিকরা কতখানি হৃদয়ঙ্গম করেছেন। এই প্রসঙ্গে ডঃ আনন্দ বাংলা ও হিন্দুস্থানী সাহিত্যের সম্পর্কে কিছু বলেন। বাংলা সাহিত্যে নতুন আদর্শ ও শিল্পকৌশল সম্পর্কে নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, বুদ্ধদেব বসু, প্রেমেন্দ্র মিত্র প্রভৃতির অবদান উল্লেখ করে তিনি বলেন বাংলা সৃজনশীল সাহিত্যের অপেক্ষাকৃত দীর্ঘকালের ঐতিহ্য বহন করছে কাজেই বাংলাতে প্রগতি সাহিত্য সম্পর্কে আলোচনা উচ্চস্তরে। তিনি এই প্রসঙ্গে জানান যে ব্রুসেলসে অনুষ্ঠিত শান্তি কংগ্রেসে ভারতীয় বুদ্ধিজীবিদের যে বিবৃতি পাঠানো হয় তাতে সর্বাগ্রে স্বাক্ষর করেন রবীন্দ্রনাথ এবং তিনি শুরু থেকেই প্রগতি লেখক আন্দোলনকে পরামর্শ, শুভেচ্ছা ও সক্রিয় সাহায্য দিয়ে এসেছেন। এর পর তিনি সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামীর লেখা "সাম্প্রতিক বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন ধারা" প্রবন্ধটির জনপ্রিয়তা এবং "প্রগতি" প্রকাশের উল্লেখ করেন।

কিন্তু বাংলা দেশের সাহিত্যে এবং সমাজে মত ও পথের বাস্তব ঐক্যসাধন ঘটাতে এখনো দেরী আছে—এই মন্তব্য করে তিনি অধ্যাপক ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের একটি বই-এর উল্লেখ করে বলেন বাংলা দেশের কৃষক ও বৃটিশ সরকারের মধ্যে অন্তত আঠারো জন মধ্যস্বত্বভোগী থাকার ফলে কস্মোপলিট-

নিজমে (বিশ্বজনীনতা) দীক্ষিত বাংলার মধ্যবিত্তশ্রেণী বাংলার মাটিতে শিকড় গাড়তে পারছে না। তার মানে অবশ্য এই নয় যে, বাংলায় কোন তাৎপর্যপূর্ণ সাহিত্য সৃষ্টি হয় নি—বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র তার প্রমাণ। তবু বাংলার বুর্জোয়াশ্রেণীর দাবী বাঙালী লেখককে এমনি গণ্ডীবদ্ধ রেখেছে যে উত্তর ভারতে যেখানে ইকবাল বা হাফিজ জলন্ধরীর কবিতার বই প্রথম সংস্করণের বিশ হাজার বিক্রি হয়—সেখানে বাংলা কবিতার বই দু'শ থেকে পাঁচশ এক বছরেও বিক্রী হয় না।

অবশ্য মুলকরাজ এই সমস্যা তুলে যে উত্তর সঙ্গে সঙ্গে দিয়েছেন তার থেকে প্রগতি লেখকরা বিশেষ কোন উপকার পেয়েছেন বলে মনে হয় না। তিনি বলছেন,

"The difficulties of communication between the same class and between one class and another could be removed by an understanding of the simple fact that writing is not only great when it is proletarian or bourgeoise, but when it is as intense enough realisation of experience to thaose creative forces, the exact nature of which has not yet been defined by psychological science ; that it is invidious to make a virtue of one's own limitations and resort to personal choice in the assessment of works of art as it is absurd to impose a formula to determine qualities of classic. At best one can only attempt to trace the possible sources of art in the differentiations of time and space, in the social forces that dominate the history of an epoch, fix one's gaze in the hypnotic trance the aesthetic vision of an illuminated moment and increase one's understanding and enjoyment of life.

বাংলা সম্পর্কে ডঃ আনন্দ আবার অধ্যাপক ধূর্জটিপ্রসাদের মত উল্লেখ করে বলেন যে সামাজিক অবস্থার জন্য বাংলায় রাজনৈতিক আন্দোলনে ব্যক্তিভিত্তিক অ্যানার্কিজম্ (বৈপ্লবিক সন্ত্রাসবাদ) এসেছে। কাজেই বাংলার সমাজ পরিবর্তনে ও সংগঠনে বাংলা সাহিত্যের দায়িত্ব বা সমস্যা সম্পর্কে চিন্তা করতে হলে সামাজিক অবস্থার সম্যক্ জ্ঞান থাকা দরকার।

মুল্‌করাজ হিন্দি ও হিন্দুস্থানী সাহিত্যের প্রসঙ্গে বলেন, কথা দিয়ে কথা মেলানোর যুগ অতিক্রম করে এই সাহিত্য বিষয়বস্তু ও ছন্দে বৈপ্লবিক রীতি অনুসরণ করছে। এই প্রসঙ্গে তিনি হাফিজ জলন্ধরী, জোশ মলিহাবাদী, মজাজ, তসীর ও ফয়েজ আহমদের নাম উল্লেখ করেন। এলাহাবাদে হিন্দুস্থানী সম্মেলনে সৈয়দ মুত্তালবী উত্তর ভারতের কৃষকদের রচিত গানে বৈপ্লবিক ভাবধারা সম্পর্কে যে প্রবন্ধ পাঠ করেন এবং মিঃ ত্রিপাঠি হিন্দি লোকসংগীতের যে বিরাট সঞ্চয়ন প্রকাশ করেন শ্রীযুক্ত আনন্দ তার উল্লেখ করেন। তিনি জানান যে ১৯৩৮ সালে দিল্লীর নিকটস্থ ফরিদাবাদে গ্রাম্য কবিদের সম্মেলন হয়েছিল এবং বোম্বাই ও কানপুরে মজুর কবিদের মুশায়েরা হয়। এই সব উদাহরণ থেকে তিনি আশা করেন যে জাতীয় মুক্তি সংগ্রামে কবিতা গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করবে। এই সব গ্রাম্যকবি ও মজুরকবি সম্মেলন থেকে মধ্যবিত্ত লেখকরা জনগণের সংগ্রামের অভিজ্ঞতায় শিক্ষা পাবেন এবং গ্রাম্য কবি ও মজুর কবিদিগকে কবিতার জটিল কলা-কৌশল সম্পর্কে শিক্ষা দেবেন—এই আশাও তিনি প্রকাশ করেন। হিন্দুস্থানী গদ্য সাহিত্য সম্পর্কে তিনি আমেদ আলি, সাজ্জাদ জহীর, আলি সর্দাব জাফ্‌রী, হায়াৎউল্লা আনসারী, রসিদ জাহান, বেণীপুরী, যুগোল কিশোর প্রভৃতির উল্লেখ ক'রে বলেন যে এঁদের রচনাগুণের চুলচেরা বিচার না করেও এ কথা বলা যায় যে এঁরা নতুন সাহিত্যের জন্মগ্রহণে সাহায্য করছেন।

ভারতের লেখকদের গুরুদায়িত্ব ও বাধাবিপত্তিব কথা উল্লেখ কবে শ্রীযুক্ত আনন্দ বলেছেন :

"A great literature will be born among us as our struggle advances, as we master aesthetic forms, as we attain sincerity through which alone it is possible to move the artist's talent and achieve works which approximate to the demands of the subject-matter."

এর অর্থ এই নয় যে, সৃজনশীল প্রতিভার উপর কোন নিয়ন্ত্রণ থাকবে না, কোন সমালোচনা চলবে না। এর অর্থ এই যে ভাববাদী, ব্যক্তিভিত্তিক বুর্জোয়া ধারনার বশবর্তী বা ব্যক্তির ভাল লাগা না লাগার মানদণ্ডের পরিবর্তে সামাজিক বাস্তবতার মানদণ্ড প্রয়োগ করা হবে। এই প্রসঙ্গে ডঃ আনন্দ, মার্ক্সের বিখ্যাত উক্তি,—"জীবনধারণের বাস্তব উপকরণগুলির উৎপাদন পদ্ধতি সমগ্র সামাজিক, রাজনৈতিক ও মানস জীবনের প্রক্রিয়াকে প্রভাবান্বিত করে—" উদ্ধৃত করে

বলেছেন যে এই যুক্তি আজকাল অনেকেই মানেন কিন্তু কিছু কিছু সমাজ-তাত্ত্বিক এই যুক্তিকে এমন যান্ত্রিক ভাবে প্রয়োগ করেন যার ফলে প্রতিক্রিয়ার সুবিধা হয়—কাজেই আমাদেব সরল সমীকরণও উত্তেজনাবাদের বিরুদ্ধে সজাগ থাকতে হবে।

এর পর তিনি সাহিত্যের সামাজিক বিশ্লেষণ কাকে বলে তা' মার্ক্সের পূর্বোক্ত উক্তিব সাহায্যে সংক্ষেপে বোঝাবার চেষ্টা করেন এবং বাল্‌জাক ও টলষ্টয় সম্পর্কে মার্কস্ ও লেলিনের উক্তির উল্লেখ করেন। যে সব নিস্পৃহ বুদ্ধিজীবী ও সৌখিন সমালোচকরা মনে করেন যে এই ধরণের সমালোচনার দ্বারা সাময়িক-সামাজিক প্রয়োজনের কাছে সত্য, শিব ও সুন্দরের মানদণ্ড বর্জিত হচ্ছে, তাদের উদ্দেশ করে শ্রীযুক্ত আনন্দ বলেন যে প্রকৃতপক্ষে চিরাচরিত মূল্যগুলিকে ফ্যাশিজমের হাত থেকে বাঁচাবার জন্য সংগঠিত বামপন্থী দলগুলিই আজ চেষ্টা করছে। তাই বেন্দা ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মত উদারনৈতিকরা আজ সংস্কৃতি রক্ষাব সংগ্রামে বামপন্থীদের সঙ্গে যুক্ত হচ্ছেন। শ্রীযুক্ত আনন্দ বলেন চিরাচরিত মূল্য আমাদের হাতে নষ্ট হতে পারে এই ধারণার উৎস হচ্ছে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্রবাদী ও অহংবাদী যারা সমাজবহির্ভূত লোক। এই প্রসঙ্গে তিনি গর্কিব 'একজন বুদ্ধিজীবীর প্রশ্নের জবাব' প্রবন্ধ থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন, "If we prefer to reinterpret the old values, the cardinal values, so that they may come to be regarded not surely as abstract virtues or ends in themselves but related to the requirements of the changing society to which we belong and which we seek further to transform, that does not mean that we have no morals." আমাদের প্রগতি লেখক সংঘ হবে ভারতীয় বুদ্ধিজীবীদের জন্য এমন একটা সংগঠন যেখানে নানাবিধ দার্শনিক, ধর্মনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক বিশ্বাস নিয়েও লেখাকে আমাদের পুরাতন সংস্কৃতি রক্ষা এবং অতীতের উপযুক্ত সমালোচনার দ্বারা নূতন সংস্কৃতি গড়ার কাজে একত্র হতে পারবেন। এই সংঘে পণ্ডিত, কবি, ঔপন্যাসিক, প্রবন্ধকার এবং সাধারণ পাঠক ঐক্যবদ্ধ ভাবে গণ-তান্ত্রিক আদর্শ ও ভারতের অর্থ নৈতিক, রাজনৈতিক ও সংস্কৃতির স্বাধীনতার জন্য লড়বেন। অত্যাচারিত দেশের লেখক আমরা এই যুদ্ধে ধনতন্ত্রের ধ্বংস দেখেছি। দীর্ঘকাল আমাদের দেশ দখলকারীর হাতে থাকার ফলে যুদ্ধ ও পরাধীনতার মর্ম আমরা বুঝেছি, নতুন সমাজ গঠনের তাগিদ আমরা বোধ করেছি, কাজেই

আমাদের সব কিছু বিশ্বাসকে বৈজ্ঞানিক ও বাস্তব দৃষ্টি দিয়ে যাচাই করতে হবে এবং তার জন্যই ঐক্যেব প্রযোজনীয়তাও বেশী। মেকলের শিক্ষায় আমরা জেনেছিলাম যে আমাদের পুবাতন সংস্কৃতি আবর্জনার স্তূপে ফেলে দেওয়ার বস্তু এবং এখন আমাদের সবকাবী সূত্রে বলা হচ্ছে যে আমাদেব সংস্কৃতি এত বড যে বাইরের ধাক্কা তাকে কিছুই করতে সাহস পাববে না।

চীন ও স্পেনের অবস্থা দৃষ্টান্তে এবং আমাদের জাতীয অস্তিত্বের উপর দেড়শ বছর ধরে ক্রমাগত আঘাতেব পব আঘাত এসে দাসত্বেব স্থায়িত্ব বাডাচ্ছে বলে আজ সমস্ত সাংস্কৃতিক কর্মীদেব ঐক্য অত্যাবশ্যক। ভারতেব সাংস্কৃতিক পুনরুজ্জীবনের জন্য সাংস্কৃতিক শক্তির সমাবেশ প্রাথমিক প্রয়োজন। কেবল দেশেব ঘটনাবলী নয বিদেশেব ঘটনাবলী ও আমাদেব উপর এই ধবণেব দাবী জানাচ্ছে। এই প্রসঙ্গে তিনি প্যারিসস্থ আন্তর্জাতিক লেখক সংঘ এবং তার শাখা হিসাবে আমেরিকা ও চীনেব লেখক সংঘ গঠনের কথা উল্লেখ করেন। আন্তর্জাতিক সংগঠনেব প্যারিস, লণ্ডন ও মাদ্রিদ সম্মেলনের কথা উল্লেখ করে বলেন যে লণ্ডন কংগ্রেসে বিশ্বসংস্কৃতিব উপব যে এনসাইক্লোপিডিয়া প্রকাশ করার কথা হয়েছিল, স্পেনে ফ্যাশিজমেব আক্রমণে সে ব্যবস্থা বানচাল হয়ে যায় এবং সংগঠন স্পেনের পক্ষে গণতান্ত্রিক শক্তি সমবেত করতে চেষ্টা করেন। ফলে বহু লেখকের অনেক কিছু সংস্কাব ভেঙ্গে যায়, বহু লেখক স্পেনের রণক্ষেত্রে গণতন্ত্রের জন্য প্রাণ দেন। ভাবতীয প্রগতি লেখক সংঘের অন্যতম সদস্য পণ্ডিত নেহেরু গণতান্ত্রিক স্পেনেব বণক্ষেত্র পবিদর্শন কবেন। জার্মানী থেকে টমাসম্যান, আইনস্টাইন ও ফ্রযেডেব নির্বাসন, পুথিপত্র আগুনে নিক্ষেপ প্রভৃতি ঘটনা লেখকদের ইটালী, জার্মানী ও জাপান সম্পর্কে অনেক মোহ দূব করে। অবশ্য ভারতীয় লেখকদের কাছে এসব অভিজ্ঞতা সাম্রাজ্যবাদ অনেকদিন থেকেই দিয়ে এসেছে। তবু দুনিযায বর্তমান অবস্থায় আমাদেব ভূমিকা পবিপূর্ণভাবে গ্রহণে করতে হলে আমাদের কয়েকটি দাযিত্ব পালন কবতে হবে। প্রথম হচ্ছে: ঠিক সাধাবণ রাজনৈতিক লোকের মত দৈনন্দিন কাজের মধ্য দিয়ে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতা অর্জনের আন্দোলনে অগ্রণী অংশেব সহভাগী হতে হবে। এর জন্য শক্তিশালী সাংবাদিকতার মারফতে লেখকেব দক্ষতা কাজে লাগবে। এতে কেবল লেখকের দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে তাই নয় লেখক বাস্তব জীবনের সঙ্গে পরিচিত হবেন, সংক্ষেপে ও শক্তিশালী ভাষায় বলবার শিক্ষা পাবেন এবং কুহেলিকাপূর্ণ চিন্তাধাবার পরিবর্তে জনসাধারণের প্রকৃত

জাতীয় ও সামাজিক সমস্যার সমাধানের জরুরী দাবীর সামনে লেখককে বারবার উপস্থিত হতে হবে।

দ্বিতীয়ত আমাদের অতীত সংস্কৃতির ঐতিহ্যকে সাম্রাজ্যবাদী কুৎসার হাত থেকে রক্ষা করা এবং প্রতিক্রিয়াশীলদের দ্বারা অপব্যবহারে বাধা দেবার ব্যবস্থা করতে হবে। সামন্ততন্ত্র বজায় আছে বলে এই দেশীয় প্রতিক্রিয়ার প্রভাব সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদ, পুরাতনকে বাঁচিয়ে তোলা, পৌরহিত্যবাদ, ও গোঁড়ামীর মধ্যে প্রকাশ পায়। প্রগতি লেখককে এই সকল অবস্থা বুঝে এর বিরুদ্ধে লড়তে হবে। তৃতীয়ত, শিল্পকলাকে জনপ্রিয় করাব সমস্যা ভারতীয় লেখকদের সমাধান করতেই হবে। এ দেশের শাসকরা ইচ্ছে করে দেশের বিরাট অংশকে অজ্ঞ করে রেখেছে। কাজেই লেখককে নজর বাখতে হবে সেই সব উপায়ের উপর যার দ্বারা জনসাধারণের শিক্ষার মান উন্নত করা যায়। শ্রীযুক্ত আনন্দ এর জন্য মফস্বলে লাইব্রেরী, বইয়ের দোকান, কংগ্রেস ও ছাত্র আন্দোলন মারফৎ শিক্ষার প্রচার এবং হিন্দুস্থানী রোমান অক্ষবে প্রবর্তন করার উপায় নির্দেশ করেন।

তিনি অবশ্য সোভিয়েট রাশিয়ার উল্লেখ করে গুজরাটি, বাংলা, তামিল, মারাঠি, পাঞ্জাবী ও পুস্তু ভাষার উন্নতিব উপর জোর দেন। এ ছাড়া ডকুমেণ্টাবী ফিল্‌ম, ব্যবসায়ী পরিচালিত ফিল্‌ম, বেতাব এবং সরকারী শিক্ষা ব্যবস্থা (জাকির হোসেন ব্যবস্থা) মারফৎ শিক্ষা প্রসারের আন্দোলনে লেখককে যোগ দেবার কথা বলেন। শ্রীযুক্ত আনন্দ শেষ প্যারায় বলেন : The task of building up a national culture on the debris of the past so that it takes root in the realities of the present, is the only way by which we will take our place among these writers of the world who are facing with us the bitterest struggle in history, the struggle of the peoples of the world against imperialism, it twin brother fascism, its old aunt feudalism and all other aunts who refuse to let the new shoots of life from bursting into future."

শ্রীযুক্ত আনন্দ এই বক্তৃতায় কয়েকটি জায়গায় অস্পষ্ট কথা বল্লেও মোটামুটি ভারতীয় প্রগতি লেখকসংঘ সম্পর্কে এবং ভারতীয় লেখকদের আশু কর্তব্য সম্পর্কে সঠিক কথাই বলেছেন। কি উদ্দেশ্য নিয়ে এবং কি কর্মপদ্ধতি নিয়ে কালচারাল ইউনাইটেড ফ্রণ্ট গড়তে হবে সে সম্পর্কে তিনি কোন ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি

হওয়াব সুযোগ দেন নি। তিনি ভারতের বিভিন্ন প্রদেশেব নিজস্ব সাংস্কৃতিক সমস্যা সম্পর্কে ভালবকম ওয়াকিবহাল না হযেও (অনেক সময় ভুল খবর রেখেও) সাধারণভাবে ভারতেব সাহিত্য ও সাহিত্যিকদেব সমস্যা তুলে ধরেছেন এবং নতুনভাবে সেগুলি সমাধান করাব জন্য সাহিত্যিক ও পাঠকদেব কাছে আন্তরিক আবেদন জানিযেছেন। আমবা পবে দেখতে পাব যে এই সম্মেলন সম্পর্কে যারা নানা বিরুদ্ধ মত প্রকাশ কবেছেন—তাবা শ্রীআনন্দেব বক্তৃতাব প্রকাশ্য সমালোচনা কবতে সাহস পাননি। কাবণ শ্রীআনন্দেব আবেদনেব মধ্যে সাহিত্য ও সাহিত্যিকদেব কাছে সমগ্র জাতিব সংগ্রামশীল চেতনার দাবী ছিল—যার বিপক্ষে সোজাসুজি দাঁড়ানো সে যুগে প্রত্যক্ষ বৃটিশ ভক্ত ছাড়া আব কাবো পক্ষে সম্ভব ছিল না। কাজেই এই সম্মেলনকে আক্রমণ কবাব জন্য প্রথমে এব দুর্ব্বল অংশেব উপব আক্রমণ কবে পবে মুল্‌করাজেব মূল বক্তব্যকে অপ্রত্যক্ষ ভাবে আক্রমণ কবা হয।

১৩৪৫ (১৯৩৯) সালেব মাঘ মাসেব, 'শনিবাবেব চিঠি'তে সজনীকান্তেব দল প্রচলিত সমালোচনাব সুবে মৌলিক প্রশ্ন তোলেন,—" কিন্তু মূলেই গলদ। বামায়ণ, মহাভাবত, কালিদাস, সেক্সপীযব, নিউটন, কীট্‌স্‌, ডিকেন্স, ডষ্টযভস্কি, ববীন্দ্রনাথেব সাহিত্য জানি—প্রগতি সাহিত্য কি ? মানব সভ্যতাব সঙ্গে সঙ্গে যাহাব গতিপবিণতি, সেই সাহিত্যেব স্বতন্ত্র বিশেষণ কেন ? এমন কোন সাহিত্য কি আছে, যাহাব গতি বিপবীত দিকে ? শোনা যায়, পৃথিবীব বহু সাহিত্যিক সমযেব অগ্রগামী ছিলেন এবং হযত এখনো আছেন, কিন্তু পশ্চাদগামী সাহিত্যেব কথা তো শুনি নাই। সাহিত্যের এমন মাপকাঠি কি সৃষ্টি হইযাছে, যদ্বাবা প্রমথ চৌধুবী, রাজশেখব বসু, নজরুল ইসলাম, বুদ্ধদেব বসু ও সমব সেনকে এক নিঃশ্বাসে মাপা যায ? গোস্বামী-মজুমদাবেব (সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী ও সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদাব) নেতৃত্ব দৃষ্টে মনে হয আপ্রাণ পবিস্থিতিব স্বার্থেই যেন প্রগতি সাহিত্যেব যোগ। অথবা প্রগতি সাহিত্য কুলি-মজুব ক্ষেপাইবার সাহিত্য ? সাহিত্য নিভৃত সাধনা এবং নিশ্চিন্ত অবসব বিনোদনের সঙ্গী। ইহার গতি আছে প্রগতি নাই। দল বাঁধিযা পতাকা উড়াইয়া ইনকিলাব জিন্দাবাদ মন্ত্রে সাহিত্যকে বাঁধা যায় না, অন্তত এতদিন যায় নাই।"

ঐ একই সংখ্যায শ্রীবামানন্দ চট্টোপাধ্যায়েব পুত্র অশোক চট্টোপাধ্যায় লিখলেন :—" সম্প্রতি একটি আধুনিক সাহিত্যিক সভায তাহাব পাঞ্জাবী সভাপতি (ডঃ আনন্দ) বলিয়াছেন যে, আধুনিক লেখকের কাজ হইতেছে

প্রাচীন সভ্যতার ধ্বংসাবশেষ হইতে গঠিত নূতন সভ্যতার বানীরূপেই আধুনিক সাহিত্যকে বর্তমানের বাস্তব পারিপার্শিকতার মধ্যেই শিকড় গাড়িয়া সাজাইয়া তোলা। এই আদর্শের সহিত আমাদের বিরোধ নাই। আপত্তি শুধু তথাকথিত আধুনিক লেখবদের এই আদর্শের মৌলিকত্বে হস্তারোপ করায় এবং তাহাদের অধিকাংশের অক্ষম প্রচেষ্টার জোর গলায় মাহাত্ম্য প্রচার ......সাধারণ মানুষকে কাল্পনিক বিচিত্রায় সাজাইয়া যাহারা আধুনিকতা প্রচার করেন—তাহারা উপকথার লেখক অপেক্ষা চিন্তারক্ষেত্রে উচ্চস্থান পাইতে পারেন না......নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসে প্রোপাগাণ্ডার আসরে সে সাহিত্যের আদর হইতে পারে—কিন্তু সত্য, ভাব ও রসের আসরে, স্থান কোথায় ?"

এছাড়া বুদ্ধদেব বসুর বক্তৃতা এদের আক্রমণের লক্ষ্য হয়েছিল। বুদ্ধদেব বাবু তাঁর বক্তৃতায় রবীন্দ্রযুগ অতীত হয়েছে বলে ঘোষণা করেন এবং বলেন যদিও তাঁদের লেখা বাংলাদেশ গ্রহণ করছে না—কিন্তু ভবিষ্যৎ তাঁদের পক্ষে।

"পূর্বাশা" কাগজ ঐ সালে পৌষ সংখ্যায় লেখে প্রগতি লেখক সম্মেলনের বক্তৃতায় বুদ্ধদেব বাবু তাদের সাহিত্যের দারিদ্র্য সম্পর্কে অন্ধ থেকে এই আক্ষেপ করেন যে তাদের সাহিত্য বহুল প্রসারলাভ করছে না··· বুদ্ধদেব বাবু প্রগতি আন্দোলনকে আপন সাহিত্য প্রচারের অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করেই নিরস্ত নন। তাঁর "কবিতা" কাগজের একদল বন্ধুকে সঙ্গে নিতে চান। সময়ের মাপকাঠি হাতে নিয়ে যদি বুদ্বদেববাবু 'রবীন্দ্রস্থষ্ঠ যুগ অতীত হয়েছে' বলে থাকেন তবে তাঁর সেই শিশু সুলভ যথার্থবাদিতা উপহাসেরও অযোগ্য।"

কিন্তু "শনিবারের চিঠি" আরও এক ধাপ এগিয়ে গিয়ে বুদ্বদেবের বক্তৃতার একটি উদ্ধৃতি দিল : "The moment of desire ! The moment of desire ! the virgin who pines for the man, shall awaken her womb to enormous joys in the secret shadows of her chamber." এর মন্তব্যে "শনিবারের চিঠি" লেখে : "যে ধরণের প্রগতিবাদের দম্ভ ইহারা করিয়া থাকে তাহাতে তত্ত্বগত প্রগতিও নাই—কালের প্রবহমানতাকেই কার্যতঃ ইহারা অস্বীকার করে। ইহাদের কণ্ঠস্বর কি মানুষের সার্বজনীন মনুষ্যত্ব ও বৃহত্তর ছন্দে স্পন্দিত হইতেছে ?···অতএব দল গড়িলেই কোন কিছুর প্রাধান্য প্রমাণিত হয় না—সাহিত্যের ক্ষেত্রে নানা স্থানে শাখা-

প্রশাখা স্থাপন কবিয়া একটা 'নিখিল' উদ্দেশ্যটা সাহিত্যের দিক দিয়া সৎ বা সত্য নহে। যাহাবা অন্তবে ধর্মহীন, আধুনিক যুগেব অহম-মদমত্ততায় যাহারা প্রাণেব স্থৈর্য্য হারাইয়াছে, যাহাবা মৃত্যুকেই মোক্ষ জানিযা চিরকালের উপব ক্ষাকালকে আসন দিযাছে এবং সর্বশেসে যাহারা বিকৃত দেহ-মনের স্নায়ু-দৌর্বল্যকেই প্রজ্ঞা ও প্রতিভাব নিদান বলিযা স্থিব কবিয়াছে তাহাবাই এই প্রগতির ধ্বজা তুলিয়া সাহিত্যকে বিকাবগ্রস্ত কবিতেছে।"

হীবেনবাবুদেব চেষ্টায মার্কসবাদী সংস্কৃতি আন্দোলন গড়াব প্রথম যুগে এমনিভাবে মতাদর্শেব সংগ্রাম শুরু হয। আমি আগেই বলেছি যে ভারতেব সংস্কৃতি ক্ষেত্রে মার্কসবাদেব প্রযোগ সম্পর্কে যান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গীব জন্য এবং গোটা মার্কসবাদী আন্দোলনে সংস্কৃতি বিষযক ক্রিযাকর্মে কোন অভিজ্ঞতা না থাকায ঘোষণা ও সংগঠনে নানা দুবলতা প্রবেশ করে। দ্বিতীয মহাযুদ্ধ শুরু হওযাব প্রাক্‌কালে রুশ জার্মান অনাক্রমণচুক্তি এবং বৃটিশ বিবোধী সংগ্রামেব প্রশ্নে জাতীয যুক্তফ্রণ্টে যে ভাঙন সৃষ্টি হয তাব প্রতিক্রিযা প্রগতি লেখক সংঘের উপরও পড়েছিল। সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে প্রগতি লেখক সংঘের কাজ প্রায বন্ধ হলেও বাংলায তরুণ মার্কসবাদী গোষ্ঠী "অগ্রণী" ও পরে "অবনি" কাগজেব মাধ্যমে বুদ্ধদেব গোষ্ঠীব বিরুদ্ধে মার্কসবাদী দৃষ্টি কোণ থেকে আক্রমণ সুরু করে, যার পুরোভাগে ছিলেন বিনয় ঘোষ, স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য, সুবোধ চৌধুবী ও সরোজ দত্ত। অধ্যাপক গোপাল হালদারও আমাদেব পক্ষে ছিলেন। আমার যতদূর মনে পড়ে তাঁদেব সম্পাদিত 'নব পর্যায় ভাবতে' আমি প্রথমে একটি প্রবন্ধ লিখি এবং তারপব সরোজ দত্ত ও বিনয় ঘোষ 'অগ্রণী', 'আনন্দবাজার' প্রভৃতিতে কযেকটি প্রবন্ধ লেখেন। বিনয় বাবুর প্রবন্ধগুলি দুটি বই-এর আকারে প্রকাশিত হয়। 'অগ্রণী' কাগজে সমর সেনের In defence of decadence (ক্ষয়িষ্ণুতার স্বপক্ষে) প্রবন্ধের কঠোর সমালোচনা সরোজ দত্ত করেন। গোপাল হালদারের 'একদা' উপন্যাসেব আলোচনা প্রসঙ্গে অধ্যাপক সুবোধ চৌধুরী, বুদ্ধদেব বসুব 'শিল্প সর্বস্বতা'ব মুখোস খুলে দেন। তাছাড়া সুবোধ ঘোষকে নিযে তরুণ গ্রুপেব উৎসাহ বুদ্ধদেব গোষ্ঠীব ভালো লাগেনি। ফলে হীবেন বাবুরা বিব্রত বোধ করতে লাগলেন তরুণদলের উগ্রতা দেখে। শেষ পর্যন্ত এই বিরোধের একটা আপোষরফা হল ফ্যাসিষ্ট বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘের ভিতর দিয়ে যখন সুবোধ ঘোষ চলে গেলেন এবং সরোজ দত্ত ও বিনয় ঘোষের চেষ্টায় তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় এলেন। তরুণ মার্কসবাদীরা যে একেবারেই নির্ভুল ছিলেন তা আমি বলছি না।

অগ্রণী [জ্যৈষ্ঠ—কার্তিক]—১৩৫৮ সাল।

কৃষক সমস্যা ও রামমোহন রায়

জমিদারী প্রথার উচ্ছেদ এবং জমির স্বত্ব নিয়ে আজকাল বুদ্ধিজীবীদের আলোচনা চলছে। চীনের ভূমিসমস্যা সমাধানের সাফল্যে এদেশেও নূতন করে এই সমস্যা ভেবে দেখার প্রয়োজনীয়তাই সকলে বোধ করছেন। বস্তুতঃ এই সমস্যা নিয়ে আলোচনা এদেশের চিন্তানায়করা অনেক দিন ধরেই করেছেন এবং আজ যে সমাধানের কথা বলা হচ্ছে তার আশে পাশে তারা অনেকদিন ধরেই ঘুরেছেন; কিন্তু এদেশের বাস্তব অবস্থার জন্য এবং সেই অবস্থার সঙ্গে তাদের নিজেদের জীবন যাত্রার পদ্ধতি ও চিন্তাধারা জড়িত থাকায় তাবা ঠিক আজকের সমাধানের সঙ্গত কারণেই পৌছাতে পারেন নি।

জাতীয়তাবাদী মহলে রাজা রামমোহন রায়কে বর্তমান ভারতের জনক বলা হয়। মার্ক্সবাদী মহলে তাঁকে বুর্জোয়া জাতীয় আন্দোলনের অগ্রদূত বলা হয়। বস্তুতঃ আজকে ভারত যে ধরণের ডমিনিয়ান ষ্টেটাস মার্কা স্বাধীনতা পেয়েছে ১২০ বছর আগে রামমোহন ঠিক তাই দাবী করেছিলেন। ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষা, ইংরেজের সাহায্যে এদেশের শিল্প বাণিজ্যের প্রসার, মধ্যযুগীয় বর্বরতার অবসান চেষ্টা প্রভৃতি আজ যে সব বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিকাশের সামান্য লক্ষণ এদেশে দেখা যায় তার সব কিছুরই দাবী তিনি করেন। কাজেই তিনি ভারতের ভূমি ব্যবস্থা সম্পর্কে যা বলে গেছেন—তা' আজ বিবেচনার যোগ্য।

রামমোহন ইজারাদারদের বংশে জন্মগ্রহণ করেন এবং নিজে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কালেকটরীতে প্রায় ১৩ বছর দেওয়ানী করেন। এই দেওয়ানী কাজে বামমোহনকে বিভিন্ন জেলার সমস্ত জমি জরিপ করে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের রাজস্ব নির্দ্ধারণ করে দিতে হ'ত। ১৩ বছরের কাজে তিনি লক্ষাধিক টাকা সঞ্চয় করেন এবং তাঁর জীবনীকাররা বলেছেন যে তিনি ঘুষ না নিলেও 'ন্যায্য উপরি' নিয়ে এই অর্থ সঞ্চয় করেছেন। সে যাইহোক রামমোহনের অধিকাংশ বন্ধু ও সহকর্মী ছিলেন লর্ড কর্ণওয়ালিশের তৈরী চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে সৃষ্ট-জমিদার। এদের মধ্যে দ্বারকানাথ ঠাকুর, তেলেনীপাড়ার অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, টাকীর কালীনাথ রায় প্রভৃতির নাম করা যেতে পারে।

তৎকালীন ভারতের অবস্থা

রামমোহনকে বিচার করতে হলে তার সমসাময়িক দেশের অবস্থা ভেবে দেখতে হবে। মুসলমান রাজত্ব পতনের যুগে তিনি জন্মেছিলেন। একদিকে সেই শাসনের চরম দুরবস্থা যেমন তিনি দেখেছিলেন—তেমনি দেখেছিলেন ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীব একচেটিযা লুণ্ঠন এবং কোম্পানীর বিরুদ্ধে স্বাধীন ব্যবসার পক্ষপাতি বৃটিশদের প্রবল প্রতিরোধ। বস্তুতঃ রামমোহনের পরিণত বয়সে কোম্পানীব বিরুদ্ধে লডাইয়ে স্বাধীন ব্যবসায়ীরা জয়ী হয়। রামমোহন জানতেন যে মুর্শিদকুলি খাঁ বাংলায় যে ধরণের ভূমি ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন কবেন, লর্ড কর্ণওয়ালিশ সেই ব্যবস্থাই সামান্য বদ বদল করে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তেব সৃষ্টি করেন। তিনি এও জানতেন যে কোম্পানী প্রত্যক্ষ ভাবে অথবা অস্থায়ী জমিদাবী প্রথার মারফৎ এদেশেব সমস্ত অর্থ লুণ্ঠন করে নিয়ে যাচ্ছে তাদের ব্যবসার মূলধন সঞ্চয়ের তাগিদে। ফলে এদেশে বারবার দুর্ভিক্ষ হচ্ছে ও দেশের লোকেব ব্যবসা ধ্বংস হচ্ছে।

ইতিমধ্যে বৃটেনেও অবস্থাব পরিবর্তন ঘটে। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ভারতের জিনিষ ইউরোপের বাজারে বিক্রি কবে লাভ ক'রত। কিন্তু ভারত লুণ্ঠনের ফলে যে প্রাথমিক পুঁজি বিলাতে সঞ্চিত হযেছিল এবং তার ফলে বৃটেনে যে শিল্পকারখানাজাত পুঁজি সৃষ্টি হয়, ভারত সম্পর্কে সেই পুঁজির মালিকদের শোষণ নীতি ভিন্ন রকমের ছিল। তাবা চেয়েছিল ভারতকে কাঁচামাল সরবরাহ-কারী এবং বিলাতে তৈরী মাল বিক্রয়ের বাজার হিসাবে। তাই তারা ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর শাসন প্রথাব অবসান চায়। এই যুগে লর্ড কর্ণওয়ালিস আসেন ও ভূমি ব্যবস্থার পরিবর্তন করেন।

অবশ্য বাংলায় যে ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হ'ল—তা অন্যত্র হয় নি; যুক্ত-প্রদেশে অস্থায়ী জমিদাবী এবং দক্ষিণ ভারতে রায়তোয়ারী ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয। এর কারণ প্রধানত রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ছিল। অর্থাৎ মুসলমান শাসনের সুনিশ্চিত অবসান ঘটানো এবং সেই শাসন যেন কোন ভিত্তি না পায় —তার ব্যবস্থা করা ও প্রত্যক্ষ ভাবে লুণ্ঠন করা। এছাড়া বৃটেনে কোম্পানী ও স্বাধীন ব্যবসায়ীদের স্বার্থের পরস্পর বিরোধিতা ভারতে সর্বত্র একই ভূমি ব্যবস্থা প্রবর্তনের পক্ষে অনুকূল ছিল না। তবে দুইটি বিষয়ে ইংরাজ মৌলিক পরিবর্তন ঘটায়। প্রথম হ'ল—বিজয়ী হিসাবে কোম্পানী মূলতঃ সমস্ত জমির মালিকানা

লাভ করে। আর দ্বিতীয় ব্যবস্থা হল—ফসলের কথা বিবেচনা না করে নির্দিষ্ট অর্থের পরিমাণে খাজনা আদায় করা।

তা'ছাড়া জমিদারী, সাময়িক জমিদারী (ইজারাদারী), রায়তোয়ারী প্রভৃতির সঙ্গে সঙ্গে খাসমহল, মৌরসী, মেয়াদী পাট্টা প্রভৃতি আইনগত ব্যবস্থা বজায় রাখার ফলে কৃষক ও রাষ্ট্রের মধ্যে কেবল জমিদার ইজারাদার রইল না, তৈরী হল অসংখ্য মধ্যস্বত্ব ভোগী যারা শিল্প বাণিজ্যের উন্নতি বৃদ্ধি না করতে পেরে কেবল জমির উপর নির্ভর করবে এবং মূলত কৃষককে শোষণ করতে বাধ্য হবে।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের উদ্দেশ্য

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের রচয়িতা লর্ড কর্ণওয়ালিশ নিজেই তার স্মারক লিপিতে বলেন, 'তিনি এ বিষয়ে খুবই সচেতন যে এমন শ্রেণী এই ব্যবস্থা জন্ম দেবে যার সঙ্গে আগেকার জমিদারদের কোন সম্পর্ক নেই। আগেকার জমিদার বলতে তিনি তাদেরই বুঝিয়েছিলেন যারা মুসলমান রাজত্বে রাজস্ব আদায়কারী হিসাবে প্রজার উন্নতির কথা ভাবতেন, জল নিষ্কাষণ, বীজ প্রভৃতি দেওয়ার ব্যবস্থা তারা করতেন। বলা বাহুল্য এই ধরণের পুরানো জমিদাররা যে চিরস্থায়ী ব্যবস্থা চালু হওয়ার ফলে মারা পড়েন তা সর্বজন বিদিত। লর্ড উইলিয়াম বেন্টিক ভারতের বড়লাট হিসাবে ১৮২৯ সালে বলেন: 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মধ্যে নানা গুরুত্বপূর্ণ ত্রুটি আছে সত্য, তবু এর দ্বারা জনগণের উপর পূর্ণকর্তৃত্বশীল বড় একদল ধনী ভূম্যধিকারী সম্প্রদায় তৈরী হয়েছে—যারা নিজেদের স্বার্থে বিস্তৃত গণবিক্ষোভ বা বিপ্লবের বিরুদ্ধে বৃটিশ শাসন বজায় রাখার জন্য সর্বদাই তৎপর থাকবে।

পূর্বেই বলেছি যে ভারতের সব জায়গার হিসাব নিলে দেখা যাবে তৎকালীন শাসকবর্গের কাছে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত খুব প্রিয় ছিল না। বাংলা, বিহার ও উত্তর মাদ্রাজের কিছু অংশে অর্থাৎ বৃটিশ ভারতের ১৯ ভাগে এই ব্যবস্থা বর্তমান ছিল। সাময়িক জমিদারীর ব্যবস্থা ছিল যুক্তপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, বোম্বাই ও বাংলার কিছু অংশ অর্থাৎ ভারতের ৩০ ভাগ জমিতে। রায়তোয়ারী প্রথা চালানো হল বোম্বাই, বেরার, সিন্ধু, আসাম ও মাদ্রাজের অধিকাংশ জায়গায়—। অর্থাৎ ৫১ ভাগ জমিতে। এই সমস্ত প্রথার সুফল ও কুফল অল্পদিনের মধ্যে যা দেখা দিয়েছিল তা রামমোহন জানতেন। তিনি

একথাও জানতেন এবং নিজে বিলাতে গিয়ে বলেছেন যে মোগলদের তুলনায় বৃটিশরা অনেক বেশী রাজস্ব আদায় করছে ভারতবাসীর কাছ থেকে।

রামমোহন কেন চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সমর্থক ছিলেন

তবু রামমোহন কেন চিরস্থায়ী বন্দোবস্তেব সমর্থক হয়েছিলেন তা তাঁব বিবৃতি থেকে আন্দাজ করা যায়। তিনি আশা করেছিলেন যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে প্রজাদের উপব বারম্বার বে-পরোয়া লুঠ বন্ধ হবে এবং নতুন জমিদারদের হাতে ক্রমান্বয়ে এমন মূলধন সঞ্চিত হবে যার ফলে দেশী ব্যবসা-বানিজ্যের সুবিধা হবে। রামমোহন ১৮৩১ সালে বিলাতে থাকার সময় হাউস অব কমন্সের একটি সিলেক্ট কমিটির সামনে যে সাক্ষ্য দেন তার থেকে তাঁর এই মতামতেব আভাষ পাওয়া যায়। বামমোহন সেখানে পরিস্কার জানান যে প্রাচীন ভাবতে বাজা জমির স্বত্বাধিকারী ছিলেন না। জমি ব্যক্তিগত, পরিবারগত বা গ্রামের সম্পত্তি ছিল। জমি রক্ষণাবেক্ষনের জন্য রাজা উৎপন্ন ফসলে ⅙ অংশ বা ⅛ অংশ পেতেন। পতিত জমি বা জঙ্গল প্রভৃতি যার কোন নির্দ্দিষ্ট মালিক ছিলনা সেগুলি রাজার মালিকানায় ছিল। বিজয়ী মুসলমান রাজাবাই প্রথমে জমির উপর স্বত্ব কায়েম করেন। তবু মোগলদের সময় জমির উপর কৃষক, জমিদার ও রাজা তিন জনের স্বত্ব ছিল। ইংরাজেরা প্রধানতঃ এই ব্যবস্থার সামান্য বদবদল করে কাজ সুরু করেছে। বামমোহন নিজের মত হিসাবে বলেন যে রাজার অধিকার স্বীকার করার পর একমাত্র প্রজার স্বত্বই মানা উচিত। বিশেসতঃ খোদকস্ত রায়তদেব স্বত্ব স্বীকার করা একান্ত ন্যায়সঙ্গত।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে কাদের বেশী সুবিধা

সিলেক্ট কমিটি যখন প্রশ্ন করলো – চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে জমিদারদের অবস্থা উন্নত হয়েছে কিনা—তখন তিনি জবাবে বলেন, 'নিঃসন্দেহে তাদের অবস্থার বেশ উন্নতি হয়েছে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে জমির উন্নতি করলেও খাজনা বৃদ্ধি হয় না বলে তারা পতিত জমি চাষ করিয়ে এবং কৃষকদের খাজনা বৃদ্ধি করে নিজেদের আয় ও দেশের সম্পদ বৃদ্ধি করেছে।' এর ফলে সরকারের রাজস্বেব ক্ষতি হচ্ছে কিনা—এই প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তন করে সরকার কোন রকম ক্ষতি স্বীকার করেন নি। কারণ জমির উপব যে

মন ও প্রাণকে নিরবচ্ছিন্নভাবে নিষ্ঠিত রাখা কেমনভাবে সম্ভব হইতে পারে? অথচ তাহাই করিতে হইবে, নতুবা মৃত্যুকে অতিক্রম করা যাইবে না।

গীতায় অধিভূত, অধিযজ্ঞ এবং অধিদৈব এই তিনটি তত্ত্বের ভিতর দিয়া প্রত্যক্ষভাবে ভগবদুপলব্ধির রহস্য উন্মুক্ত করা হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে এই তিনটি তত্ত্বে ভগবদনুভূতি পরিস্ফূর্ত্তভাবে উপলব্ধি করিতে পারিলে তবে আমরা মৃত্যুর মধ্যে অমৃতত্বে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে সমর্থ হই। বস্তুতঃ উচ্চ অধ্যাত্ম-সাধনায় প্রতিষ্ঠিত সাধকের দৃষ্টিতে এই তিনটি তত্ত্ব পৃথক পৃথক ভাবে বিচার-মূলে উপলব্ধি হয় না। যদি তাহাই হইত, তবে সোজাসুজি ভগবানকে দেখার কথা আমরা তাঁহাদের মুখে শুনিতাম না। কিন্তু এ কথা বলিতে ইহাও বুঝিতে হইবে না যে, পৃথক পৃথক্ ভাবে এগুলির কোন বৈশিষ্ট্য নাই। অবশ্যই আছে, কিন্তু প্রত্যক্ষানুভূতির ক্ষেত্রে এই তিনটি তত্ত্ব একই সত্যে সুসমঞ্জস এবং সমীহিত হইয়া এক অনির্ব্বচনীয় বিস্ময়কর বৈচিত্র্যে রসধর্ম্মে অন্বিত হইয়া থাকে। বস্তুতঃ অধিভূত অর্থাৎ ক্ষর-স্তরকে আশ্রয় করিয়া ভূত অর্থাৎ অতীতের সংস্কার সুদৃঢ় মনোভূমিতে বিষয়ের ক্ষণিকতার প্রতীতির সৃষ্টি হয়। আমরা এই স্তরের জীব। ক্ষর প্রকৃতির উপরই আমাদের নির্ভর। এই হিসাবে অধিযজ্ঞকে বর্ত্তমান অবস্থা বলা যায় এবং অধিদৈবকে ভবিষ্যৎ বলা চলে। অতীতের কর্ম্ম-সংস্কারকে অবলম্বন করিয়াই আমরা বর্ত্তমান জগৎকে উপলব্ধি করি এবং প্রাণের শিকড়ে চিত্তের মূল ভিত্তিতে একটু স্থান করিয়া আমাদের বর্ত্তমানতা আমাদের কর্ম্ম বা যজ্ঞের ভিতর দিয়া উপলব্ধি করিয়া থাকি। এইভাবে আমার বাড়ী, আমার ঘর এই প্রত্যয়ের উপর আমাদের মন আশ্রয় পায়। অধিভূত এই আশ্রয় অনিত্য। ইহার উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়া জীবনের ক্ষুদ্র প্রয়োজনের জন্য আমাদিগকে নিজদিগকে উৎসর্গ করিতে হয়, করিতে হয় যজ্ঞ। এই যজ্ঞের ফলানুযায়ী গঠিত সংস্কারকে আশ্রয় করিয়া অধিদৈব শক্তি ভবিষ্যতের অভিমুখে আমাদের সংসৃতি ঘটায়, বুদ্ধিকে পরিচালিত করে। এইরূপ বিচার করিলে বুঝা যায়, অধিভূত স্থূল দেহ এবং মনের স্তর, অধিযজ্ঞ প্রাণ বা হৃদয়ের স্তর এবং অধিদৈব বুদ্ধির ভূমি। সুতরাং এখানে বর্ত্তমানের মধ্যে যদি ভগবানকে উপলব্ধি

করিতে হয়, তবে প্রাণের ক্ষেত্রে, কর্ম্মের ভূমিতে, যেখানে সব রূপ ও রসের আধার সেই হৃদয়ে তাঁহাকে অনুভব করাই সাধনার দিক হইতে বাস্তব, অন্য সবই অনুমান মাত্র। বিশেষতঃ প্রাণের জন্যই আমাদের সাধনা। আমরা মৃত্যুকে এড়াইতে চাই বলিতে প্রাণকেই নিত্য করিয়া লাভ করিতে চাই। কিন্তু যে অবস্থার ভিতব আমরা বর্ত্তমানে আসিয়া পড়িয়াছি, তাহাতে আমাদের প্রাণ অত্যন্তই চঞ্চল। প্রাণ আমাদের অতি ক্ষুদ্র ; এবং অতি সঙ্কীর্ণ। অতি ক্ষীণ প্রাণের এই যে ধারা, আমরা ভিতরে সাড়া পাই, ইহা কোনদিন শুকাইয়া যাইবে কেহই বলিতে পারে না। বস্তুতঃ ভূতের বিডম্বনায় এবং ভবিষ্যতের ভাবনায় ইহা অনবরত শুকাইয়াই চলিয়াছে। ভাটার দিকেই ইহার গতি, এবং প্রাণেব ঘাটে জোয়ারের টানের কোন সম্ভাবনাই দেখা যায় না। এই সত্যটি পরিস্ফুট করিবার জন্যই ভাগবতের ঋষি প্রশ্ন কবিয়াছেন—তোমরা তো অনেক কিছু জানিয়াছ, শুনিয়াছ, কিন্তু এমন নদী দেখিয়াছ কি যাহার দুই কূলই ভাঙ্গিতেছে ? বাস্তবিকপক্ষে আমাদের প্রাণরূপ প্রবাহিনীর দুই তীরই সমানভাবে ধ্বসিয়া পড়ে। বাঙলার মহাজনগণ অন্যভাবে এই একই সত্য ব্যক্ত করিয়াছেন—"ফলরূপে পুত্র-কন্যা ডাল ভাঙ্গি পড়ে, কালরূপে সংসারেতে পক্ষ বাসা করে।" এ বিষম অবস্থা। "দুহু দিশি দারু দহন যৈছে দগধই আকুল কীট-পরাণ।" সেইরূপ আমাদের প্রাণ-কীট দুই দিকের দুশ্চিন্তার জ্বালায় কেবলই ছটফট করিতেছে। ভূতও অন্ধকার ভবিষ্যৎও অন্ধকার ; বর্ত্তমানে যাহা করিতেছি, তাহাও বিকার। প্রাণকে পুরাপুরি স্বীকার করিবার শক্তি কোথায়ও আমরা পাইতেছি না। এমন কি কিছুই নাই, বর্ত্তমানে যাহাকে জড়াইয়া ধরিতে পারিলে এই দুই দিকের অসহায়ত্ব দূর হয় ? এমন আলো কি নাই যাঁহার আশ্রয় লইলে এই দুই দিকের অন্ধকার উজ্জ্বল হইয়া যায়, যাহা ত্রিকালেই সত্য এবং নিত্য, তাহাই ব্যক্ত হয়। বস্তুতঃ কালের হিসাব স্থূল মনের নিতান্ত ক্ষণিকতার অনুভূতির স্তর ; কালের এই অনুভূতিকে বৌদ্ধেরা ধারা-জ্ঞান বলেন। এই স্তরেই হোক, কিংবা এই ধারার লয়ভূমি আলয়জ্ঞান বা বুদ্ধির স্তরেই হোক্ কালের প্রভাবেই দুঃখ, মনের বিকার এবং বুদ্ধির বিপর্য্যয়। সাধন-ভজন যত যাহাই করা যাক্ না কেন, শান্ত, সমাহিত অবস্থার মধ্যেও সাধক উচ্চকিত হইয়া শুনিতে পায় কালের

ঘড়ি টিক টিক্ করিয়া বাজিয়াই চলিয়াছে। চমৎকার, তাহার কাজ ঠিকই আছে, তাহার গতি বন্ধ হয় নাই। সাধক মনোবৃত্তিগুলিকে সংযত করিয়া আনিয়া স্থির হইয়া বসিয়াছেন কিন্তু কালের ঘড়ি বাজিতেছে সমান। নিস্তব্ধ নীরবতার মধ্যেও কালের সেই সদাসতর্ক ঘোষণা দুঃসহ তাড়নায় সাধককে বেদনার মধ্যে লইয়া ফেলে'। তাহার শ্রুতি বিপ্রতিপন্ন হইয়া যায়, কাল এমনই দুরন্তবীর্য্য।

কিন্তু মানুষও সামান্য নয়। তাহার ক্ষমতাও অসীম। বাঙলার অধ্যাত্ম-সাধনা মানুষের এই মহত্ত্ব অশেষভাবে উপলব্ধি করিয়াছিল। এদেশের সাধক মানুষকে ডাকিয়া অমৃতের বাণী শুনাইয়াছিলেন। তাঁহারা তাহাকে জাগ্রত করিয়াছিলেন। হাঁ, সঙ্কোচ করিলে হইবে কি? প্রকৃতপক্ষে সাধকের অভাব অন্তত বাঙলাদেশে কোনদিন ঘটে নাই। ইঁহারা প্রাচীন তপোবনের বেদবাণী সহজ এবং সরল ভাষাতে মানুষের চিত্তে সঞ্চার করিয়াছিলেন। মানুষকে কি সহজে চেনা যায়? বাংলার বৈষ্ণব কিছুদিন পূর্ব্বেও মানুষকে ডাকিয়াছেন, বলিয়াছেন তোমরা সামান্য নহ— "ভাবিয়া বুঝ না, দেবের শকতি ক্ষীরোদে যাইতে নারে। ভারত-ভুবনে সাধিতে পারিলে হাঁটিয়া গোলোকে চড়ে।" "মানুষ জন্মিলে, মানুষ চিনিলে যেজন মানুষ হয়, সুখের সাগরে সে রহে সতত ভুবন করিয়া জয়।"

—(প্রেমানন্দ দাস—মনোশিক্ষা)।

বস্তুতঃ প্রাণধর্ম্মেই মানুষেব এই মনুষ্যত্ব। প্রাণেব ধর্ম্ম হইল দান, যজ্ঞের প্রবৃত্তি। মানুষের এই প্রাণভূমি হৃদয়ে থাকিয়া অধিযজ্ঞ দেবতার দান-লীলা চলিতেছে। সে দানকেলির কৌমুদী ধারায় স্নান করিতে পারিলে প্রাণের মহিমা প্রচুর হইয়া ছুটে। যাঁহার দানে সোম-সূর্য্য হইতে প্রাণ-ধারা ছড়াইয়া পড়িতেছে, মানুষ তাঁহার দান-সত্রে প্রতিষ্ঠিত হইয়া এবং তাঁহাকেই জ্যোতির্লিঙ্গ স্বরূপে অন্তরে উপলব্ধি করিয়া সকল অন্ধকার অতিক্রম করিতে সমর্থ হয়। ভগবানকে মধুর ভাবে উপলব্ধি, তাঁহাকে নিত্যলীলায় পাইবার রহস্য এইখানেই নিহিত রহিয়াছে। প্রেমের উদয়ে এই পথেই কামের জয়। বিকারকে অতিক্রম করিয়া সত্যকে স্বীকার। বিশুদ্ধ সত্ত্বময় ভগবৎ-বিগ্রহের সৌকুমার্য্য এবং মাধুর্য্যের সম্ভোগে বুদ্ধির বিপর্য্যয়েরও এইখানেই লয়। আমাদের পক্ষে তখন বিচার ছাড়িয়া

সাক্ষাৎ-সম্পর্কে চিদৈশ্বর্য্যময় ভগবানের স্বীকৃতি এবং তাঁহার কাছে সর্ব্বতোভাবে সম্মতি এবং তাঁহার শরণাগতি লাভ ঘটে।

ভগবানকে আমরা যে কোনভাবেই সাধনা করি না কেন, সব ক্ষেত্রে মধুরভাবেই কার্য্যতঃ তাঁহাকে স্বীকার করিয়া থাকি। তাঁহাকে জানিতে হইলে তাঁহার শক্তিকেই জানিতে হয়। শুধু জানা নয়, মানিতে হয় এবং তাঁহার শক্তিকে মানার অর্থই হইল সেই শক্তির রঙ্গময় সঙ্গের আলোকে আমাদের চিত্তবৃত্তিসমূহের স্ফূর্ত্তি, অন্য কথায় সেগুলির অনুপথে গতি বা স্ব-সংবেদ্যভাবে তাহাতে সম্মতি। ভগবানের ইচ্ছার সঙ্গে আমাদের কামনা-বাসনাকে একীভূত করিয়া দেওয়াই ইহার অর্থ। প্রকৃতপক্ষে ভগবদনুভূতির ক্ষেত্রে আনন্দ বড় কথা নয়। ভগবানের করুণায় তাঁহার জন্য বেদনায় আমাদের মনটি গলিয়া যাওয়া চাই। এইভাবে মনটি গলিয়া গেলে মধুর দেবতার আত্ম-মাধুর্য্যই আমাদের অন্তরে খোলে—'রসিক শেখর কৃষ্ণ পরম করুণ'। ভগবান্ আমাদের দণ্ডদাতা। তিনি শাস্তা, কেবল পাপী আমরা, তিনি আমাদিগকে সাজা দিতেছেন এরূপ ধারণার সঙ্গে আত্মভাবে প্রভাবিত ভগবৎ-সাধনার কোন সম্পর্ক নাই। তেমন সাধনায় বুক ভরে না, প্রাণ জাগে না; পক্ষান্তরে তাহা শুধু দৈন্যই বাড়ায়। বস্তুতঃ মধুরের ধর্ম্মই হইল প্রচুর। মধুররস বিস্তার-শীল—বিষ্ণুদৈবত। এই রসের স্পর্শে আমাদের হৃদয় সম্প্রসারিত হয় এবং একদিকে দেহ ও মন আর অন্য দিকে ইহার বুদ্ধির বাহ্যবিষয়গত বৃত্তিনিচয়কে সেই রস পরম বীর্য্যে অভিষিক্ত করিয়া অখণ্ড এক আনন্দ সত্তার নিবিড় অনুভূতিতে আমাদিগকে নিমগ্ন করে। আমরা আমাদের সব ক্ষুদ্রতা হইতে মুক্ত হই। সে অবস্থায় আমাদের ভিতরের সব ক্ষুধা মিটিয়া যায় এবং আমাদের বাহিরের ব্যথা সব দূর হয়। অনপেক্ষ দিব্য জীবনে অধিরূঢ় এই যে অবস্থা বাধাবন্ধ-বিনির্মুক্ত সেখানে স্বাচ্ছন্দ্য, ইহাই আমাদের পক্ষে স্বারাজ্য এবং এই পথেই আমাদের স্বরূপের সত্যকার উপলব্ধি। অধ্যাত্মসাধনার রাজ্যে অধিকারের তারতম্য শুধু অন্তরমূলে এই আনন্দলীলায় অধিগম্যতা বা অনুপ্রবেশের বিচারেই নিরূপিত হইয়া থাকে। প্রত্যুত বাহিরের অন্য সব বিচার ও বিতর্ক বা তাহা লইয়া বিরোধ এবং বৈষম্যের অবতারণায় অধ্যাত্মসাধনায় অনধিকারত্বই সূচিত করে। বস্তুতঃ সব ভাবেই ভগবান মধুর। সাধকগণ নিজের নিজের ইষ্টতত্ত্বে নিষ্ঠিত থাকিয়া

বহুভাবে বিশিষ্ট বিশিষ্ট সাধনার মিষ্টত্ব আস্বাদন করিয়া থাকেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি মধুরের শেষ নাই। নিজেদের সাম্প্রদায়িক সংস্কারের বশে যাহারা ভগবানকে বেড়ি পরাইয়া মন্দিরে মসজিদে বাঁধিয়া রাখিতে চাহেন, ভগবদনুভূতির পাঠশালায় তাঁহাদের নিতান্ত প্রাথমিক শিক্ষা, এমন কি বর্ণপরিচয় পর্য্যন্ত হয় নাই বলা চলে। ভগবান্ অনন্ত রস, অনন্ত রূপ এবং অনন্ত সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্যের আধার। আমাদের বুদ্ধি ও অহঙ্কারের তলায় তলায় যদি একবার তাঁহার কৃপার সাড়া মিলে তবে রূপ-রস-বৈচিত্র্যের খেলায় মন ডুবিয়া যায়—"নিষ্ঠা হৈতে উপজয়ে প্রেমের তরঙ্গ।" এ অবস্থায় সগুণ, নির্গুণ, সাকার, নিরাকার প্রভৃতি আমাদের যে সব ধারণা সেগুলি বিলীন হইয়া এক সুমহান্ সত্য নানা রসের বিভঙ্গিতে চিত্তে দৃপ্ত হইয়া ফুটে। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র নিরাকারের সাধনা করিতেন; কিন্তু মায়ের লক্ষ্মী সরস্বতীর চিন্মূর্ত্তির অনুভূতি তাঁহার পক্ষে সেই সাধনার বলেই সত্য হইয়া উঠিয়াছিল। ভগবদনুভূতি যাঁহাদের পক্ষে দৃঢ় হইয়াছে তাঁহারা বহু ভাবে, বহু রূপে বিভিন্ন সাধনার পথে এইরূপ রস-বৈচিত্র্য আস্বাদন করিয়া থাকেন। ভগবানের কোন রূপ ভালো, কোন রূপ মন্দ এ বিচার তাঁহাদের মধ্যে আসে না, আসিলেও সে রস-বৈচিত্র্যের পার তাঁহারা পান না। বিভিন্ন সাধনার পথে অনুভূত সত্য তাঁহাদের দৃষ্টিতে উন্মুক্ত হইয়া তাঁহাদের বিচারবুদ্ধিকে প্রভাবিত করে। বস্তুতঃ জড় মনের ক্ষেত্রেই ভগবানের লীলা-রস-বৈচিত্র্যে ভেদের অনুভূতি এবং তৎসম্বন্ধে বিশিষ্ট সংস্কার কাজ করিয়া থাকে। কিন্তু এসব সংস্কার লয় করিয়া দিয়া তাঁহার উদয়—সর্ব্বভাবেই সেখানে তাঁহার জয় দিতে হয়। "দেহ, দেহী, নাম, নামী কৃষ্ণে নাহি ভেদ, জীবের ধর্ম্ম নাম, দেহ স্বরূপে বিভেদ"।

বৈষ্ণবের কৃষ্ণতত্ত্ব মধুর এবং সকল রসের মর্ম্মে, প্রাণ কর্ম্মে ও দান ধর্ম্মে প্রচুর। শ্রীকৃষ্ণতত্ত্বে অমৃতত্ব এতই পরিস্ফূর্ত্ত যে, ইহার সংস্পর্শে গেলেই আমাদের প্রাণ সর্ব্বতোভাবে সাড়া দিয়া উঠে। আমাদের সঙ্গে এ তত্ত্বের সম্বন্ধ এতই সুনিবিড়, স্বাভাবিক এবং সত্য যে সহজ চোখেই এরূপ দেখা যায় এবং মন স্বধর্ম্মেই এ রূপের রসোৎকর্ষ উপলব্ধি করে; বুদ্ধি ঘনিষ্ঠভাবে এই তত্ত্বের অমৃতে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া যায়। ভূত এবং ভবিষ্যৎ দুই দিকের আঁধার এই তত্ত্বের সাধনায় আলোকিত হয়, জন্ম-জন্মান্তর ধরিয়া যাঁহাকে

খুঁজিতেছিলাম অতীতকে উজ্জ্বল করিয়া তিনি আমার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়ান। এইখানে আমাদের সিদ্ধি, তাঁহার সেবাতেই আমাদের বৃদ্ধি, আর কিছু বড় নাই। ঠাকুর নরোত্তমের ভাষায়—'পৃথক্ আয়াসে যোগ, দুঃখময় বিষভোগ, সদা সুখ গোবিন্দ-সেবনে। কৃষ্ণ ভক্তি, কৃষ্ণ নাম সত্য সত্য রসধাম, ব্রজলোক সঙ্গে অনুক্ষণে। সদা সেবি অভিলাষ, হৃদয়ে করি বিশ্বাস, সদাকাল হইয়া নির্ভয়।'

গীতার সাধিভূত, সাধিযজ্ঞ এবং সাধিদৈব সমগ্রভাবে ভগবদুপলব্ধির ইহাই তাৎপর্য্য। এমন সাধনার পথেই ভগবানকে এইখানেই প্রত্যক্ষ করা সম্ভব হয়। ক্ষর, এই বিশ্ব-প্রকৃতির অন্তরে চরাচরে যিনি সুন্দর, তাঁহাকে অক্ষরতত্ত্বে নিত্যভাবে দেখা যায়। ভূতের ভিতরে যিনি ভূত-ভাবন, এমন সাধনার পথেই তিনি আমাদের ভাবনার বিষয় হইয়া থাকেন এবং কামের মধ্যেই প্রেম প্রমূর্ত্তি লাভ করে। বস্তুতঃ অন্তশ্চক্ষু, অন্তঃদৃষ্টি এ সবই সাধনার প্রকরণ স্বরূপে ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ মাত্র। ভগবানকে আমাদের এই চোখেই দেখা যায়। ইহাই যোগ, অন্য সবই উদ্যোগ।

ফলত পৃথিবী, স্বর্গ, ব্রহ্মলোক, সত্যলোক প্রভৃতি সম্বন্ধে দেশগত বা কালগত পার্থক্য লইয়া আমাদের সে বিচার, নিত্য সত্যের সন্নিকর্ষের অভাবই তাহার কারণ। ভগবানের আত্মসম্বন্ধে আমাদের সব পরোক্ষতা দূর হইয়া যায়। পৃথিবীতে ভগবানকে পাইলে ক্ষিতিতত্ত্বে ভগবৎ-মহিমা পরিস্ফূর্ত্ত হইলে, তবে নিত্যের প্রতিষ্ঠা। এই ভূতত্ত্বেই আমাদের জীবন-মরণ নিহিত রহিয়াছে। এখান হইতেই জীবনকে সংগ্রহ করিয়া লইতে হইবে—দেবলোক পিতৃলোকে নয়, সে জন্য যে প্রতীক্ষা তাহা ভগবানকে পাওয়ার পরিপোষক হইতে পারে না এবং তেমন ফাঁকিবাজীতে সত্যের মুখামুখিও যাওয়া সম্ভব নয়। প্রকৃতপক্ষে যে কোন বস্তুর সাধনাতে সিদ্ধিলাভ করা আমাদের অন্তরের আগ্রহের অপেক্ষা রাখে; অর্থাৎ সে ক্ষেত্রেও প্রাণকে আগাইয়া দেওয়া দরকার এবং ভূত-ভবিষ্যতের বিচার ভুলিয়া যাইতে হয়। সুতরাং নিত্য সত্য স্বরূপ ভগবানকে পাইতে হইলে সত্যের ব্যতিক্রম ঘটিবে, এমন ধারণা আত্মপ্রবঞ্চনা ব্যতীত অন্য কিছুই নয়। ভগবান্‌কে পাইতে হইলে যজ্ঞভূমিতে তাঁহাকে প্রতিষ্ঠিত করিতে হয়। বহ্নিকে পুরোগামী করিতে হয়। প্রাণের আগুনকে আগাইয়া দিতে হয় এবং ভূত-ভবিষ্যতের বিচার সে ক্ষেত্রে গৌণ হইয়া পড়ে।

এইভাবে যজ্ঞাগ্নির আলোকে ভূলোক ও দ্যুলোকও পুলকময় হইয়া উঠে, অর্থাৎ বিভিন্ন তত্ত্ব পরম প্রত্যক্ষতার বলে একই সত্যে উজ্জ্বলতা পায়। ফলত ভগবদ্‌সাধনার ক্ষেত্রে দেবলোক, পিতৃলোক এগুলির কোন স্বতন্ত্র সত্তা উপলব্ধি হয় না। প্রাণের মূলে এগুলির উপাদানেরও প্রজ্ঞানময় সন্ধান আমরা পাই না। একই লীলা সব লোক আলোকিত করিয়া খেলিতে থাকে। এইভাবে ভগবৎ-তত্ত্বের ভিতর দিয়াই আমাদের মনের মূলে নিহিত কামনা ও বাসনা সার্থকতা লাভ করে। ঠাকুর নরোত্তমের ভাষায়— "দেবলোক, পিতৃলোক, পায় তারা নানা সুখ, সাধু সাধু বলে সর্ব্বজন। যুগল ভজয়ে যারা সদানন্দে ডুবে তারা, তাদের নিছনি ত্রিভুবন।" কৃষ্ণ-তত্ত্ব ভূলোককেও দিব্য রসে দীপ্ত করে ইহাই বরণীয় ভর্গত্ব। দেহ, মন ও বুদ্ধিকে চিন্ময় রসে সঞ্জীবিত করিয়া এ সাধনা জীবনকে সত্য করে, ইহাই অমৃত। 'কৃষি ভূ বাচক শব্দ, ণশ্চ নিবৃত্তি বাচকঃ'; এই দুইয়ের ঐক্যই কৃষ্ণ শব্দের প্রতিপাদ্য। বস্তুতঃ নিবৃত্তি শব্দে না থাকা বুঝায় না, না পাওয়া বুঝায় না; প্রত্যুত একান্তভাবে পাওয়াই বুঝায়। অভাবের বোধ না থাকে এমন অব্যবহিত উপপত্তিই নিবৃত্তি শব্দের প্রকৃত অর্থ। কৃষ্ণকে পাইতে হইলে এই দেহেই তাঁহাকে পাইতে হইবে;"দেহ ত্যাগে কৃষ্ণ না পাই," কৃষ্ণকে পাইবে এই পৃথিবীতে। বস্তুতঃ দেবলোক এবং পিতৃলোকের যাঁহারা অধিবাসী তাঁহাদিগকেও মর্ত্ত্যে আসিয়া মর্ত্ত্য-জীবনকে অমৃতে অভিষিক্ত করিয়া কৃষ্ণকে পাইতে হয়, অন্য উপায় নাই। এইভাবে পূর্ণ-স্বরূপে ভগবানের রূপে রসে ডুব দিতে পারিলে তবে আমাদের নিবৃত্তি ঘটিবে, নতুবা শান্তি নাই, মৃত্যুকে অতিক্রম করিবারও অন্য পথ নাই। আশার কথা এই যে, পূর্ণব্রহ্ম স্বরূপ এই কৃষ্ণকে পাইবার অধিকার আমাদের আছে এবং এই জীবনে তাঁহাকে পাওয়াও যায়। এ দেশের সাধকগণ আমাদিগকে এমন অভয় বাণী উদাত্ত কণ্ঠে এবং অভ্রান্ত ভাষাতেই শুনাইয়াছেন; স্মরণই সে সাধনা। বাঙলাদেশের সাধনা কৃষ্ণ নামের এই স্মরণার্হতাকে অগ্নিময় অবদানে উজ্জীবিত করিয়া তুলিয়াছে। কালোরূপের আলোকে ভূলোক, দ্যুলোক উজ্জ্বল করিয়া সে সাধনা চিদানন্দভূমির সহিত আমাদের নিত্য সম্বন্ধ স্থাপন করিয়াছে। যুগে যুগে এই বস্তুই সাধ্য ছিল। আমাদের এ পুণ্যভূমিতে এ যুগে তাহা শ্রীগৌরাঙ্গে কৃষ্ণবর্ণ লইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। সুতরাং 'সার্থক জনম আমার জন্মেছি এই দেশে।'

কহ কহ সুমধুর ভাষ

ভগবানকে চাক্ষুষ দেখা সিদ্ধান্তমূলক ব্যাপার নয়, অর্থাৎ জগৎ দেখিয়া এই জগতের নিশ্চয়ই একজন স্রষ্টা আছেন, এইরূপ অনুমান মাত্র নহে। সত্যই তাঁহাকে দেখিবার জন্য যাঁহার প্রাণে টান জাগে, তিনি কোন ক্রমেই অনুমান মাত্রে সন্তুষ্ট হইতে পারেন না। তাঁহার প্রাণের আগুন জড় বিচারকে দগ্ধ করিয়া ক্রমেই শিখা বিস্তার করিতে থাকে। সেই পরম দাহনে সাধক ভগবানকে প্রত্যক্ষ করেন, তবে তাহার নিবৃত্তি। প্রকৃতপক্ষে তাঁহাকে দেখিবার জন্য প্রাণের এই যে টান, ইহাও ভগবানের দান হইতেই উপলব্ধি হইয়া থাকে। কারণ বাহিরের কোন জিনিষই ভগবানকে দেখাইতে পারে না। লণ্ঠনের সাহায্যে সূর্য্যের আলো দেখা যায় না। প্রত্যুত সূর্য্য নিজের আলোকেই জগৎ উদ্ভাসিত করিয়া থাকেন। এই সত্যকে অন্তরে একান্তভাবে উপলব্ধি করিয়াই বাঙলার সাধক বলিয়াছেন – "আমি মেলুম না নয়ন যদি না দেখি তারে প্রথম চাওনে" "কমল মেলে কি আঁখি, তারে সঙ্গে না দেখি, যদি রবি এসে না দেয় সাড়া রাতের শয়নে ?" সাধক বলেন, সূর্য্য উঠিলে কমল ফুটিয়াছিল, এ কথা সত্য নয়। কমল যখন রাত্রির অন্ধকারে তাহার কোমল পল্লবদল নিমীলন করিয়া শায়িত ছিল, সূর্য্য তাহার নিকট গিয়া তরুণ অরুণের কোমল স্পর্শ দিয়া তাহাকে ডাকিয়াছে —'কমলিনী মেল গো, আঁখি, ঘুম তোর ভাঙ্গিবে না কি' ? সেই একান্ত আপন এবং গোপন স্পর্শের মূলীভূত প্রাণরস কমলকে জাগাইয়াছে, সূর্য্যকে খোলা চোখে দর্শনের শক্তি তাহাকে দিয়াছে, নতুবা পেলব তাহার নয়নপল্লবে সহস্রাংশুর জ্যোতিঃ সে সহ্য করিতে পারিত না। ভগবদ্দর্শনও এইরূপ। ভগবানের এত ঐশ্বর্য্য, তাঁহার বিভূতি এমনই অপরিসীম যে, আমরা কিছুতেই সাধনভজনের সাহায্যে তাঁহাকে দেখিতে পারি না। তিনি যাঁহাকে বরণ করেন, সেই তাঁহাকে দেখিতে পায় এবং এইভাবে বরণ করিবার সময় ভগবানকে আমাদের একান্ত আপন হইতে হয়, তাঁহার বিভূতি তাঁহার ঐশ্বর্য্যকে মাধুর্য্যে মাখাইয়া লইতে হয়। বস্তুতঃ ইহাতে তাহার বিভূতি বা ঐশ্বর্য্যের হানি কিছুই হয় না। "অনন্ত

ব্রহ্মাণ্ড, অনন্ত অবতার, অনন্ত ঐশ্বর্য্য ইঁহো সবার আধার” যিনি, আমাদের মত নগণ্য পৃথিবীর সামান্য জীবের কাছে তিনি তাহার রাজৈশ্বর্য্য ব্যক্ত করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া থাকিবেন ইহা শুনিলেও হাসি পায়।

প্রকৃতপক্ষে তিনি আমাদের প্রাণের প্রাণ। তিনি সর্ব্বাবস্থায় সকল সময়েই আমাদের সঙ্গেই আছেন। আমরা মোহ-রাত্রির বুকে নিদ্রায় নিমগ্ন আছি, কিন্তু তাই বলিয়া তিনি দূরে সরিয়া যান নাই। জননী যেমন নিদ্রামগ্ন শিশুকে সতত জাগ্রত তাহার স্নেহদৃষ্টি সঞ্চালনে তোষণ ও পোষণ করিয়া থাকেন, ভগবান্‌ও সেইরূপ তাঁহার স্নেহধারায় আমাদের প্রাণকে সিক্ত করিয়া আমাদিগকে সুখে সঞ্জীবিত রাখিয়াছেন। শুধু তাহাই নয়। আমরা এই যে মোহ-নিদ্রায় নিদ্রিত আছি, এই নিদ্রাও তাঁহারই আনন্দ-লীলা। আমাদের প্রাণ-ধর্ম্মকে দীপ্ত করিয়া তুলিবার জন্য অপূর্ব্ব তাঁহার প্রেমের এই চাতুর্য্য, আমাদিগকে অখণ্ড এবং অনন্তভাবে আত্মমাধুর্য্য আস্বাদন করাইবার উদ্দেশ্যেই তাঁহার এই ছল বা কৌশল। তাঁহার রূপ আমরা নয়ন মেলিয়া দেখিব, তাঁহার রসের কূপে আমবা ডুব দিব, আমাদের প্রাণকেন্দ্রে সেই সম্বন্ধেব ছন্দটি জাগাইয়া তুলিয়া আমাদের স্বরূপগত শক্তিকে সত্যভাবে উন্মুক্ত করিবার জন্যই তিনি এমন লীলায় প্রবৃত্ত রহিয়াছেন। বস্তুত তাঁহার সেবার আনন্দ আমাদের জীবনে সার্থক করিবার উদ্দেশ্যেই তাঁহার প্রেমের এই বৈভব-বিস্তার। আমরা নিজেরা অজ্ঞান, তাই আমরা ইহাকে অন্ধকার বলিতেছি। তাই আমবা এই বিশ্ব-জগৎকে ছাড়িয়া বিশ্বেশ্বরের কল্পনা করিতেছি। গুণত্রয়কে আমবা বন্ধন বলিয়া মনে কবিতেছি এবং সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ এই ত্রিগুণের বন্ধন কাটিয়া ফেলিবার জন্য আমরা ঢাল-তলোয়ার বাহির করিতেছি। বাস্তবিকপক্ষে এ বন্ধন কাটাইবার সামর্থ্য কাহারও নাই, কারণ এ যে প্রেমেরই বন্ধন। ধ্বংসের কারণ ঘটিলেও ধ্বংস হয় না, প্রেমেব এমনই ধর্ম্ম। বস্তুতঃ এ বন্ধনকে বন্ধন বলিয়া বুঝিলে কিছুতেই ইহাকে কাটানো যায় না, যাইতেও পারে না—তিনি বন্ধনকারী নহেন, তিনি আমাদের বন্ধু। প্রকৃত প্রস্তাবে এই গুণত্রয়কে বন্ধনস্বরূপে না দেখিয়া তাঁহার বন্ধুতা বলিয়া বুঝিলে তবে ঠিক বোঝা হইল, এবং প্রকৃত বন্ধন হইতে মুক্তি তখনই সম্ভব। ভাগবতে দেখিতে পাই, দক্ষ-প্রজাপতি এই সত্য উপলব্ধি করিয়াই বলিলেন, গুণতত্ত্ব এই বুদ্ধির দ্বারা ভগবানের অপরূপ রূপের মাধুরী

প্রত্যক্ষ করা যায় না। তাঁহার রূপ আমরা নিজেরা কোথায়ও গিয়া দেখিতে পারি না, তিনি নিজে আসিয়া যাচিয়া সাধিয়া আমাদের কাছে দেখা দেন। তাঁহার রূপের বিশিষ্ট ঔদার্য্য এবং তাহার মিষ্টত্ব বা মাধুর্য্যই যে এইখানে। এইজন্যই তিনি গুণত্রয় বিস্তার করিতে বাধ্য হইয়াছেন। গুণত্রয়ের ভিতব দিয়া বেদনায় বেদনায় সাধনা করিয়া আমাদের মধ্যে তাঁহার আত্ম-ভাবনাকে তিনি সঞ্চার করিতেছেন। তিনি নিজে আসিয়া আমাদের কাছে দেখা দিবেন এই যে তাঁহার ইচ্ছা। ইচ্ছাময় তিনি। তাঁহার নিজের রূপ, তাঁহাব নিজের জন্য নয়, আমাদেরই জন্য, আমাদেরই জন্য তাঁহার যত কিছু সাজ-সজ্জা। এই গুণের বন্ধন-না থাকিলে আমরা কেমন করিয়া তাঁহার প্রেমময় রূপমাধুরী পূর্ণভাবে আস্বাদন করিতে সমর্থ হইতাম? স্বরূপতঃ তিনি সগুণ, আত্মসম্বন্ধে তাঁহার সগুণ এই স্বরূপে ডুব দিয়া আমাদেব নির্গুণত্বের অনুভূতি—স্বরূপধর্ম্মের স্ফূর্ত্তি।

এ সবই সত্য; কিন্তু তাই বলিয়া যেগুলি আমরা আমাদের পক্ষে বন্ধন বলিয়া বুঝিতেছি, সেগুলিকে ভালো মনে করিয়া বসিয়া থাকিলে চলিবে না। ভগবানের বন্ধুত্বের ভাবটি আমাদের হৃদয়ে একান্তভাবে উপলব্ধি করিতে হইবে। দক্ষ প্রজাপতিও সে কথাই বলিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন, ভগবান্ সখা-স্বরূপে আমাদেরই হৃদয়ে সম্যকভাবে বাস করিতেছেন; তবু আমরা তাঁহার সখ্য উপলব্ধি করিতে পারি না। যে পথে তাঁহার এই সখ্য-সম্পর্কে আমাদের সংবেদন ঘটে, তাহাই প্রকৃতপক্ষে সাধনা। সদা সতর্কভাবে মুখে সৌজন্যের হাসি মাখাইয়া নিতান্ত নিরীহ ভাল মানুষটি সাজিয়া, কথার প্যাঁচ খেলাইয়া কাজ বাগানোর ব্যবসা ব্রজভূমির বাজারে অচল।

ফলতঃ ভগবানের বিশ্বরূপের কথা আমরা অনেকেই শুনিয়াছি। গীতায় আমরা অনেকে অন্ততঃ আক্ষরিক ভাবেও তাহা পাঠ করিয়াছি। ভাগবতে এ তত্ত্ব অনেক রকমে বিবৃত করা হইয়াছে, অন্যান্য পুরাণেও আছে; কিন্তু তথাপি জগতের জড় বিচাবের সংস্কারকে ছাড়াইয়া আমরা ভগবানের বিশ্বরূপকে চোখ জুড়িয়া মাখিয়া লইতে পারি না; সে রূপের আত্মময় অনুধ্যান আমাদের পক্ষে লাভ করা সম্ভব নয়। প্রকৃতপক্ষে এইটুকু জড়, এই-টুকু চিৎ, এইটুকু সৎ এইটুকু অসৎ—এই যে আত্মানাত্ম বিচার, দেহাত্মবোধ বিলীন না হওয়া পর্য্যন্ত এইরূপ ভেদজ্ঞান থাকিবেই। এ :অবস্থায়

অসংমূঢ়ভাবে তাঁহাকে উপলব্ধি করা যায় না। প্রকৃতপ্রস্তাবে এ অবস্থায় আত্মভাবে আমরা ভগবান্‌কে পাই না। আমাদের হৃদয়ে সেই পরম চেতনার যোগময়, ভোগময়, সকল কম্পনা, সকল বাসনা লয় করিবার মত তাঁহার উদয় ঘটে না। আমাদের প্রাণের বাতিতে সে রূপের আরতি আরম্ভ হয় না। ফলতঃ আমাদের মনের একান্ত গহনে, সেই বিজনে ভগবানের সঙ্গে ভাবের বিনিময় যদি না ঘটে, তিনি যদি আমাদের অন্তরের গোপন কথাটি সেখানে ব্যক্ত না করেন, তাহা হইলে বিশ্ব-প্রকৃতিতেও তাঁহার সর্ব্বতোদীপ্ত প্রভাব আমরা উপলব্ধি করিতে পারি না। অন্তরের একান্ত নিভৃতে সেই দেবতার সঙ্কেতে নীত হইয়া, গুপ্তভাবে ব্যক্ত হইয়া মাধুর্য্য-লীলায় নিমগ্ন হইয়া এবং সেই রস-তাৎপর্য্য আমাদের চিত্তকে সরস করিয়াই বাহিরে নয়নে নয়নে আমরা তাঁহাকে দর্শন করিতে পারি। আমাদের মনের কোণে দেবতার সে গোপন কথাটি শুনিবার জন্য অমরা সতত উৎকর্ণ রহিয়াছি। যে কথায় তাঁহার ভাবের আস্বাদনে ব্যথা আমরা জন্মজন্মান্তর ধরিয়া বহন করিতেছি, সে কথাটি শুনিবার অব্যয় অপেক্ষায় দুরন্ত দুঃখের বেদনা বুকে চাপিয়া লইয়া আমরা তাকাইয়া আছি। কিন্তু কথাটি শুনিয়াছি কি? ভগবৎ-সাধনার ইহাই রহস্য।

সাধনার রাজ্যে অধ্যাত্ম আলোকের উন্মেষ এইখানেই এবং এইখানেই ভূত জগতে ভাবের উদ্ভবকর ভগবানের বিসর্গ বা আপনাকে উৎসর্গ করিবার উদার লীলা। ভগবানের এই দান-লীলায় নিজে একান্ত ভাবে না মজিলে বিশ্বভুবনে তাঁহার ভাবের খেলা প্রত্যক্ষ হয় না। ফলতঃ বিশ্বরাজ নিজে আমাদের জন্য অনন্ত সাজে সাজিয়া আসিতেছেন, ইহা না দেখিলে, না বুঝিলে আমাদের দেহ-মন জুড়িয়া সর্ব্বতোভাবে আমরা তাঁহাকে জড়াইয়া ধরিতে পারি না। সুতরাং ভগবান ভূত-ভাবন, কেবল ইহা বিচারের দ্বারা বুঝিলেই হইবে না। তিনি ভূতভাবন হইয়াও আমাদের জন্য ভাবিতেছেন, তাঁহার ভাবিত এই যে লীলা, ইহাকে চিত্তে সংস্থিত করিতে পারিলে তবেই এই ভব বা সংসার ভাবময় হইয়া উঠে এবং অভাবের সম্বন্ধে কোন প্রতীতি আমাদের থাকে না। বস্তুতঃ দেহ-স্মৃতি, দেহের জন্য ভীতি সেই অভাবেরই প্রতীতি মাত্র। ভাগবতে ভগবান্ শঙ্কর এই তত্ত্বটি স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন,—"ভক্তেষু অলং ভাবিত-ভূতভাবনং ভবাপহং" ভগবানের ভূতভাবন স্বরূপ ভক্তের

কাছে বিভিন্ন ভাবকে অপরিচ্ছিন্ন লাবণ্যে উদ্ভিন্ন করিয়া প্রকটিত হয় এবং এমনই উদার লীলায় তিনি তাঁহার ভববন্ধন-হরণকারী 'হরি'রূপে জাগেন।

বস্তুতঃ আমাদের যত কিছু প্রাণক্রিয়া ভগবান্‌কে অবলম্বন করিয়াই চলিতেছে এবং আমাদের সব কামনা, সব বাসনা ও সকল সাধনার ভিতর দিয়া আমরা তাঁহারই সন্ধান করিতেছি। ইহাও সত্য যে, তাঁহার দানের অনুভূতি, তাঁহার ভাবের স্বীকৃতি আমাদের পক্ষে স্বাভাবিক না রইলে তাঁহার সম্বন্ধে আমাদের মধ্যে এই সন্ধানবৃত্তি সচেতন হইত না। "সর্ব্বদেহে ধাতুরূপে বৈসে কৃষ্ণশক্তি তাঁহারেই করি স্নেহ, তাঁহারেই ভক্তি" স্বয়ং মহাপ্রভুর এই কথা; কথাটি বুঝিতে হয়ত কিছু কঠিন হইবে, সুতরাং সহজভাবে বলিবার চেষ্টা করা যাইতেছে। প্রকৃতপক্ষে আমরা যখন কোন বস্তু বা বিষয়ের সম্পর্কে যাইতেছি অর্থাৎ তাহার ভাবটিকে গ্রহণ করিতেছি, তখন ভগবানেরই প্রভাবে আমাদের মন, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয় পরিচালিত হইতেছে। তিনি হৃদয়ে থাকিয়া আমাদিগকে চালাইতেছেন। সকল ভাবের মূলেই তাপ থাকে; আবার এই তাপই প্রাণশক্তির মূলে রহিয়াছে। এই তাপ আবার বাক্ বা বচন হইতে উদ্ভূত হয়। এই হিসাবে বাক্‌কে তত্ত্বদর্শীরা অগ্নি বলিয়া অনেক ক্ষেত্রে অভিহিত করিয়াছেন। উপনিষদে আছে—"তস্য এষা দৃষ্টির্যত্রৈতদস্মিন্ শরীরে সংস্পর্শেন উষ্ণিমানং বিজানাতি।" এই শরীরের সংস্পর্শে যে উষ্ণতা জানা যায়, সেই উষ্ণতার দ্বারাই তিনি রহিয়াছেন বলিয়া পরিদৃষ্ট হন। কিন্তু ইহাও অনেকটা অনুমান হইল এবং সিদ্ধান্তেই দাঁড়াইল; এতদ্দ্বারা ভগবানকে চাক্ষুষ করা গেল না। এ প্রশ্নের উত্তর এই যে, ভগবান আমাদের হৃদয়ে থাকিয়া যে বচন আমাদিগকে শ্রবণ করাইতেছেন এবং যাহার রসে আমাদের প্রাণের গতি অবশভাবে চলিতেছে, সেই বচনের অন্তর্নিহিত দহন বা বেদনাকে আমরা সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করিতে পারিতেছি না। তাঁহার বচনের ভিতর আমাদের জন্য তাঁহার যে উৎসর্গ বা যজ্ঞলীলাটি চলিতেছে তাহার জ্বালা আমাদের মন, বুদ্ধি ও দেহে অগ্নিময় তরঙ্গ তুলিতে পারিতেছে না। সাক্ষাৎ সম্পর্কে আমাদের জন্য তাপের ভাবমূর্ত্তি লইয়া তিনি যখন আমাদের হৃদয়কে সর্ব্বতোভাবে ব্যাপ্ত করিয়া দীপ্ত হন, তখন সোজাসুজি সর্ব্বত্র তাঁহাকেই দেখা যায়।

গীতায় শ্রীভগবান্ অনুস্মরণের সাহায্যে তাঁহাকে সাধিভূত, সাধিযজ্ঞ এবং সাধিদৈব, এই সমগ্রভাবে উপলব্ধি করিয়া মৃত্যুকে অতিক্রম করিবার যে নির্দ্দেশ প্রদত্ত করিলেন, সে সাধনার মর্ম্ম এইখানে নিহিত রহিয়াছে। বাস্তবিকপক্ষে শ্রুতিকে অবলম্বন করিয়াই স্মৃতি জাগে এবং স্মৃতি দীপ্ত হইয়া উঠিলে তবে অনুগতি সম্ভব হয়। গীতার উপসংহার ভাগে আমরা দেখিতে পাই ভগবান্ অর্জ্জুনকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন, অর্জ্জুন, তুমি একাগ্রচিত্তে আমার কথা শ্রবণ করিয়াছ তো? এখন তোমার অজ্ঞানজনিত মোহ দূর হইয়াছে নিশ্চয়ই! অর্জ্জুনও উত্তরে বলিতেছেন,—তোমার অনুগ্রহে আমার মোহ দূর হইয়াছে। আমি স্মৃতি লাভ করিয়াছি, এখন আর দ্বিধা নাই, তুমি যাহা বলিবে তাহাই করিব, ইহাই অনুগতি। সর্ব্বভাবে তাঁহাকে স্বীকার। ভগবানের আদেশ অনুসারেই আমরা চলিতেছি, তাঁহার আজ্ঞা কেহই লঙ্ঘন করিতে পারেন না; কিন্তু আমাদের প্রজ্ঞা নাই, অর্থাৎ সে আজ্ঞা বা আদেশের সঙ্গে আমাদের জন্য যে বেদনা তিনি বহন করিয়া আনিতেছেন, আমাদের চিত্তবৃত্তিতে তাহার স্ফুরণ হইতেছে না। বস্তুতঃ ভগবানের আজ্ঞা আমাদের এ জগতের মাষ্টার-মনিবের মত আজ্ঞা নয়। ভগবানে এমন অনাত্মতা নাই, সকলই তাঁহার আপনার। আমাদের উপর প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা করিবার প্রশ্নই তাঁহার কাছে উঠে না। সেখানকার সব সম্বন্ধ শুধু দেওয়ার, কিছু চাইবার নাই। ভক্তপ্রবর প্রহ্লাদ এই ভগবৎ-স্বরূপ ব্যক্ত করিয়াই বলিলেন—"যে ব্যক্তি প্রভুর নিকট নিজের কল্যাণ বা সুখ প্রার্থনা করে, সে ভৃত্য নহে, আর যে প্রভু ভৃত্যের নিকট নিজের প্রভুত্ব ইচ্ছা করিয়া তবে তাহাকে তাহার আকাঙ্ক্ষিত বিষয় প্রদান করেন, তিনিও স্বামী নহেন।"

এ সব তো হইল; কিন্তু তবুও মনে হয়, কিছুই বলা হইল না। সাধকেরা ভগবানের কথা শুনিতে পান, আমরা এমন কথা শুনিয়াছি। তাঁহারা ভগবানের আদেশের প্রতীক্ষা করেন, ইহাও আমরা দেখিয়াছি, কিন্তু ব্যাপারটা যে কি আমরা কিছুই বুঝিতে পারি না। আমরা অনেকে তাঁহাদের এই ধরণের উক্তিকে উপহাস করিয়া থাকি। আমাদের দোষও নাই। কারণ, আমরা সে রাজ্যের খবর রাখি না, সেখানকার ব্যাকরণের প্রকরণ আমরা বুঝি না। সেখানকার ভাষা নীরব ভাষা—সে ঘেঁসামেশা বচনের

ভিতর দিয়া ভগবানের প্রাণেন্দ্রিয়-মনোময় সাক্ষাৎ সংস্পর্শে সব বুঝা হইয়া যায়। আর প্রশ্ন করিবার কিছুই থাকে না, ভগবানের এমনই চিন্ময় সন্নিকর্ষ তাঁহার বচনে। এমন বচনের প্রজ্ঞানেই সাধক সেখানে বৈয়াকরণ। "গৌরেষা ভবতো বাণী"—'গো' শব্দের বৈদিক অর্থ ভগবানের বাণী, আবার 'গো' শব্দের অর্থ ইন্দ্রিয়। ভগবানের বাণীতে তাঁহার চিন্ময় ইন্দ্রিয়ের স্পর্শই মনের মূলে প্রতিফলিত হয়, এসব কথা পরে বিস্তার করিতে চেষ্টা করা যাইবে। প্রত্যুত এমন ঘেঁসাঘেসি মেশামেশি ভাবে কথার যে অনাময় ঝঙ্কার সাধারণ জগতে তেমন কথা আমরা শুনি না, কথার সকল আলো করা সে লীলা আমরা দেখি না। আমাদের অন্তরে ভগবানের কথা অব্যক্তই রহিয়া যাইতেছে। পূর্ব্ব জন্মের সুকৃতির বলে শরণাগতির কৌশল যাঁহারা অবগত আছেন, তাঁহারাই ভগবানের কথা শুনিতে পান। নিজকে নিঃশেষে দান করাই যে কথার ধর্ম্ম, দানের সম্বন্ধে জ্ঞান না হইলে, দানের পথে মনোরথ না জাগিলে সে কথায় কান যাইবে কেন?

বস্তুতঃ ভগবদনুভূতিকে বিশ্লেষণ করিলে প্রথমেই ধরা পড়ে বাক্। এই বাক্ বলিতে বচনই বলুন, আগুনই বলুন, আর ইন্দ্রিয়ই বলুন, একই কথা, বচন হইতে তাপ, তাপ হইতে ভাব অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে ছন্দোময় আত্মসম্বন্ধ বা রূপ। এই তিনটিতে অন্বিত অর্থের যে অনুভূতি তাহা অনির্ব্বচনীয়। প্রকৃত-পক্ষে ভগবানের বচন আগুন মাখানো, কারণ, সেই বচনের ভিতর দিয়াই তিনি নিজে যজ্ঞেশ্বররূপে জাগিতেছেন, নিজকে বিকাইয়া দিতেছেন, আর সেই বচনকে তাঁহার দেহই বলিতে হয়। কারণ তাঁহার নিজকে উৎসর্গ করা, তাহা দেহ ছাড়া নয়। নিজের দেহটিকে ফাঁকে রাখিয়া বাক্-বিসর্গ করা তাঁহার পক্ষে সম্ভব নহে। তিনি তো কুলী-মজুর খাটাইয়া ফিরেন না। প্রত্যুত তাঁহার দান পূর্ণেরই দান। বস্তুতঃ ভগবৎ-বিগ্রহ এই যজ্ঞের পথেই প্রদীপ্ত হইয়া উঠে এবং ভগবান্ ভূতপ্রকৃতিকে আলো করিয়া চরাচরে জাগ্রত হন। ভগবানের এই দেহদানের লীলারসে নিমগ্ন হইয়া সাধক সমগ্র বিশ্ব-সম্পর্কে ভগবানের চিন্ময় বপু, তাঁহার লীলা প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন। এ অবস্থায় সর্ব্বত্র তাঁহার যজ্ঞমূর্ত্তিই অর্থাৎ প্রেম-প্রভাবিত লীলা সাধকের চোখে পড়ে। গাছ, লতা, পাতা প্রভৃতি এই যে জড় জগৎ ইহা আর উপলব্ধি হয় না। আমাদের জন্যই ভাব মূর্ত্তিতে ভগবান্ বিকশিত হইয়া উঠিতেছেন; তিনি

আমাদিগকে ডাকিয়া কথা বলিতেছেন, প্রত্যুত আমাদের কাছে তিনি দেহ লইয়া ধরা দিতেছেন, এই সত্য প্রত্যক্ষ হয়। রঘুনাথ-দাস-গোস্বামী প্রভুর মতে এই জগৎই তখন ভগবানের উরুসত্র হইয়া দাঁড়ায় এবং বার্ত্তামৃতে অন্য কথায় নাম-প্রেমের রসে* সব মধুর করিয়া তিনি দাতা সাজিয়া এখানে দেখা দেন। এ অবস্থায় সাধকের কাছে যতভাবে যাহা কিছু উপলব্ধি সবই ভগবানের বচনে পরিণত হয়, সবই তাঁহার ভাবে এবং তাঁহাকেই লাভে পর্য্যবসিত হইয়া থাকে। দেবীসূক্তে তাই দেখিতে পাই, মা বলিতেছেন, আমিই তোমাদিগকে খাওয়াই, আমিই পরাই, আমি তোমাদিগকে নানাভাবে সাজাই যাহা কিছু দেখিতেছ সবই আমি—যত আমার বচন তোমাদিগকেই আমার আপ্যায়ন। তোমরা একবার শ্রদ্ধাযুক্ত হও, আমি তোমাদিগকে আমার কথা শুনাইব। এতভাবে আমি তোমাদের কাছে ধরা দিতেছি বুকে রাখিয়া, মুখে মুখ দিয়া এত কথা তোমাদিগকে বলিতেছি, তোমরা শুনিতেছ না। বিশ্বপ্রসবিনী আমি। যাহাদিগকে তোমরা বড় বলিয়া বুঝিয়া রাখিয়াছ, সেই ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরকেও আমি প্রসব করিয়াছি। সেই সমস্ত সন্তানের বেদনা লইয়াই আমি তোমাদের ভিতরেও রহিয়াছি। আমার সে বেদনা তোমাদের মনে লাগিতেছে না, তাহাতে তোমরা এমন কষ্ট পাইতেছ, এমন অনিষ্ট দেখিতেছ।

কিন্তু এই যে ভগবদনুভূতি আমাদের জড় মনের সঙ্গে ভগবানের এই যে নিত্য বেদনা ইহাকে প্রায় জড়াইয়া লওয়া, তাঁহার কথার ভিতর দিয়া ব্যথাকে উপলব্ধি করা, ইহা সহজ নয়। শ্রীভগবান্ উদ্ধবের কাছে নিজেই বলিয়াছেন,—উদ্ধব, আমি সকল সময়ই তোমাদের অন্তরে থাকিয়া কথা বলিতেছি, কিন্তু সেই কথার ভিতর দিয়া আমার যে ব্যথা, তোমাদের প্রাণেন্দ্রিয়-মনোময় আমার যে প্রত্যক্ষ উদয়, তাহা সুদুর্ব্বোধ্য। আমি নিজে আসিয়া তোমাদিগকে যদি বাড়াইয়া না তুলি, কাছে ঘেঁসিয়া মিশাইয়া না লই, তাহা হইলে তোমাদের কাহারও পক্ষে আমার কথা শ্রবণ করা সম্ভব হয় না। এজন্য আমার কথার ব্যক্ত মূর্ত্তি আমাকে পরিগ্রহ করিতে হয়। অন্তরের ব্যথার বাহিরে অভিব্যক্তির যজ্ঞময় চিন্ময় লীলার আশ্রয়ে তোমাদিগকে কোলে জড়াইয়া তুলিতে হয়। এ লীলা আমরা উপলব্ধি

করিতে সমর্থ হইতেছি না। আমাদের এই যে অবস্থা, আমরা ইহাকে বলি বটে জীবন কিন্তু জীবনের প্রকৃত আস্বাদন ইহাতে নাই, আছে মরণেরই আড়ষ্টতা; প্রকৃতপক্ষে আমাদের এ অবস্থা একেবারে 'কোলাপস্'-এরই অবস্থা। এ অবস্থা ভাগবতের ভাষায় 'মূর্চ্ছিতস্য মৃতস্য চ'। আমাদের প্রাণের আগুন অতি ক্ষীণ, দেহ একেবারে ঠাণ্ডা হিম, অচৈতন্য অসাড়। কাহারও প্রাণের খোঁজ আমরা রাখি না, কোথায় যে প্রাণের মর্ম, আমরা বুঝি না। এইভাবে প্রাণের শক্তিতে দুর্ব্বল হইয়া আমাদের দেহ মন একেবারে যেন পাথর হইয়া পড়িয়াছে। কোথাও একবিন্দু প্রাণ দিয়া প্রাণকে আদর করিতে আমাদের ভয় হয়, পাছে আমাদের প্রাণের সামান্য সম্বলটুকু ফুরাইয়া যায়। আমরা এমনই কৃপণ। সুতরাং আমাদের আবার সাধন-ভজন! প্রেম বা ভালবাসা এ সব আমরা কি বুঝিব? পরের দুঃখে কষ্টে বেদনায় আমরা অন্তরে দুঃখ কষ্ট অনুভব করি, এ সবই বাজে কথা। প্রকৃতপক্ষে আমরা তাহাতে আনন্দই পাই। পরের মেয়েটি মরিয়াছে শুনিলে আমাদের প্রাণ কাতর হয় না। পক্ষান্তরে, নিজের মেয়েটি যে ভাল আছে, এতৎসম্বন্ধে সচেতন হইয়া আমরা সুখেই উচ্ছল হইয়া উঠি। আহা, উহু করিয়া আমরা মায়াকান্না কাঁদি। সং সাজিয়া ঢং দেখাই। আমাদের প্রকৃতি এমনই রাক্ষসী এবং আসুরী। আমাদের এ অবস্থার চেয়ে পশুর অবস্থাও বরং ভাল। ঢাকার কবি গোবিন্দদাস বলিয়াছেন—"ক্ষুদ্র পোকা সেও মরে রুদ্র পিপাসায়, জলন্ত আগুনে সেও আলোর মরণ চায়"; কিন্তু আমরা প্রাণের বাতিকে ক্ষীণ করিয়া অন্ধকারে পচিয়া গলিয়া মরিতে বসিয়াছি। এ বাতি জ্বলে কিসে? আমাদের প্রাণের বল কিসে বাড়ে? বাংলার কবি গাহিয়াছেন—"যেদিন তোমার শক্তি হবে, উঠবে ভরে প্রাণ, অনল ভরা সুধা তাঁহার করবি যেদিন পান, বাহিরেতে যাস্ রে ছুটে, পড়বি শুচি ধূলায় লুটে, সকল বাধা মুক্ত হবি, হবি রে স্বাধীন!" বেদ, বেদান্তে এবং বিভিন্ন পুরাণে এই একই কথা বলা হইয়াছে। তোমার বাক্ আমার মনে প্রতিষ্ঠিত কর, আমার মন তোমার বাকে প্রতিষ্ঠিত হোক্, বেদের এই তো প্রার্থনা। মহাভারতে দেখিতে পাই ঋষি সনৎ-সুজাত ধৃতরাষ্ট্রকে বলিতেছেন—"মহারাজ যিনি সহস্রভাব বিস্তার করিয়া দূর হইতে দূরে সরিয়া যাইতেছেন, যতই শক্তিশালী তিনি

হউন না কেন, তাঁহাকে এইখানেই ধরিয়া ফেলা যায়। সাধুমুখে তাঁহার বচনের শ্রবণ মাত্রের অপেক্ষা। তিনি মহাত্মা, পরম দয়াল তিনি। তাঁহার কথা যে কত রসাল কেমন করিয়া বলিব? সে তো কথা নয়, যেন আমাদিগকে আপন করিয়া পাইবার জন্ম আগুনের জ্বালা। আমাদের দেহ-মন-বুদ্ধির সব সংস্কার, সব অহঙ্কার সে জ্বালা দগ্ধ করিয়া ফেলে, এমন তিনি পুরুষ। এ পুরুষকে যে একবার জানিয়াছে, এই পৃথিবীতে এই জড় দেহেও তাহার সর্ব্বার্থ লাভ হয়।" ভাগবতে সনক, সনন্দ, সনাতন প্রভৃতি কুমারগণের কথাতেও এই সত্যটি পরিস্ফুট হইয়াছে। তাঁহারা বলিয়াছেন, "তুমি আমাদের হৃদয়েই সর্ব্বদা রহিয়াছ, কিন্তু আমরা তোমাকে দেখিতে পাইতেছি না, আজ তোমার কথা আমরা শুনিতে পাইয়াছি। এতদিন তোমাকে পরমাত্মা বলিয়া শুধু অনুমানই করিতাম, আজ তোমার কথার ভিতর দিয়া তোমার চিদৈশ্বর্য্যের পরিপূর্ণ বিগ্রহ আমরা প্রত্যক্ষ করিলাম, আমাদের জন্য তোমার যে তাপ, সেই তাপেই তোমার ভাব আমাদের উপলব্ধিতে আসিতেছে। তোমার অঙ্গ-মাধুর্য্য আমাদের সকল অবীর্য্য দগ্ধ করিয়া ফেলিতেছে। এমন নিবিড়ভাবে তোমার সঙ্গ লাভ করিয়া তবে এতদিনে আমাদের ভক্তিযোগ দৃঢ় হইল।" ভাগবতের অন্যত্র মহারাজ পৃথুর প্রতি সনৎকুমারের উপদেশেও এই তত্ত্বের সরস উন্মেষ দেখিতে পাওয়া যায়। মহর্ষি বলিতেছেন—"হে নরেন্দ্র, স্থাবর-জঙ্গম এই ভূতনিচয়, দেহ-ইন্দ্রিয়-বুদ্ধি সকল আলো করিয়া সেই পরম দেবতারই প্রেমের লীলা চলিতেছে। অহঙ্কারে আমরা আচ্ছন্ন রহিয়াছি বলিয়া আমরা তাঁহাকে দেখিতে পাইতেছি না। কিন্তু ক্ষেত্রবিৎকে তপ্তকারী, অন্য কথায় মানুষের মনে তাপ জাগাইবার উপযোগী তাহার একটি মাধুরী আছে। এই মাধুরী উদ্ধবের কাছে শ্রীভগবানের উক্তির যে তাৎপর্য্য উপরে বলা হইল ভক্তি সাধনার তাহাই রহস্য। প্রকৃতপক্ষে ভগবানের কথা নিজে ভগবান্ ছাড়া কেহই বলিতে পারে না। "স্বয়মেবাত্মনাত্মনংবেত্থ ত্বং পুরুষোত্তম!" কারণ তাঁহাকে কে চিনিয়াছে, জানিয়াছে, ষোল আনা বুঝিয়াছে যে তাঁহার কথা বলিবে—তাঁহার পরিচয় দিবে? তিনি নিজের কথা নিজেই বলেন, তাঁহার দানসত্র নিজেই খোলেন। সাক্ষাৎ যজ্ঞপুরুষস্বরূপে তাঁহার এই যে অনুভূতি তাঁহার দানের আগুনে, আমাদের প্রাণকে আকর্ষণ করিয়া আমাদের মনকে

অমৃতধারায় স্নান করাইবার তাঁহার এই যে রীতি, তাঁহার এই যে বিশেষ ক্রীড়া বা বিক্রীড়া ইহাই নাম। এই নামের সুধাধারায় স্নান করিলে তবে ভবক্ষুধা দূর হয় এবং ভবরোগের ইহাই একমাত্র চিকিৎসা। যাঁহারা সে রোগের চিকিৎসক, তাঁহাদের সকলেরই এই একই প্রেসক্রিপসন্। শুকদেব মৃত্যুভয়ে পতিত পরীক্ষিৎকে সম্বোধন করিয়া তাই বলিলেন—"এতন্নির্বিদ্যমানানাম্ ইচ্ছতাং অকুতোভয়ং যোগিনাং নৃপ। নির্নীতং হরেণাম্নুকীর্ত্তনং।" এই ঔষধ সেবন করিলে প্রাণের উষ্ণতা বাহিরের কোন প্রতিকূলতার সংস্পর্শেই আর ঠাণ্ডা হয় না। প্রাণ মহাপ্রাণতার রাজ্যে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া অনন্ত জীবনের প্রাচুর্য্য-রসে পুষ্ট হইয়া উঠে। তখন আর কোন অনিষ্টের ভয় থাকে না, সবই ইষ্ট—সকলই তখন দৃষ্ট, সব অজানা জানা হইয়া যায়। অদৃষ্ট বা নিয়তির অন্ধকারের গতির সব ভীতি সে প্রাণময় জ্যোতিতে নির্ব্বাণ লাভ করে। "বহ্নি মধ্যে স্মরেৎ রূপং মমৈতৎ ধ্যানমঙ্গলং"। বহ্নি মধ্যে তাঁহার ধ্যান-মঙ্গল রূপ জাগিতেছে। সেই আগুনে ঝাঁপ দাও—সব অবীর্য্য দগ্ধ করিয়া ফেল। এই তো ভগবানের নির্দ্দেশ কিন্তু আগে শ্রবণ, বচনের ভিতর আগুনে প্রাণের স্ফুরণ, তবে স্মরণ, তাহার পরে তো দর্শন। প্রাণহীন আমাদের এ জীবন, আমাদের শ্রবণ শবশোভন, এ শ্রবণ দিয়া আমরা ভগবানের বচন শুনিব কেমন করিয়া? বেদ-বেদান্ত শাস্ত্র-পুরাণে ঋষিদের মুখে ভগবানেরই বাণী, কিন্তু সে ধ্বনি আমাদের কানে সোজা ভাবে যায় না। সে সব দেহাত্ম-সম্পর্কজাত কাম-কচায়নেব গহন ভেদ করিয়া' একই প্রাণের দেবতার বেদনাকে আমরা অনুভব করিতে পারি না। তিনি নিজে যদি আসিয়া তাঁহার কথা আমাদিগকে শুনান এবং তাঁহার কথার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের জন্য তাঁহার ব্যাথার আকর্ষণে তিনি আমাদের মনকে গাঁথিয়া তুলিতে পারেন তাঁহার বচনের অন্তগূঢ় উজ্জ্বল রসে যদি আমাদের মর্ত্ত্য সংস্কার বিমূঢ় মনে অনুমিত তাঁহার আচরণ-সম্পর্কিত ভ্রান্তিকে আলো করিতে তিনি সমর্থ হন, সুগভীর ঐক্য সংবেদনে আমাদের মনের মূলকে স্পর্শ করিয়া যদি তিনি বহুরূপে প্রকটিত তাঁহার অবিকারী মাধুরী সর্ব্বতোদীপ্ত করিয়া তুলিতে পারেন, যদি এইরূপে সর্ব্বভাবে তিনি বুঝাইতে পারেন যে তিনি আমাদেরই তবেই আমরা তাঁহার কথা শুনিতে সমর্থ হই এবং তবেই আমাদের পরমার্থ

লাভ হয়। কিন্তু তাঁহার আচরণ স্থূল জগতে আমাদিগকে বঞ্চনা করিতেছে, তাই আমরা মূল ধরিতে পারিতেছি না। তাঁহার বচনের শক্তিই স্থূলের এই ভুল ভাঙ্গিতে পারে। বচনের ভিতর দিয়া আত্মসংবেদনে তিনি যদি আমাদিগকে আপন করিতে পারেন, তবে তাঁহার সম্বন্ধে দোষগুণের বিচার আমাদের থাকে না। সর্ব্বসম্বন্ধে তিনি আমাদের কাছে সুন্দর হইয়া উঠেন। তবেই তিনি আমাদের পক্ষে বরণীয় হন। আমরা তাঁহাকে বরণ করিতে পারি, এমন বেদনাময় তাঁহার ভর্গ বা জ্যোতি কি নাই? আমাদের অন্তরের জ্বালামালার মেখলামণ্ডিত মূর্ত্তি লইয়া আমাদের দৃষ্টিতে জাগিবার উপযোগী সামর্থ্যের অভাব কি সর্ব্বশক্তিমান্ তিনি—তাঁহারও রহিয়াছে, তবে তিনি কেমন বংশীধারী, সর্ব্বসন্তাপহারী কেমন তিনি হরি?

নাম ভজ নাম চিন্ত

বাংলার মহাজন বলিয়াছেন, "অনন্ত কৃষ্ণের নাম, অনন্ত মহিমা, নারদাদি ব্যাসদেব দিতে নারে সীমা।" বাহির হইতে বিচার করিলে একথা অর্থবাদ বলিয়া মনে হইতে পারে ; কিন্তু সাধনার ভিতর দিয়া অনুভূতির রাজ্যে একটু অগ্রসর হইলেই সে ভ্রান্তি দূর হয়। প্রকৃতপক্ষে নাম অর্থই পরিচয়। যেখানে সম্পূর্ণ পরিচয়, সেখানে বিচারের লয় হইয়া যায়। এবং সেই বস্তুটিই আমাদিগকে জয় করিয়া ফেলে, পরোক্ষতা আর কিছুই থাকে না। অবশ্য পরোক্ষ এবং অপরোক্ষতার মধ্যে পার্থক্য বোধ যেখানে মনের মূলে রহিয়াছে, সেখানে বিচারও রহিয়াছে, এইরূপ মনে হইবে। কিন্তু নামের ক্ষেত্রে অপরোক্ষ যিনি দাতারূপে, আত্মারূপেই জাগ্রত তিনি হন, তাহা হইতে আমাদের বিচ্ছিন্নভাবে পৃথক সত্তা কিছু থাকে না। আমরা তাঁহারই ভাবে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া পড়ি। সেই ভাবে যেন আমাদিগকে গ্রাস করিয়া ফেলে এবং তাহার প্রকাশে আমাদের মন ও বুদ্ধি বিলসিত হইতে থাকে। অন্যকথায় আমরা তৎভাব প্রাপ্ত হই। এই অবস্থায় আমাদের কর্তৃত্ববোধ বিলুপ্ত হইয়া যায়, অথচ ভোক্তৃত্ব বোধ বেশ থাকে। নামীর সঙ্গে যোগ, তাঁহাকে আশ্রয় করিয়াই ভোগ। এইজন্যই সাধকেরা বলিয়া থাকেন, 'নামের সহিত আছেন আপনি শ্রীহরি'। এখন প্রশ্ন উঠিতে পারে এই যে, নাম করিলেই যদি বস্তু মিলে, তবে সন্দেশের নাম করিলেও তো সন্দেশ খাওয়া হইত। প্রত্যুত এমন প্রশ্ন বিচারবিমূঢ়তারই পরিচায়ক। কারণ সন্দেশের নামে সন্দেশের সম্পূর্ণ পরিচয় নাই। আমরা তাহার যতটা বুঝিয়াছি তদনুযায়ী একটা নাম দিয়াছি মাত্র, সুতরাং নামের সঙ্গে তাহার স্বধর্মের ব্যাপকতা আমাদের চিত্তে প্রকট হইতে পারে না। বস্তুতঃ জগতে এমন নাম কিছুই নাই যাহা বস্তুর সম্পূর্ণ স্বরূপের পরিচয় দিতে পারে। কারণ সে নামগুলি আমাদেরই দেওয়া এবং আমাদের ইন্দ্রিয়ের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ। যিনি যে বস্তুর সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ, তিনি সেই বিষয়ের পরিচয় স্বরূপে তাহার নাম-মহিমা আমাদের মধ্যে জাগ্রত করিয়া

আমাদিগের মনে তৎসম্পর্কিত জ্ঞানের কথঞ্চিৎ উন্মেষ সাধন করিতে পারেন মাত্র। ফলতঃ পূর্ণ পরিচয় কোন বস্তুর কেহই দিতে পারে না এবং খাঁটি নামের পরিপাটি ফুটাইয়া তুলিবার সাধ্য কাহারও নাই। প্রকৃতপক্ষে নাম একটিই আছে, এবং পরিচয়ও একটি। প্রকৃত নাম ভগবানেরই নাম এবং আমাদের মন, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে যাহা কিছুর পরিচয় ঘটিতেছে, সব পরিচয়ের পূর্ণ জ্ঞান বা তাহার ভাবার্থ এক ভগবানেই সার্থক হইয়া উঠে। যত নাম সবই তিনি এবং সকল পরিচয়ের পূর্ণতায় তাঁহারই উদয় হইয়া থাকে। সুতরাং নাম-সাধনার পথে আমাদের বিচার-বুদ্ধির সংস্কারগত সীমা লয় হইয়া গিয়া এক অখণ্ড এবং অব্যয় সত্যের প্রকাশই আমাদের দৃষ্টিতে উন্মুক্ত হয়। ইহার কারণ এই যে, ভগবানের নাম তিনি নিজেই প্রচার করিয়া থাকেন। তাঁহার পরিচয় তিনি নিজেই দেন। সুতরাং সে পরিচয় প্রত্যক্ষ এবং পূর্ণ। সকল শক্তির মূলে যিনি আত্মভাব স্বরূপে বিরাজ করিতেছেন, তিনি তাঁহার দানের পরম মহিমায় সাধকদের চিত্তকে উদ্ভাসিত করিয়া নামরূপে প্রভববীর্য্যে প্রকটিত হন। বস্তুতঃ নাম কেহই সৃষ্টি করিতে পারে না। ভগবানের দিকে দৃষ্টি করিলে নাম তাঁহার ক্রিয়াশক্তি হইতে বিসৃষ্ট হইয়া আমাদিগকে আকৃষ্ট করে, আমাদিগকে ধরিয়া বসে এবং আমাদের সব শক্তি তাঁহারই সেই নামের বা আত্মাভিব্যক্তির বশীভূত হইয়া আনন্দসত্তায় লীন হইয়া যায়। প্রকৃতপক্ষে এক্ষেত্রে তিনি নিজেই দাতা, নিজেই যে আমাদের আত্মা।

বস্তুতঃ ভগবৎ-সাধনার পথে বিচার ছাড়িয়া যখন আমরা তাঁহাকে সোজাসুজি স্বীকার করিতে সমর্থ হই, তখন মধ্যস্থস্বরূপে তাঁহাকে ছাড়িয়া কোন বিকারকে স্বীকার করিবার সম্ভাবনা বা সামর্থ্য আমাদের থাকে না। সে অবস্থায় তিনি নিজেই আমাদের খাওয়ান, নিজেই পরান। তিনিই "গতিভর্ত্তা, প্রভুঃ সাক্ষী নিবাসঃ শরণং সুহৃৎ"। জড়, চেতন, পরা, অপরা প্রভৃতি প্রকৃতির বিভাগ, প্রকৃতপক্ষে তাঁহার এই দাতৃত্ব এবং আত্মতত্ত্বের গভীরতা বা পূর্ণতা উপলব্ধির অভাবেই আমাদের কাছে অনুমিত হইয়া থাকে। তাঁহার কৃপা বা আমাদের সঙ্গে তাঁহার ঘনিষ্ঠতা যে কত বেশি দণ্ডে দণ্ডে পলে পলে প্রতিনিয়ত তাহা কেমনভাবে ক্রিয়াশীল, দেশ বা প্রতিবেশের ব্যবধানবোধকে উদ্ভিন্ন করিয়া সে লাবণ্য কেমন অপরিচ্ছিন্ন

আমরা ইহা ধারণা করিতে পারি না ; এবং পারি না বলিয়াই বিভিন্ন উপদেষ্টা এবং জ্ঞানিগণ, বিভিন্ন সমাজে বহুভাবে তাঁহাকে দেখেন। বাস্তবিক পক্ষে নামের রাজ্যে, সাক্ষাৎসম্বন্ধে ভগবৎ-সম্পর্কের পরিমণ্ডলে প্রবিষ্ট হইলে তাঁহার কৃপার স্নেহময় জালে মন, বুদ্ধি এমন কি আমাদের এই জড় দেহ পর্য্যন্ত জড়াইয়া যায় এবং সেই কৃপার ধারাতেই যেন গড়া হইতে থাকে। কৃপাই সেখানে অন্নে পরিণত হয়। শ্রুতি বলেন, অমৃতের ঈশান হইয়া তিনি তখন আমাদের অন্নের সংস্থান করেন এবং সেই অন্নের দ্বারা সাধক মরণকে অতিক্রম করিয়া নিত্য জীবনে প্রতিষ্ঠিত হন। অন্নময় কোষে এইভাবেই তাঁহার আবির্ভাব ; তাঁহার অবতরণ ঘটে। নাম অর্থই নামিয়া আসা, স্বতন্ত্র দিয়া সাক্ষাৎ সম্বন্ধে জীবকে আলিঙ্গন।

এ সবই প্রগাঢ় অনুভূতির বিষয়। সাধনা অবশ্যই চাই ; বস্তুতঃ আমরা যতই তাঁহার দিকে দৃষ্টি করি, সৃষ্টির অন্তর্নিহিত, তাঁহার আত্মশক্তির বিলাসও ততই আমাদের কাছে ধরা পড়ে। আমরা যতই তাঁহার দিকে আগাইতে উন্মুখ হই, তিনি ততই আমাদের দিকে নামিয়া আসেন। মহাপুরুষ হজরত মহম্মদের একটি বাণী এক্ষেত্রে মনে পড়ে। তিনি তাঁহার সহধর্ম্মিনীকে একদিন বলিয়াছিলেন, খাদিজা, রাত্রির অন্ধকারে মরুভূমির পথে কেমন করিয়া বাহির হই, তুমি সেই কথা জিজ্ঞাসা করিতেছ ; কিন্তু আমি কি একা থাকি, তুমি মনে কর ? আমার প্রভুই আমার সঙ্গে থাকেন। আমি যদি তাঁহার দিকে হাঁটিয়া যাই, তিনি আমার দিকে দৌড়াইয়া আসেন। আমার মন তাঁহাকে ভাবিবার আগেই তাঁহাব প্রভাব আমার উপর আসিয়া পড়ে। মহাভারতের ঋষি বেদব্যাসও এমন কথাই বলিয়াছেন। আমাদের মনের গতির চেয়েও তাঁহার আত্মসংস্থিতি, আমাদের কাছে দ্রুত হইয়া ফুটে। মনও তাঁহার দিকে পাখা মেলিবার আগেই, তিনি আসিয়া তাঁহার স্নেহের আপ্যায়নে আমাদিগকে মাখিয়া ফেলেন। এরূপ অবস্থায় one step is enough for me. খৃষ্ট সাধক Newman এর উক্তির যাথার্থ্য আমাদের উপলব্ধি হয়।

ভগবানের এই যে অপাবৃত প্রকাশ বা অবাধ কৃপা সাক্ষাৎসম্পর্কে ইহার উন্মেষকে উপলব্ধি করাই ভগবদনুভূতি বা ভগবদ্দর্শনের মুখ্য বিষয়। প্রকৃতপক্ষে কৃপাকে আশ্রয় করিয়া ভগবানের যে কোন নামের মন্ত্র

গ্রহণ করিলে তাঁহার গুণ অর্থাৎ প্রেম উদ্ভিন্ন হইয়া পড়ে। তিনি কর্ণকে ক্ষেত্র করিয়া আমাদিগকে অমৃতধারায় অভিষিক্ত করিয়া থাকেন এবং তাঁহাকে যাহাতে আমরা অবিরতভাবে অনুভব করিতে পারি, এমনরূপে আমাদের চিত্তবৃত্তিকে পরিস্ফূর্ত্ত করিয়া তোলেন। কৃপাপরায়ণ কবিরাজ কৃষ্ণদাস গোস্বামী মহারাজ শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাণীই এ সম্বন্ধে আমাদের কাছে উপস্থিত করিয়াছেন। বাঙলার ঘরে ঘরে সে বাণী আজও ধ্বনিত হইতেছে—'অনেক লোকের বাঞ্ছা অনেক প্রকার, কৃপাতে করিল নামের বিবিধ প্রচার। সর্ব্বশক্তি নামে দিলেন করিয়া বিভাগ। আমার দুর্দৈব নামে নাহি অনুরাগ।' এস্থানে লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, নাম মূলত একই। কৃপার আলোকে সেই নাম বিভিন্নরূপের ঝলকে আমাদের চিত্তফলক আসিয়া স্পর্শ করে। সে স্পর্শের আত্মরসের আকর্ষণে নিজেদের সৃষ্টি ভুলিয়া নামীর দিকে আমরা দৃষ্টি করি। আমরা কাম ছাড়িয়া প্রেমের জন্য উন্মুখ হই, অমনই প্রেমময়ের পরম দানের গরিমায় আমাদের দৃষ্টি নিস্পলক হইয়া যায়। তখন ভূলোক, দ্যুলোক জুড়িয়া একই নামে, একই পরিচয়, একের সহিত আমাদের রসময়, আনন্দময় নিত্য সম্বন্ধটি ফুটিয়া উঠে এবং আমাদের সব দৈন্য ছুটিয়া যায়। এইভাবে সকল সংস্কার হইতে মুক্ত হইয়া আমাদের মন তখন একই সত্যে সমীহিত হয় এবং আমরা সর্ব্বত্র ভগবানের লীলাই উন্মুক্ত দেখিতে পাই। বাস্তবিকপক্ষে ভগবান্ কেমন, তাঁহার দেহ কি বস্তু দিয়া গড়া, চিন্ময় জিনিষটা কি, নামের রসে না ডুবিলে এসব তর্কের দ্বারা অনুমান করিতে যাওয়া বাতুলতা মাত্র। তর্ক অপ্রতিষ্ঠ—তাহার মধ্যে বোধের ঘনিষ্ঠতা থাকিতে পারে না। বস্তুতঃ ভগবৎ-তত্ত্ব অতি ঘনিষ্ঠ। নামের ভিতর দিয়াই তাঁহার এই ঘনিষ্ঠতা উপলব্ধি হয়। তিনি সর্ব্বতোভাবে ধরা দেন, দেহ পর্য্যন্ত দান করিয়া আমাদিগকে বরণ করেন এমনই তাঁহার মহিমা। বস্তুতঃ তাঁহার দেহ তিনি যদি নিজে দান না করেন, তবে তাঁহাকে কেহই খুঁজিয়া পায় না। সন্দেহ, সংশয় এবং মূঢ়তা মনের সূত্রে গাঢ় হইয়াই থাকে। তাঁহার চিন্ময় দেহটিকে বিলাস-ভঙ্গীতে আমাদের দিকে আগাইয়া দেওয়াতে যে সঙ্গ, যে রস এবং রসের যে আস্বাদন তাহাতেই আমাদের ঐকান্তিক সুখের প্রতিষ্ঠা। সেবা এবং ভক্তি এইভাবে ভগবানের এই ব্যক্ত রূপকে আশ্রয় করিয়াই সার্থক হইয়া থাকে। ফলতঃ ভগবানের দেহ, ভগবৎ-

বিগ্রহ স্বীকার না করিলে ভক্তিপথে অধিকারী হওয়া যায় না। অবিতর্ক-অনুকম্পার প্রভাবে ভগবৎ-সেবার তেমন আলিপ্সার সঞ্চার নরলোকে দুর্লভ। প্রত্যুত যাঁহাকে তিনি কৃপা করিয়া নাম-রসে নিমজ্জিত করেন, শুধু তিনিই এ সৌভাগ্য লাভ করিয়া থাকেন। হিসাবের দ্বারা এ বস্তু মাপিবার বিষয় নয়—"ঈশ্বরের কৃপা নহে বেদপরতন্ত্র"। নামে রতি জন্মিলে ইহা সুলভ হইয়া থাকে। শুধু এই কথা বলা যাইতে পারে।

নাম অনেকই আছে এবং সকল নামই ভগবানেরই নাম। কিন্তু আমাদের হৃদয়-জোড়া সংবেদনের সাড়া সব নামে সমানভাবে সব সময় জাগিতে পারে না, এ সত্য অস্বীকার করিবার উপায় নাই। এ তো আমরা নিত্যই দেখিতেছি। বস্তুতঃ নামের ভিতর দিয়া ভগবানের প্রেমলীলাকে পরিস্ফূর্ত্ত করিবার জন্য অশেষ নামের ভিতরও ভগবানের একটি বিশেষ প্রকাশ আছে। এ স্থলে "বিশেষ" এই শব্দটি ব্যবহার করাতে কিছু গোল ঘটিবার সম্ভাবনা আছে। কিন্তু ইহার পরিবর্ত্তে দার্শনিক অন্য কোন ভাষা ব্যবহার করিতে গেলেও বিষয়টি বুঝিবার পক্ষে সুবিধা হইবে না; পক্ষান্তরে জটিলতাই বৃদ্ধি পাইবে। আচার্য্য বলদেব বিদ্যাভূষণের মতে—"বিশেষস্ত বশ্যং স্বীকার্য্যঃ। সচ ভেদ-প্রতিনিধি ভেদাভাবেপি"। অর্থাৎ ভেদের অভাব অথচ অভেদের ও ভেদের প্রতিনিধিকে বিশেষ বলে। তিনি আরও বলেন, "স্বভাবস্ত বিশেষাত্মা"। ব্যাপারটা হইতেছে এই যে 'বিশেষ' বলিবার সঙ্গে সঙ্গে একটা সীমাবদ্ধ এবং সঙ্কীর্ণতার ভাব আমাদের মনে জাগে, সুতরাং বিষয়টি স্পষ্ট করিয়া বলিতে চেষ্টা করা দরকার। প্রকৃতপক্ষে বিশেষ বলিতে এক্ষেত্র আমাদের নিজত্ববোধে ভগবানের সম্পর্কের নিরপেক্ষ নিবিড়ত্ব বুঝায় অর্থাৎ এখানে নিজেদের অন্তরের স্বাভাবিক আকর্ষণ সংগোপনত্বের মধ্যে আমরা ভগবৎ-সত্তাকে আস্বাদন করিবার জন্য আকুল হইয়া পড়ি। ভগবানের একাত্ম আত্মরসের সেই পরমোজ্জ্বল এবং সরস উন্মেষে অপর কোন দিকে আমাদের কোন লক্ষ্য থাকে না। "স্বচিত্তেষু স্বতঃএব সিদ্ধঃ"—আমাদের আর অবকাশ নাই, এমনই সে প্রকাশ। সে অবস্থায় মুহুর্মুহুঃ অমৃতের এক অব্যয় উৎস হইতে রসের ধারা উৎসারিত হইয়া আমাদের অন্তরকে অভিষিক্ত করিতে থাকে; অবিরাম ও অভিরাম সে ধামের বিস্তার—উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্বলতর রাজ্যের দিকে মন ও বুদ্ধির অভিসার আরম্ভ হয়। এই

ভাবে ভগবানের নিজ বীর্য্য-বৈভব আমাদের মন ও বুদ্ধির অভাবাত্মক সংস্কার প্রভাবিত অহঙ্কৃত অংশকে আলো করিয়া তাঁহার চরণে আমাদের আত্মনিবেদন সার্থক করিয়া তোলে এবং আমাদের কর্ম্মবন্ধনের গ্রন্থি কাটিয়া দেয়। এ অবস্থায় আমরা ভগবানের সেবাকে সত্য এবং নিত্য করিয়া থাকি।

প্রকৃতপক্ষে ভগবানের এই প্রকাশটিকে বিশেষ বলিলেও ইহা নির্ব্বিশেষ অর্থাৎ তিনি আমাদের এত কাছাকাছি হইয়া পড়েন যে, বাছাবাছি করিবার কিছুই থাকে না। এইটিকে নামের বীর্য্য বলা যাইতে পারে। আমাদের সব অবীর্য্য যাহাতে দূর হয়, নামের ভিতর এমন ভূমা শক্তির অভিব্যক্তি আছে। সে শক্তির সংযোগে তিনি আমাদিগকে আসিয়া ধরেন। তাঁহার আপ্যায়নের অলজ্ঘ্য বীর্য্যে আমরা আকৃষ্ট হইয়া পরম পুরুষার্থতা লাভ করিতে সমর্থ হই। সেখানে আমাদের কিছু করিবার থাকে না। তিনিই আমাদের জন্য সব করেন। গীতায় শ্রীভগবান্ ব্যক্ত এবং অব্যক্ত সাধনার প্রসঙ্গে এই সত্যটি স্পষ্ট করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। অব্যক্তাসক্তচিত্ত যাঁহারা, তাঁহাদিগকে ক্লেশের ভিতর দিয়া তাঁহাকে পাইতে হয়, কিন্তু নামের পথে বিশেষ অভিব্যক্তির বীজকে আশ্রয় করিয়া যাঁহারা সাধনা করেন, তাঁহাদিগকে ভগবান্ অচিরে মৃত্যু-সংসার-সাগর হইতে নিজেই উদ্ধার করিয়া থাকেন। বস্তুতঃ অন্য সব সাধনায় দেশ, কাল ও পাত্রের বিচারগত যে সব পরিমিতি আমাদের মনের গতিপথে অন্তরায় স্বরূপে দেখা দেয় এবং সেগুলিকে অতিক্রম করিতে আমরা মন ও বুদ্ধির যে আড়ষ্টতা বা সংক্লেশ উপলব্ধি করিয়া থাকি নাম সাধনায় সে সব অন্তরায় থাকে না। ভগবানের প্রসঙ্গে সাধক নিজের অজ্ঞাতে নির্ব্বিবাদে সে সব খাত উত্তীর্ণ হইয়া যান। ভগবানের প্রেমশক্তি এখানে এমনই প্রচুর—তিনি এমনই মধুর—"ন যত্র বাদঃ"। সে অবস্থায় তাঁহার চরণে আশ্রয় লইবার জন্য কর্ম্ম অথবা বিকর্ম্মের গহনে পড়িয়া আমাদিগকে আর রণ করিতে হয় না। আমরা অরণে যিনি বিশ্বের মূল তাঁহার শরণ অধিগত হই। দেশ, কাল পাত্রের বিভেদকে বিলোপ করিয়া শ্রীভগবানের এই যে স্তোভ বা আদর, ইহার স্পর্শে, চরাচরকে উদ্দীপ্ত করিয়া আমাদের চিত্তে তাঁহার নিত্যলীলা আরম্ভ হয়। আত্মার দ্বারা আমাদের ইন্দ্রিয় মন বুদ্ধি আলিঙ্গিত হইয়া

ভগবানের অন্তরঙ্গা-শক্তির রাজ্যে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া থাকে। সে শক্তির অপরূপ বিভাবে আমাদের চিত্ত প্রভাবিত হয় এবং ভগবানের নিত্যসেবার লালসার জন্য আমাদের মধ্যে গূঢ়ভাবে স্বরূপগত যে চেতনা রহিয়াছে তাঁহাকে সঞ্জীবিত করিয়া তোলে। বস্তুতঃ নামের ভিতর দিয়া এই যে বীর্য্য যদি ইহার সংবেদন আমরা উপলব্ধি না করি এবং ভগবানের নিজ-বোধের এই বৈভবের অভিব্যক্তির আকর্ষণে আমাদের মন বুদ্ধি যদি লৌহ যেমন চুম্বকের দ্বারা আকৃষ্ট হয়, তেমনই তদ্দ্বারা আকৃষ্ট না হয়, তবে স্বাভাবিক পথে ভগবৎ-সাধনা সার্থক হইতে পারে না। বস্তুতঃ গোড়ায় গলদ থাকিয়াই যায় এবং অহঙ্কৃত কামই আমাদের সাধনার ভিতর দিয়া জড়াইয়া উঠে এবং বাহিরের কৃত্যের ভিতর আমাদের ছড়াইয়া দেয়। মন উপরে উঠিতে গেলেও সে ক্ষেত্রে গুণোর্ম্মির চক্রের ভিতর, সেই স্বল্পতার রাজ্যেই সে গড়াইয়া পড়ে। সে অবস্থায় ব্রহ্মজ্ঞান প্রভৃতির আমরা যতই অভিমান করি না কেন, সব ভ্রান্তি মাত্র ; প্রকৃতপক্ষে আমাদের শ্রান্তি ও ক্লান্তি সমানই থাকিয়া যায়। এ অবস্থায় "সর্ব্বং খলু, ইদং ব্রহ্ম" এ সমস্ত কথার কোন মূল্যই নাই।

গজেন্দ্রমোক্ষণের কথা অনেকেই শুনিয়াছেন। "গজহস্তী নাম রাখে শ্রীমধুসূদন" শৈশবে আমাদের মুখস্থ হইয়া গিয়াছিল। মহাত্মা গান্ধী অনেক ক্ষেত্রেই প্রার্থনার সময় এই গজেন্দ্র-মোক্ষণলীলার ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইতেন। ভাগবতেও বলা হইয়াছে গজেন্দ্রের কি বিদ্যা ছিল ? "ভক্ত্যা তুতোষ ভগবান্ গজযূথপায়া" গজেন্দ্র বিপদে পড়িয়া ভগবানকে ডাকিয়াছিলেন, তাঁহার নাম করিয়াছিলেন। ভগবান্ ছন্দময় এবং আনন্দময় তাঁহার শক্তি ছড়াইয়া দিয়া তখনই তাঁহাকে আসিয়া জড়াইয়া ধরিলেন। ভগবদনুগ্রহের এই যে প্রভাব ভাগবতে ইহার কারণটি স্পষ্ট করিয়া বলা হইয়াছে। নামের অন্তর্নিহিত বীর্য্য সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে গজেন্দ্রের মনকে স্পর্শ করিয়াছিল। তিনি অন্য সব উদ্দেশ হারাইয়া নামের ভিতর দিয়া ভগবানকে নির্ব্বিশেষ ভাবে জড়াইয়া ধরিয়াছিলেন। গজেন্দ্রের ডাক শুনিয়া অন্যান্য দেবতারা না আসিয়াছিলেন এমন নয় ; তাঁহারা আসিতে বাধ্য ; কারণ ভগবান্ আসিলে ভগবৎ-শক্তির অঙ্গীভূত অন্যান্য দেবগণও আকৃষ্ট হইবেন, ইহা স্বাভাবিক ; কিন্তু তাঁহারা আসিয়াও তাঁহাদের বিভিন্ন অঙ্গ লইয়া নিজেদের কর্ত্তৃত্ব ও ব্যক্তিত্ব

নানা দেবতার অন্তবান্ ভাব গজেন্দ্রের মনে প্রতিষ্ঠা করিতে সমর্থ হইলেন না। কারণ, নামের বীর্যপ্রভাবে গজেন্দ্রের সকল অবীর্য্য দূর হইয়াছিল। তিনি নিখিলাত্মভাব লাভ করিয়াছিলেন। সুতরাং প্রেমের দৃষ্টিতে ভগবানের পূর্ণ স্বরূপই তাঁহার কাছে উদ্ভাসিত হইল এবং একের লাবণ্যে উপাধিগত ভেদভাব বিলীন হইয়া গেল। ভগবানে অচলভাব যেখানে উজ্জ্বল সেখানে দেবতারা বিভিন্নভাবে মনে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করিবেন, এমন প্রভাব আর তাহাদের থাকে কোথায়? গজেন্দ্র একেবারে যে গোড়া ধরিয়া টান দিয়াছিলেন। তাঁহার মন শাখা-প্রশাখা ছাড়িয়া ঊর্দ্ধমূল অধঃ শাখ অশ্বত্থ বৃক্ষের একেবারে এক ঝাঁকুনীতে গুড়িতে গিয়া উঠিযাছিল। গজেন্দ্রর দৃষ্টিতে বিভিন্ন দেবতার অঙ্গ ভগবানের প্রেমের তরঙ্গে ভাসিয়া গেল এবং তাঁহাব অন্তরে একেরই আনন্দলীলা জাগিল। "অখিলা-মবময় হরি" গজেন্দ্রকে আসিয়া ধবিলেন। ফলতঃ মনের মূলে মুখ্যভাবে বিভিন্ন কামনা এবং বাসনাকে ভিত্তি করিয়াই বিভিন্ন দেবতারা আমাদের কাছে আসিয়া বাতি ধবিয়া দাঁড়ান এবং আমাদের গতিকে পরিচালিত করেন। ভগবৎ-প্রেমের প্রত্যক্ষ উপলব্ধিতে গজেন্দ্রের কাছে একেরই অপরিম্লান জ্যোতিতে সে সব বাতি বিলীন হইয়া গিয়াছিল। তাঁহার শ্রুতি ভগবানের গীতির পথের অভিমূখে উন্মুক্ত হইয়াছিল। আমরা যাহা বলিতে চাহিতেছি, তাহা মোটামুটি এই যে, "একই ঈশ্বর ভক্তের ধ্যান-অনুরূপ, একই বিগ্রহে ধরে নানাকার রূপ" একথা অবশ্যই সত্য; কিন্তু সেই সঙ্গে ইহাও সত্য যে, নামের ভিতর দিয়া ভগবৎ-শক্তির একটি নির্ব্বিশেষত্বমূলক বিশেষ অভিব্যক্তি আছে। বহু রূপের বীজ ভাবটি একান্ত নিজবোধের নিগূঢত্বে এখানে নিষ্ঠিত রহে এবং আমাদের মন, বুদ্ধি এবং ইন্দ্রিয় সমূহকে আকর্ষণ করিয়া নিজবোধের অমৃতত্বে অভিষিক্ত করিয়া এই বিশিষ্ট অভিব্যক্তির আলো অশেষ রসে আমাদের জীবনকে উদ্বুদ্ধ করে, "মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্নোতি য ইহ নানেব পশ্যতি"—বিকারাত্মক আমাদের বুদ্ধির এই আঁধারে আমাদের চোখ খুলিয়া দেয়। নামের ভিতরে এই যে গূঢ় এবং গাঢ় অনুভূতি ইহার রূপে ও রসে চিত্তকে অনুরঞ্জিত এবং সিক্ত করিতে না পারিলে, অন্য সাধন-ভজনে যাহাই হোক না কেন, ভগবানে অব্যভিচারিণী বা অনন্যা-ভক্তি সার্থকতা লাভ করে না।

আমাদের মন ও বুদ্ধির উপর ভগবানের পরম ধর্ম্মের এই বিস্তার অর্থাৎ আমাদের ইচ্ছাবৃত্তিকে সাক্ষাৎসম্পর্কে রস-সংস্পর্শে পরিস্ফূর্ত্ত করিবার উপযোগী তাঁহার গুপ্তলীলার ইঙ্গিতময় আবেদন এবং চিত্তবৃত্তিসমূহের নির্ব্বিচার সঙ্গতি বা নিবৃত্তির সম্মোহন মাধুর্য্য সঞ্চারী তাঁহার পরম প্রভাব নামের অন্তর্নিহিত বীর্য্যেই এসব তাৎপর্য্য রহিয়াছে। প্রকৃতপক্ষে বীর্য্য বলিতে বশ করিবার ক্ষমতা বুঝায়। নামের অন্তর্লীন লীলা আমাদের মনের মূলকে স্পর্শ করিয়া আমাদের ইন্দ্রিয়বৃত্তিগুলিকে বশ করিয়া ফেলে।' আমাদের চিত্ত নামের শক্তির দ্বারা সংবৃত এবং নিয়তার্থ হয়। এ অবস্থায় অভাবাত্মক কৃত্য আমাদের শেষ হইয়া যায় এবং আমাদের দেহ, মন, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়বৃত্তি-সমূহকে সঞ্জীবিত করিয়া ভগবানের কাজই আরম্ভ হয়। আমাদের কর্ম্মঃ সংস্কার সঞ্জাত দেহসম্পর্ক ধরিয়া আমাদের মনের উপর যে সব বিভিন্ন আলোক পড়ে এবং আমাদিগকে নাড়াচাড়া দিয়া বিকারের মধ্যে লইয়া যায়, সেই সব তখন বন্ধ হইয়া যায়। মন সে অবস্থায় একের ভিতরই ডুবিয়া বহু রূপে একের রসকে আস্বাদন করে এবং একেরই কেন্দ্র হইতে ছন্দময় ও প্রাণময় লাবণ্যের বিস্তার দেখিতে পায়। বিষ্ণুর পদে, তাঁহার নামে যে পরম মধুর উৎস রহিয়াছে এবং তিনিই যে আমাদের বন্ধু, এই ঋক্ মন্ত্রের মূলীভূত সত্য তখন আমাদের দৃষ্টিতে উন্মুক্ত হয়। এ অবস্থায় ভগবানের শক্তি সর্ব্বতোব্যাপ্ত দীপ্তিতে প্রোজ্জ্বল হইয়া ফুটে। সেই শক্তিই আমাদিগকে চালায় এবং আমাদিগের নিজেদের শক্তি সম্বন্ধে স্বতন্ত্র কোন অনুভূতি থাকে না। বস্তুতঃ আস্তিক্য বলিতে এবং ভগবানকে জানা বলিতে এই অবস্থাই বুঝায়। ভগবানের অস্তিত্ব স্বীকার করি, তাঁহাকে জানি, মানি, অথচ চোখ-বাঁধা বলদের মত দুঃখময় সংসার-চক্রের ঘানি ঘুরাইয়াও মরিতেছি ইহার কোন অর্থ হয় না। প্রকৃতপক্ষে নামে রতি না হইলে সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে ভগবদনুভূতির অন্য কোন উপায় নাই। নামের রাজ্য ভগবানেরই রাজ্য, ভগবানেরই সেখানে লীলা। আর নামের ভিতর না ঢুকিতে পারিলে আমাদেরই কার্য্যের রাজ্যে আমাদিগকে পড়িয়া থাকিতে হয় এবং আমাদের অহঙ্কারকে বাতি করিয়া অন্ধকারের মধ্যে অনিত্য এবং অসত্য সুখের আশায় ইতস্ততঃ ছুটাছুটি করিতে করিতে আমাদের স্বল্প জীবনের সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসে।

নাম আর তনু ভিন্ন নয়

নামের ভিতর যে বিশেষত্বটি গূঢ়ভাবে নিহিত থাকে, মন, বুদ্ধি এবং অহংকারের উত্তেজনায় এবং আলোড়নে তাহা আমাদের কাছে সহজে ধরা পড়ে না। মন বাহিরের দিকে স্বভাবতঃই ছড়াইয়া পড়িতে চায়। বস্তুতঃ এমন বিক্ষিপ্ত মনকে গুছাইয়া লইয়া নামের অন্তর্লীন অনুধ্যানটির সঙ্গে যুক্ত করা বড়ই কঠিন ব্যাপার। মন কিছুতেই যেন আঠা বাঁধে না, ছট্‌কিয়া ছট্‌কিয়া যায়। অথচ সাধনার পথে মনকে অন্তর্মুখীন করাই প্রথমে প্রয়োজন। মনকে অন্তর্মুখীন করিলে তবে ভিতরের আলোর সন্ধান মিলে এবং আমাদের চিত্ত দীপ্ত হইয়া উঠে। এইভাবে বিশেষ বস্তুটিকে বুঝিয়া পাইয়া নির্বিশেষ রসের উন্মেষে ক্রমে আমাদের মন মগ্ন হইয়া যায়। এদিকে ওদিকে তাহার দৃষ্টি আর থাকে না। নামের রাজ্য এমন নূতন এক সৃষ্টির রাজ্য। সেখানে নব সৃষ্টির দৃষ্টিরসে মন নির্নিমেষ হইয়া পড়ে। নামের মাহাত্ম্য এইখানে যে, নাম নিজ-বোধকে উদ্বুদ্ধ করিয়া সর্ব্বাবস্থায় আমাদের স্বভাব-নিয়ত, অর্থাৎ আমাদের স্বরূপগত আত্মসম্পর্কের সংবেদনে সুদৃঢ় অন্তর্গূঢ় এই বিশেষ রূপ ও রসের উন্মেষ সাধন করে অর্থাৎ শ্রীভগবানের বীর্য্যের প্রভাবকে নাম সূর্য্যের আলোকের মত মন, বুদ্ধি ও অহংকারের উপর সাক্ষাৎ-সম্পর্ক সম্পাত করিয়া থাকে। ভগবান্ আর অনুমানের বিষয় থাকেন না ; নিজবোধে বিকশিত ভগবৎ-শক্তির বিচিত্র ছন্দ মনের মূলে সহজভাবে সাড়া দেয়। নামের বলে কর্ম্ম-সংস্কারজনিত অনিত্য যে স্বভাবগুলি আমাদিগকে নানা অবস্থার দ্বন্দ্ব-সঙ্ঘাতের ভিতর ফেলিয়া বিপর্য্যস্ত করে, আমরা সেই সব অবিদ্যা হইতে উত্তীর্ণ হইয়া আমাদের স্বরূপগত নিত্য স্বভাবে প্রভাবান্বিত হই। বস্তুতঃ প্রকৃত সুখ অবস্থার উপর নির্ভর করে না। অবস্থাকে অতিক্রম করিয়া সুখের নিত্যত্ব প্রতিষ্ঠিত। নামই নানাভাবে বিজৃম্ভিত অবস্থার বিড়ম্বনা হইতে আমাদের মনকে মুক্ত করিয়া নিত্য মহোৎসবের যে রাজ্য, সেখানে লইয়া যাইতে পারে। অন্তরের সেখানে যে অধিকার তাহা পূর্ণ, সুতরাং অবস্থাগত বহির্বিচারের প্রশ্ন সেখানে বিলুপ্ত হয়। জীবনে ইহাই আমাদের প্রয়োজন।

আমাদের স্বভাবই অনিত্য বিষয়ের অনুগামী। শ্রেয় ছাড়িয়া প্রেয়ের প্রতিই আমাদের আকর্ষণ, ইহা আংশিকভাবে সত্য হইলেও বৈষ্ণব-সাধনা সর্ব্বাংশে ইহাকে সত্য বলিয়া স্বীকার করে না। বৈষ্ণব আচার্য্যগণের মতে, নিত্যের সঙ্গে যুক্ত হইবার শক্তিও আমাদের মনের আছে এবং বাহ্যবিষয়ের তাড়নার ভিতর দিয়া মন প্রতিনিয়ত নিত্যের জন্য বেদনাই বহন করিতেছে। আমাদের মন সর্ব্বভাবে আত্মভাবেরই স্পর্শ অনুভব করিতে চায়। নামের অন্তর্লীন বীর্য্যে আমাদের মনের স্বরূপগত আত্মনিষ্ঠ সত্যের জন্য বেদনার সান্ত্বনা রহিয়াছে, নামের আশ্রয়ে সে সান্ত্বনার চেতনাময় বা দৈন্যের স্বরূপটির উন্মেষ ঘটে। এইভাবে নামের মহিমা আমাদিগকে বশ করিয়া নিত্যলীলার মাধুর্য্যেব রাজ্যে লইয়া যায়। বস্তুতঃ নামের সঙ্গে তাহার অঙ্গে অঙ্গে আমাদের স্বভাবকে প্রভাবিত করিবার উপযোগী শ্রীভগবানের অচল বা স্থায়ীভাবের ঔজ্জ্বল্য উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে। এই হিসাবে নাম চিদানন্দরূপ। সেই আনন্দে মন মগ্ন হইলে অন্তঃকরণের বিভিন্ন বৃত্তিব পরিপূর্ত্তিব অভাবের জন্য আমাদিগকে দুর্নিবার যে তৃষ্ণার জ্বালায় দগ্ধ হইতে হইতেছে, তাহার ঐকান্তিক নিবৃত্তি ঘটে। নামের ভিতর মনোবৃত্তির উপশমকব এমন ক্রম বহিয়াছে, এ জন্যই ইহাকে "অদ্ভুত ক্রমপরায়ণশীল শিক্ষা বলিযা অভিহিত করা হইয়াছে।" সুতরাং এই নাম শুধু আনন্দ নয়, নাম চিন্ময়ও বটে, অর্থাৎ বাহিরের কোন ব্যবচ্ছেদ বা অন্তরায় ইহার ক্রিয়ার বিপর্য্যয় ঘটাইতে পারে না। শুধু তাহাও নয়, নামে রস আছে। অবশ্য যে জিনিষে আনন্দ সম্পর্ক থাকে, তাহার রসধর্ম্মও স্বতঃসিদ্ধ, কিন্তু এক্ষেত্রে বৈশিষ্ট্য এই যে, আনন্দের অনুভবজনিত প্রভাব সম্প্রসারিত করিবার স্বতঃস্ফূর্ত্ত শক্তি বা তাহাকে ছড়াইয়া দিবার উপযোগী রস নামে উচ্ছল, এজন্য ইহাই পরম বল। বাস্তবিকপক্ষে মন, বুদ্ধি, অহঙ্কাব ও চিত্ত এইগুলি লইয়া আমাদের যে অন্তঃকরণ অন্য কথায় সন্দেহ, সংশয়, গর্ব ও অন্বেষণ এইগুলি লইয়া তাহার যে বৃত্তি, আর সে বৃত্তির সাহায্যে কৃতী বা সার্থকতা লাভ করিবার উদ্দেশ্যে আমাদের মনের অবিরত যে গতি চলিতেছে, নাম প্রত্যক্ষভাবে সেই প্রয়োজনের সঙ্গে আমাদের মনকে সংপ্রযুক্ত করিয়া দেয়; শ্রীভগবানের আত্ম-রস সম্পর্কে ঐশ্বর্য্যমূলক তাঁহার সম্বন্ধে যত অনাত্ম অনুমান, যত ব্যবধান

অন্তর্হিত হয়। নামের প্রভাবে "মাধুর্য্য ভগবত্তাসার" এই সত্যে এবং নিত্য-সম্পর্কে ভগবানকে আমরা অন্তরের অন্তরতম সত্তায় একান্ত করিয়া উপলব্ধি করিতে সমর্থ হই। প্রকৃতপক্ষে লড়াই করিয়া ভগবানকে পাওয়া যায় না এবং আমাদের মন, বুদ্ধি এবং ইন্দ্রিয়বৃত্তিনিচয়কে ক্লিষ্ট এবং পিষ্ট করিয়া ভগবানের কাছে যাওয়া সম্ভব নয়। প্রত্যুত তেমন চেষ্টায় শুধু ক্লেশই সার হইয়া থাকে। কারণ ভগবানের সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধই সে রকমের নহে, তিনি যে একান্তই আমাদের আপনার, সুতরাং আত্মভাবেই তাঁহার গুপ্তলীলা ব্যক্ত হইয়া থাকে। আত্মভাবস্থ হইয়াই তিনি ভাস্বর জ্ঞান-দীপে আমাদের অন্তরের অজ্ঞনতমঃ নাশ করেন।

সকল নামই ভগবানেবই নাম, তবু সকল নামে এই আত্মভাবটিকে একান্তভাবে উপলব্ধি করা সহজ হয় না। সাধনার পথে অগ্রসর হইতে গেলে আমাদের মন মন্ত্রলিঙ্গের দ্বারা অর্থাৎ ইষ্টমূর্ত্তিতে অধ্যস্ত অস্ত্রশস্ত্রাদি উপলক্ষণের দ্বারা আকৃষ্ট হইতে পারে, ইহাকেই দেবমায়া বলা হইয়া থাকে। মন সহজভাবে ইষ্টদেবতার অনুধ্যানের ক্ষেত্রে এইসব উপলক্ষণে দেহসম্পর্কিত সুখ বা স্বার্থ তদভাবজনিত ভীতিরই অনুগতির পথে গিয়া পড়ে এবং যে বস্তু প্রয়োজন, সেই ভগবৎ-প্রেম হইতে বঞ্চিত হয়। বস্তুতঃ এই উপলক্ষণগুলি সম্বন্ধে চেতনা মনের মূলে অতি সূক্ষ্মভাবে কাজ করে এবং সাধনার রাজ্যে অগ্রসর হইলেও এগুলির সম্বন্ধে স্বার্থমূলক সূক্ষ্ম অনুধ্যানজনিত অন্তরায়ের প্রভাব আমাদের মনেব মূলে সব সময় ধরা পড়ে না, কারণ আবেগের আচ্ছন্নতা সেগুলির মনের অবচেতন স্তরে গূঢ়ভাবে রহিয়া যায় এবং পরে সেগুলি স্বমূর্ত্তি প্রকাশ করিয়া সাধকের পক্ষে বিড়ম্বনা ঘটায়। বৈষ্ণব সাধকগণ বলেন, কৃষ্ণ নামে সে ভয় নাই। কারণ এ নামের সঙ্গে শুধু ভালবাসারই সম্পর্ক, বেণু-মাধুর্য্যই এখানে উপলক্ষণ; প্রেমই এখানে আকর্ষণ এবং সেই প্রয়োজনটিই সর্ব্বাংশে এ নামে প্রস্ফুট। এই নামের মধ্যে ভগবানের আত্মভাবটি অর্থাৎ আমাদের সঙ্গে তাঁহার স্বাভাবিক সম্পর্কটি অতর্কিত প্রজ্ঞানময় প্রভাবে বিদ্যমান রহিয়াছে। সুতরাং এ নাম সহজেই ভগবানের সঙ্গে আমাদের সনাতন-সম্পর্ক প্রতিপাদন করে এবং সেই সম্বন্ধটি আমাদের চিত্তে ব্যাপ্ত করিয়া দেয়। এইরূপে দিব্যলীলায় আমাদের জীবন দীপ্ত করিয়া তোলে। সব ভাবার্থ এই নামের মধ্যে রহিয়াছে, এজন্য অভাববোধকে নিরসন করিয়া

এই নাম আমাদিগকে আমাদের স্বরূপনিষ্ঠ স্বভাবে প্রতিষ্ঠিত করে। কাশী-খণ্ডে ভগবান্ শঙ্কর নামের মহিমা বর্ণনা করিতে গিয়া বলিয়াছেন, "ইদমেব হি মাঙ্গল্যং, ইদমেব ধনার্জনম্ জীবিতস্য ফলঞ্চৈতৎ যৎ দামোদর-কীর্ত্তনং"। প্রকৃতপক্ষে নামের সম্পর্কে কিছু পাছে হারাই এজন্য পিছু চাহিবার, বুদ্ধির বিপর্য্যয়ে পড়িবার কোন আশঙ্কাই থাকে না। নামে ভগবানের আত্মভাবের সর্ব্বতোময় স্বপন। ভাগবতে দেখিতে পাই, ভগবানের সঙ্গে যাহাতে এই স্বাভাবিক সম্পর্কটি জমিয়া উঠে, এই জন্য পুনঃ পুনঃ প্রার্থনা করা হইয়াছে। ভাগবত বলিয়াছেন, "অহং-মমতাকে এই কলেবরের সঙ্গে আমরা জড়াইয়া ফেলিয়াছি, এজন্য এই কলেবর কু-কলেবর। এই মমতা সুদুর্ভেদ্য, যাহাতে ইহা হইতে মুক্ত হইয়া আমবা নিত্য জীবনের অধিকারী হইতে পারি, তোমার এমন লীলায় আমাদিগকে আকর্ষণ কর। তোমাব রসময়, আনন্দময় মূর্ত্তি আমাদের দেখাও।" কৃষ্ণ নামে এই মূর্ত্তি স্বতঃস্ফূর্ত্ত বহিয়াছে। "চিদৈশ্বর্য্য পরিপূর্ণ বিগ্রহ যাঁহার, হেন ভগবানে"ব অনুধ্যানের উপযোগী ভাব এই নামের সঙ্গে, ইহার অঙ্গে অঙ্গে অপাবৃত বা উন্মুক্ত আছে বলিয়াই এই নামেব এমন মাহাত্ম্য।

ইহারই বা কারণ কি? প্রকৃতপক্ষে সাধনার রাজ্যে কারণেব কোন প্রশ্ন নাই। এখানে আপনাকে সোজাসুজি স্বীকার করিয়া লইতে হয়। কোন বাদ, কোন বিতর্ক এখানে উঠে না, উঠিলে চিত্তের জাগবণও ঘটে না। সুতরাং "তর্কের গোচর নহে নামের সিদ্ধান্ত"। তবু এইটুকু বলা যাইতে পারে যে নাম বা এই যে পরিচয়, তাঁহার এ পরিচয় তিনি নিজেই দিয়াছেন বা দিয়া থাকেন। অন্য কেহ তাঁহার এই নাম দেয় নাই বা তাঁহাব গূঢ় চরিত্রটি নামের ভিতর দিয়া ব্যক্ত করে নাই; কথাটি পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। কথাটির সঙ্গে অবশ্য রহস্য বিজড়িত থাকে। তবু ভক্তিশাস্ত্রে এই ভিতরের ব্যাপারটি প্রকাশ না হইয়াছে এমন নয়। ভক্তের কাছে ভগবানের কিছুই গোপন করিবার সামর্থ্য নাই এবং ভক্তের মুখে এই গূঢ়তত্ত্ব ব্যক্ত হইয়া পড়িয়াছে। ভাগবতে কুন্তীদেবীর স্তোত্রে দেখা যায়, তিনি বলিয়াছেন, জন্মৈশ্বর্য্য, শ্রুত, শ্রী এগুলি মানুষের অহঙ্কারকে বাড়াইয়া তোলে। সে অবস্থায় তাহারা কখনই তোমার নাম করিতে পারে না। যিনি অকিঞ্চন, তুমি তাঁহারই গোচরীভূত হইয়া থাক। এখানে লক্ষ্য করিবার

বিষয় এই যে, নামে শ্রীভগবানকে গোচরীভূত করিবার সামর্থ্য স্বীকার করিয়া লওয়া হইয়াছে এবং এই গোচরীভূত হওয়া আর স্বয়ং ভগবানের নিজে আসিয়া তাঁহার নিজের নামটি বলা বা প্রকাশ করা একই কথা। উক্ত স্তোত্রে এই তত্ত্বটি পরে সমধিক পরিস্ফুট করা হইয়াছে। কুন্তীদেবী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবের বহুবিধ কারণ নির্ণয় করিয়া ক্রমে সে সকলের নিরসন করিয়াছেন, পরিশেষে একটি তত্ত্ব ভগবানের আবির্ভাবের মুখ্য প্রয়োজন স্বরূপে তাঁহার চিত্তে জাগ্রত হইয়াছে। তিনি বলিয়াছেন, এই পৃথিবীতে অবিদ্যা এবং কাম কর্ম্মসমূহের দ্বারা সকলে ক্লিষ্ট হইতেছিল, তোমার নাম ছাড়া সবই অবিদ্যা, অন্য সকলই কাম সম্পর্কে বিজড়িত, এজন্য তোমার নামটি শ্রবণ ও স্মরণযোগ্য করিবার নিমিত্তই তোমার এই আবির্ভাব। স্বতরাং নাম শ্রবণ করাইবার, স্মরণ করাইবার, এবং এইভাবে নামপ্রেমে ডুবিয়া তাঁহার পাদপদ্ম সেবায় সাধককে চরিতার্থ করিবার কর্ত্তাও তিনি। তিনিই নিজের নাম নিজে শুনাইয়াছেন ইহাই সার কথা হইয়া দাঁড়ায়। নিজের নাম যেখানে তিনি নিজেই করিতেছেন, নিজের পরিচয় নিজেই দিতেছেন, সেখানে বাদ বা বিতর্কের কোন প্রশ্নই উঠে না এবং মন সাক্ষাৎ-সম্পর্কে বস্তুনিষ্ঠা লাভ করিয়া থাকে। ভাগবতে এই সাধনতত্ত্বটি বিচিত্রভাবে পরিস্ফূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছে। ভাগবত বলিয়াছেন, তির্যক্, খগ, নগ, সরীসৃপ, দেব, দৈত্য নানাভাবে তোমার প্রকাশ রহিয়াছে, অসংখ্য তোমার অবতার, কিন্তু আমরা তোমাকে এমনটি দেখিতে চাই, যেখানে কোন রকম বাদ থাকিবে না। কৃষ্ণ নামের ভিতর—"কৃষ্ণনাম কৃষ্ণগুণ, কৃষ্ণলীলাবৃন্দ" এমন নির্বিবাদ প্রসাদই রহিয়াছে। ভাগবতের মধুময়ী ভাষায় সে মাহাত্ম্য ব্যক্ত হইয়াছে। ভাগবত বলেন, দেবকীর গর্ভে শ্রীকৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তিনি যদুবর উগ্রসেনের পারিষদ ছিলেন, তিনি বাহুবলে অধর্ম্মকে দলন করেন, এ সবই বাদ, অর্থাৎ বিচারের বস্তু; পরন্তু ব্রজপুর-বনিতাদের কামদেব বর্দ্ধনকারী সর্ব্ব পাপতাপহারী, তাঁহার মধুর মুখের হাসিরাশি মাখা যে লীলা, তাহাই নিত্য, সেখানেই তাঁহার নির্ব্বিবাদ তাহা প্রসাদ।

এখানে প্রশ্ন উঠিতে পারে এই যে, কৃষ্ণ নিজে কৃষ্ণনাম বলিয়াছেন কিংবা প্রচার করিয়াছেন, কৃষ্ণলীলার ভিতর এমন পরিচয় তো পাওয়া যায় না,

গৌরাঙ্গলীলাতেই এমন খেলা দেখা যায়। একথা সত্য, কিন্তু গৌরাঙ্গলীলা এবং কৃষ্ণলীলা তুইটি পৃথক বস্তু নয়। বস্তুতঃ গৌরাঙ্গলীলা কৃষ্ণলীলারই পরিস্ফূর্ত্তি। তাঁহার ভগবত্তা-সার মাধুর্য্যেরই বিস্তার এবং কেলি-কলারই সে লীলা পরম প্রথিমা এবং প্রেমের সমুন্নত-সীমা। সুতরাং কৃষ্ণলীলাতেও ভক্তের অন্তরে গৌরাঙ্গলীলার গূঢ় নিজবোধ বিন্যাসের যে বচনের বিলাস, নামের মিষ্টত্ব বা আকর্ষণের উৎকর্ষ এবং আত্মীয়তাময় আপ্যায়নের রসোল্লাসই প্রকাশ পাইয়া থাকে। প্রকৃতপক্ষে তাহার "নাম আর তনু ভিন্ন নয়", নামের সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার বিগ্রহের উদয় এবং উদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই তাহার শব্দ ব্রহ্মময় বেণুর ঝঙ্কারে নিজেব নাম বা পরিচয়ের প্রভাব-বৈভবের গৌরবময় সঞ্চার ঘটে। বাগার্থ এখানে পরস্পর সম্পৃক্ত। ফলতঃ নামের সঙ্গে সঙ্গেই তিনি তাঁহার বাঙ্ময় তনুর চিদৈশ্বর্য্য সঞ্চারে হৃদয়ে জাগিয়া উঠেন, বলেন, 'আমি তোমার'। সুতরাং প্রশ্ন করিবার আর কোন অবসর থাকে না, নামের প্রতিবেশে গেলেই তাঁহার প্রেমের অবিচ্ছিন্ন লাবণ্য চিত্তে উদ্ভিন্ন হয় এবং অসৎ তর্ক সব সমূলে তিরোহিত হয়।

প্রকৃতপক্ষে নাম করার ফলে চিত্তে যদি একটু দোলা লাগে, ভাবের একটু সঞ্চার হয় তবে নামের ক্রিয়া ব্যাপ্তি লাভ করে এবং সে অবস্থায় সাধক নামের সেই ব্যাপ্ত লীলার মধ্যেই নিজেকে দীপ্ত করিয়া পান। তাঁহার কৃত্য আর থাকে না। তাহার অহঙ্কার নামের ঝঙ্কারে উৎসৃষ্ট হইয়া ইষ্টতত্ত্ব পুষ্ট হইয়া ওঠে। তিনি নিজের ক্ষুদ্র সত্ত্বাকে বৃহতের মধ্যে হারাইয়া ফেলেন। এ অবস্থায় তাঁহার অনুভূতিতে, তিনি যে নাম করিতেছেন, এই ভাবটি খুঁজিয়া পাওয়া দায় হইয়া দাঁড়ায়। তিনি নামের ব্যক্তিত্বের বশীভূত হইয়া গিয়া নাম শুনিতেছেন, এই রহস্যটি সত্য ভাবনায় পরিণত হয় এবং মূর্ত্তচেতনায় মধুর সে গান, সে দানলীলা উন্মুক্ত হইয়া জড় বিচারগত আমাদের যে অহঙ্কার তাহা লুপ্ত করিয়া দেয়। নামের সংখ্যা বা হিসাব সেখানে থাকে না অর্থাৎ ছাড়া ছাড়া ভাবে নাম করার আয়াস নামের অন্তর্নিহিত রসের বিস্তারে হারাইয়া যায়। নিরবচ্ছিন্ন অখণ্ড ভাবধারা সাধকের অন্তরকে পরিপ্লুত করিয়া ফেলে এবং সেই ভাবের ভিতর তাঁহার মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার এবং দেহ পর্য্যন্ত জড়াইয়া পড়ে। সাধক সেই রসময় সংবেদনে, উজ্জীবিত হন, তিনি তাঁহার চরণে আত্মনিবেদন করিয়া

পরমানন্দ আস্বাদন করিয়া থাকেন। বস্তুতঃ মন এবং বুদ্ধিকে চেষ্টা করিয়াও এই অবস্থা হইতে নামাইয়া আনা যায় না। একটু আনিতে গেলেই ঘনিষ্ঠ রসে আকৃষ্ট হইয়া মন এবং বুদ্ধি সেই রসেই অভিনিবিষ্ট হইতে ছুটিয়া যাইতে চায়। বাহির খুঁজিয়াও মন বাহিরকে পায় না, মন অনেক বুঝিয়াও অবুঝের মত অখণ্ড এক অব্যয় রসে মজিয়া পড়ে। ভাগবতে দেখা যায়, দক্ষ যজ্ঞ ধ্বংসের পরে মুনিগণ নামরূপে ভগবানের এমন প্রকাশটিই প্রার্থনা করিয়াছেন। তাঁহারা বলিয়াছেন, আমাদের মন-বারণ সর্ব্বদা সংক্লেশ-দাবাগ্নি জ্বালায় দগ্ধ হইতেছে, তোমার কথার অমৃতময় নদীর স্পর্শ সে যদি একবার পায়, তৃষ্ণার্ত্ত সে আর কি সহজে ছাড়িতে চায়? অবগাঢ়-ভাবে তাহার মধ্যেই ডুবিয়া যায়, সংসার-সংক্লেশের দাবানলের দাহ আমাদের অনুভব হয় না। মন সেখান হইতে আর বাহির হইতে চায় না, ব্রহ্মজ্ঞানও ইহার কাছে কিছু নহে।

প্রকৃতপক্ষে এই অবস্থায় মন যখন উন্নীত হয়, তখন নাম আর বহুবার করা সম্ভব হয় না—মন নামের মাধুর্য্য-বীর্য্যে ধরা পড়িয়া যায়। নামকে সে আস্বাদন করে, নামই শ্রবণ করে। প্রকৃতপ্রস্তাবে মনের তারে নামটি লাগিবা মাত্র ঝঙ্কার আরম্ভ হয়। সব শুদ্ধ করিয়া সেই শব্দই বাজিতে থাকে এবং বাহিরের সকল কোলাহল সেই গীতির মধ্যে বিলীন হইয়া যায়। আশ্চর্য্য এই যে, সে গীতির নিবৃত্তি নাই। শুনিতে চাই না তবু শুনিতে হয়, অন্য কাজে মন দিতে গেলেও কানের মূলে আসিয়া বাজে সেই গান। দেহ, মন আকর্ষণ করিয়া মধুর গীতিরসের এই যে আপ্যায়ন তাহা হইতে বঞ্চিত হইয়া সাধকের মন অন্য কিছুতেই নিবৃত্তি মানিতে পারে না। এই অবস্থায় সব ইন্দ্রিয়ের ভিতরকার প্রাণের গতি শ্রবণের দ্বারেই ছুটিয়া যায় এবং সেখানেই স্ব স্ব রসধর্ম্মের প্রাচুর্য্যে সব ইন্দ্রিয় উন্মেষিত হয়। সাধকের পক্ষে তখন কেবল নাম শোনা এবং শোনার ভিতর দিয়া চিদ্‌ঘন রসের উজ্জীবন সত্য হইয়া পড়ে। আকাশ জুড়িয়া কান, সাধকের হৃদয় ভরিয়া বাজে গান, সর্ব্বেন্দ্রিয় ডুবাইয়া অমৃত ধারায় স্নান। সাধকের মন পিঞ্জরমুক্ত বাজ পাখীর মতন পাখা মেলিয়া নামের সেই রসময় নীড়ে প্রতি মুহূর্ত্তে উড়িয়া গিয়া পড়িতে চায়।

নামের অনুভূতিতে রসের এই যে রীতি সাধক কত যে তীব্র বেদনা দিয়া তাহা ব্যক্ত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন তাহার অন্ত বেদান্তেও নাই।

"চিত্ত পিপাসিত রে গীত-সুধার লাগি" বাঙলার কবি জাগিয়া রহিয়াছেন এই শ্রবণেরই জন্য। সে বেদনা তিনি চাপিয়া রাখিতে পারিতেছেন না। বাঙলার সাধকের কাছে দেশ, কাল সব ডুবিয়া গিয়াছে, আছে কেবল শ্রুতি। তিনি গীতিছন্দে গাহিয়াছেন—"রবি দাঁড়াইয়া শোনে গান, পবন গমন ছাড়ি, শ্রবণ-অঞ্জলি ভরি' অধর অমৃত করে পান।"

প্রকৃতপক্ষে, ভগবৎ-রাজ্যে নিত্য জীবনে অনুপ্রবিষ্ট হইতে হইলে এই শ্রবণেরই সাহায্য লইতে হয়। ভাগবত বলেন, হে দেবতা, তোমার পথ কান দিয়া দেখিতে হয়। কান জাগে আবার গানে, গান আবার দানেই রসধর্ম্মে সঞ্চারী হইয়া থাকে। কৃষ্ণনামের ভিতরে এই গান আছে, ভক্তের কাছে ভগবানের নিজকে পরিপূর্ণভাবে দান আছে। নামের ভিতর ইহাই তাঁহার বিক্রীড়া। উদ্ধব এই সত্য উপলব্ধি করিয়াই বলিলেন, নামের ভিতর তোমার বিক্রীড়া রহিয়াছে, শ্রবণে তাই তাহার এমন মিষ্টত্ব। যাহা একবার আস্বাদ করিলে অন্য কোনদিকে মানুষের স্পৃহা থাকে না। ভাগবতের একাদশ স্কন্ধে ভগবান্ নিজেও উদ্ধবকে বলিয়াছেন, 'উদ্ধব, কিছু পরিত্যাগ করিবার কর্ত্তা তুমি নহ, বস্তুতঃ পরিত্যাগ করিবার কিছুই তোমার নাই। আমার কথায় তোমার শ্রদ্ধা হইলে তুমি স্বচ্ছন্দ্যেই কামকে জয় করিয়া প্রেমের রাজ্যে প্রবিষ্ট হইতে সমর্থ হইবে।' কৃষ্ণনাম এই প্রেমের রাজ্যে আমাদিগকে লইয়া যায়। সে রাজ্য বিরাট, বিশাল এবং বৈচিত্র্যপূর্ণ। অনন্ত জীবন ও অফুরন্ত যৌবনের খেলা সেখানে চলিতেছে। কর্ম্ম এবং ধর্ম্মের যত গুরুত্ব, কৃচ্ছ্রতা সব আনন্দে সে ভূমিতে অবলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। ভগবান্ নিত্য যেখানে ক্রীড়াময় এবং সাধকও সেই ক্রীড়ার ছন্দে আনন্দসত্তায় উজ্জীবিত। এ খেলাটি কোন্ খেলা? যিনি স্ব-প্রভাব, স্ব-সম্পূর্ণ, কাহাকে লইয়া তাঁহার এই লীলা? কর্ম্মের গহন অতিক্রম করিয়া ক্রীড়ার সে অঙ্গনে প্রবেশ করিবার উপায় কি? অন্ধকার এই কারাগার হইতে আমাদিগকে বাহির করিয়া কে সেই আনন্দময় আলোকের রাজ্যে লইয়া যাইবে? এ সকল প্রশ্নের একমাত্র উত্তর হইল—তাঁহার নাম। নামের ভিতরই জ্যোতির্ময়ী শক্তি রহিয়াছে। সেই শক্তি প্রেমরসে আমাদিগকে ডুবাইয়া বুকে বুকে জড়াইয়া আমাদিগকে অমৃতের মাধুর্য্যের রাজ্যে লইয়া যাইবে। আঁধারের মধ্যে পড়িয়া যুগে যুগে পথ হাতড়াইয়া

যে পণ্ডশ্রম আমরা করিয়াছি এবং এখনও করিতে ছুটিয়াছি সে দিনের অবসান ঘটিবে। নামরূপে ভগবান্ নিজে আসিয়া জীবকে ভজনা করেন। তেমন ভজনের সংবেদনে জীব তাঁহার চরণে আত্মনিবেদন করে। এই আত্মনিবেদনেই আমাদের আমিত্বের পরিস্ফূর্ত্তি, পাকা 'আমি'র অনুবৃত্তি লাভ। ইহার ফলে ছুটে আমাদের যত তাপ। শ্রীভগবানের সম্বন্ধে এই তাপের অভাবে আমরা ফাঁকা 'আমি'র ভাবে পড়িয়াছি। নামের সম্বন্ধে চিত্ত অনুপ্রবিষ্ট হইলে শ্রীভগবানের প্রেমের অযাচিত মহিমায় আমরা নিজেদের কাঁচা 'আমি'টি হারাইয়া ফেলি। পক্ষান্তরে আমরা যদি আমাদের অহংকৃত ভাবটি লইয়া তাঁহাকে ভজনা করিতে যাই তবে ঐ 'আমিটি' থাকিয়াই .যায়। আমাদের পাকা 'আমি'র হাহাকার দূর হয় না, যায় না মনের বিকার। নামরূপে শ্রীভগবানের সর্ব্বতোময় সংবেদনে আমাদের কাছে উদয়, সব উপাধির লয়। জয় হোক্ এই নামের। নামে ভক্তি মিলে, মুক্তি মিলে, কিন্তু শুধু তাহাই নয়—টাকা পয়সাও মিলে। নামে ভবব্যাধি দূর হয়। নামে মরণের ভয় থাকে না। নাম নিজেই নামিয়া আসিয়া আমাদিগকে অযাচিতভাবে নিজের বীর্য্য ও মাধুর্য্যে অভিষিক্ত করেন।

মৃত্যুকালে কৃপাশক্তির আকস্মিকতা

ভগবান্ গীতায় বলিয়াছেন, যোগী পুরুষ প্রযাণকালে ভক্তিযুক্ত চিত্তে অবিচল মনে যোগবলে ভ্রূমধ্যে প্রাণকে সম্যকভাবে স্থাপন করিয়া তাঁহাকে লাভ করিতে পারেন। যে প্রক্রিযার কথা শ্রীভগবানের এই উক্তিতে নির্দ্দেশিত হইয়াছে, মৃত্যুকালে সাধারণ জীবের পক্ষে তাহা অবলম্বন করা সম্ভব হইতে পারে না। যাঁহারা যোগী তাঁহাদের পক্ষে এতদ্দ্বারা সাক্ষাৎ সম্পর্কে ভগবৎ-প্রাপ্তি ঘটে ইহাও মনে হয় না। কারণ প্রক্রিয়াটি সাধারণতঃ হঠযোগ সম্পর্কিত। শ্রীভগবানকে হৃদয়ে নিজের আত্মাস্বরূপে উপলব্ধি করিয়া পরে তাঁহার বিশ্বাত্মরূপের সাগরে ডুব না দিতে পারিলে জীবের পরম পুরুষার্থ সিদ্ধ হয না। যোগের পথে অনুভূতির ক্ষেত্রে সেই সাধ্যতত্ত্বটি পরোক্ষ থাকিযা যায়। বস্তুতঃ তাঁহার অভিমুখে চিত্তবৃত্তিকে প্রযুক্ত কবিবার পক্ষে একটি প্রকরণই শুধু আমরা পাই। প্রকৃতপ্রস্তাবে যোগযুক্ত অবস্থা ইহা নয়, ইহাকে বড় জোর যোগারূঢ় অবস্থা লাভের পথে অগ্রসর হইবার ধারার সন্ধান বা যোগের উদ্যোগ মাত্র বলা চলে। যুক্ত অবস্থায় কর্ম্মের উপশম ঘটে—কিন্তু এ ক্ষেত্রে কৃত্য বহিয়াছে। সাধ্যতত্ত্ব এ স্থলে সমুপদ্দিষ্ট জ্ঞান কর্ম্মের দ্বারা অনাবৃত অনন্যাভক্তি এক্ষণে মিলে না। এক্ষেত্রে বিশুদ্ধ সত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত শ্রীভগবানে স্বারসিকী অনুভূতিজনিত চিত্তবৃত্তির স্বাভাবিকী স্ফূর্ত্তি সূচিত হয় না। কেহ কেহ বলিয়াছেন যে, মৃত্যুকালে সাধারণ জীব শক্তিহীন হইয়া পড়ে। তাহার স্বাধীনতা থাকে না। কিন্তু যোগীপুরুষ তেমন শক্তিহীন হন না ; এজন্য ভগবান্ গীতায় তেমন যোগী-পুরুষদিগকে উদ্দেশ করিয়া প্রয়াণ কালীন কৃত্যের নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু প্রশ্ন এই যে, যোগীপুরুষের এই যে শক্তি, এই শক্তির রীতি প্রকৃতি কি ? বিচারে তাহা প্রতিপন্ন হয় না। কারণ, যোগীর প্রয়াণের মূলে শ্রীভগবানের আত্মভাবের পরিস্ফূর্ত্তিজনিত নিবৃত্তির ভাবটি আমরা পাই না। প্রকৃতপক্ষে যোগীর চিত্তবৃত্তি এই অবস্থায় সর্ব্বাত্মস্বরূপ ভগবদনুভূতিতে সংস্থিত নয়। সুতরাং গতি তাঁহাদের থাকিবেই।

প্রেমভক্তির রীতি কিন্তু এরূপ নয়। এই পথের সাধকদের নিজেদের কিছুই করিবার থাকে না। তাঁহারা ভগবানকে বলেন, তুমি কর, আমি দেখি। আমার কিছুই করিবার নাই। তুমিই গতি, ভর্ত্তা, প্রভু, সাক্ষী, তুমিই আমার নিবাস শরণ এবং সুহৃৎ। আমার প্রতি তোমার মায়া কত গভীর, কেমন তীব্র তোমার সেই আত্মমায়া উদ্দীপিত লীলাটি আমাকে দেখাও। বিশ্বজগতে ভগবানের অযাচিত এমন প্রেমের খেলাই চলিতেছে। প্রকৃত-পক্ষে মায়া আমাদেরই অবিদ্যাপ্রসূত চিত্তের উপহিত অবস্থা মাত্র। ভগবৎ-প্রেম ব্যক্তভাবের দ্বারা প্রভাবিত হয়। যিনি সর্ব্বত্র ভগবানের ব্যক্তভাবে প্রভাবিত হইয়াছেন এমন ভক্তের সংজ্ঞা কি? বস্তুতঃ যোগীর পক্ষে যিনি অব্যক্ত ভক্তে তাঁহারই ব্যক্তভাবে সাক্ষাৎ সম্পর্কে প্রভাব। তাঁহার সঙ্গ পাইলে শ্রীভগবানের নাম শ্রুতিপথে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া আমাদিগকে আকৃষ্ট করে এবং নামরসাকৃষ্ট চিত্তে আমরা তাঁহার কারুণ্যলীলার মাধুর্য্য বীর্য্যে ঘনিষ্ঠতা উপলব্ধি করি। ইহার ফলে আমাদের মৃত্যু-ভয় কাটিয়া যায়। "শৃন্বণ্ গৃণন্ সংস্মরয়ংশ্চ চিন্তয়ন্ নামানি রূপানি চ মঙ্গলানি তে। ক্রিয়াসু যস্তচরণারবিন্দয়ো রাবিষ্টচেতা ভবায় কল্পতে"—ভক্তই এক্ষেত্রে আশ্রয়। আশ্রয় গুরু। শ্রবণের পথে কৃপার উজ্জীবনরসের স্পর্শ অন্তরে একবার পাইলেই হইল। এমন প্রাপ্তিকেই বলা যায় জ্ঞান। এই জ্ঞানের সম্পর্কে চিত্তবৃত্তি একবার উন্মুক্ত হইলে আমাদের মনের অবচেতন স্তরে গূঢ়ভাবে তাঁহার মাধুর্য্য কাজ করিতে থাকে। New manএর ভাষায় বলা চলে, One step is enough for me. ফলতঃ নামরস জীবের শ্রবণপথে অনুপ্রবিষ্ট হইলে আত্মভাবের ঘনিষ্ঠতা সে আর ভুলিতে পারে না। প্রারব্ধ কর্ম্মফলের সংস্কারবশতঃ আমাদের মনের বাহ্যস্তরে শ্রীভগবানের মাধুর্য্যবীর্য্য আমরা সদ্য সদ্য অনুভব করিতে না পারিলেও মনের উপর প্রভাব তাহার থাকেই। প্রয়াণ-কালে আমাদের দেহেন্দ্রিয় মন প্রাণকে আলো করিয়া নামের গূঢ় বীর্য্য আত্মমাধুর্য্যে উদ্দীপিত হয়। ভগবান্ ব্যক্তভাবে প্রকটিত হন। তিনি নিজে আসিয়া আমাদিগকে উদ্ধার করেন। আমাদের তিনি পর নহেন। আমাদের জন্য এমন বেদনা তাঁহার আছে। ভক্তানুগ্রহিত চিত্তে এই বেদনা মৃত্যুকালে ব্যক্ত হয়। ভক্ত মুখোচ্চারিত শ্রীনামে শ্রদ্ধা-যুক্ত চিত্তে শ্রুতিমাত্রেই শ্রীভগবানে আমাদের রতিরস উদ্রিক্ত হয় এবং

ভগবান্ অযাচিত প্রেমের মাধুর্য্যে আমাদের চিত্ত আকর্ষণের কাজ সুরু করেন। নামের শক্তি ভগবানকে নামাইয়া আনে।

কিশোর বয়সের একটি কথা মনে পড়ে। 'অমানী মানদ কৃষ্ণ নাম সদা লবে'; চরিতামৃতের এই বাণীটি পাঠ করিয়া আমি নৈরাশ্যে অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিলাম। মনে হইতেছিল অমানীকে মান দানের উপযুক্ত হইয়া নাম করিতে হইবে, তৃণাদপি সুনীচ চিত্তে নাম করিব, ইহা তো কিছুতেই আমার পক্ষে সম্ভব নয়। যদি তেমন অবস্থা লাভ করিতে পারিতাম, তবে ত জীবনে প্রেমই মিলিত, আর নামের জন্য অপেক্ষা করিতে হইত না। এইরূপ চিন্তাযুক্ত চিত্তে রাত্রিতে স্বপ্নে এক জ্যোতির্ম্ময় পুরুষকে দেখিলাম। তিনি আমাকে বলিলেন যে, কৃষ্ণ অমানীকেও মান দান করেন, সেই কৃষ্ণের নাম লও, শ্লোকের এইরূপ ভাবটি গ্রহণ কর। ইহাব কয়েক বৎসর পর শ্রীজীব গোস্বামী পাদের ভক্তিসন্দর্ভ এবং শ্রীমৎ সনাতন গোস্বামীর বৃহদ্ভাগবত পাঠে স্বপ্নদৃষ্ট পুরুষের উক্তির তাৎপর্য্য আমার পক্ষে উপলব্ধি করা সম্ভব হইল। বুঝিলাম অমানীমানদ এবং তৃণাদপি সুনীচাদি শব্দে নামকীর্ত্তনকারীব যোগ্যতাস্বরূপে নির্দ্দেশ করা হয় নাই; তাৎপর্য্য ইহা নয়, এই সকল গুণ না থাকিলে নাম করা যাইবে না। প্রকৃতপ্রস্তাবে 'কেবলানি শ্রীভগবন্নামান্যপি নিরপেক্ষান্যেবপরম পুরুষার্থ ফলপর্য্যন্ত দানসমর্থানি' অর্থাৎ অন্য অপেক্ষা-রহিতভাবে কেবল নামই জীবের পরম পুরুষার্থ ফল স্বরূপ প্রেম পর্য্যন্ত দান করিতে সমর্থ। নামের আশ্রয় লইলে তৃণাদপি সুনীচাদিগুণ নামের কৃপায় জীবের চিত্তে পরিস্ফূর্ত্ত হয়। নাম জীবকে আসিয়া বরণ করেন। ইহার ফলে জীব প্রেমধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহাও উপলব্ধি করিলাম যে, নামেব এই প্রেমদান সামর্থ্য প্রকট করিবার জন্যই শ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলা। ফলতঃ এ যুগে জীবকে ভজনের জন্য ভাবিতে হয় না। ভগবানই জীবকে এ যুগে ভজনা করেন। জীবকে খুঁজিতে হয না ভগবানকে, ভগবানই জীবকে এ যুগে খোঁজেন। নামের আশ্রয় লইলেই প্রেমের দেবতার এই খেলা আমাদের দৃষ্টিতে উন্মুক্ত হয়। জীবের জন্য নামীর এমন আত্মভাবে উদ্দীপিত ভজনের সংবেদনে এ যুগে নামাপরাধ হইতে জীব মুক্ত হয়। নামী নিজে বৈষ্ণবরূপে ভক্তভাবে নাম অযাচিতভাবে বিতরণ করাতে বৈষ্ণবাপরাধে জীবের এ যুগে নামের প্রেম সম্বন্ধ হইতে বঞ্চিত হইবার আশঙ্কাও নিরসিত হইয়াছে। নামই

পরিভবময়ভাবে সে অপরাধ হইতে জীবকে মুক্ত করিবার ভার নিজে লইয়াছেন। এ যুগের কৃষ্ণ—গৌরকৃষ্ণ। তিনি অমানীকে মান দান করেন।

প্রকৃতপ্রস্তাবে নামের কৃপার রসে জীবের চিত্ত নিষিক্ত হইলে মৃত্যুকালে সে শক্তিহীন হইয়া পড়ে অর্থাৎ তাহার জ্ঞান থাকে না এমন কথা বলা যায় না। বস্তুতঃ অন্য বিষয়সম্পর্কে আমাদের মন তখন বিশ্লিষ্ট হয় অর্থাৎ তৎসম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান থাকে না, কিন্তু দেখা যায় নামের সম্পর্কে জীবের স্মৃতি ভগবৎ-ভাবে উদ্দীপ্ত হইয়া উঠে এবং নামের রস-সংস্পর্শজ আত্মভাবটি তাহার অনুভবে জাগ্রত হয়। এমন দেখা গিয়াছে যে, মুমূর্ষু অবস্থায় নিজের আত্মীয়স্বজনের সম্বন্ধে জ্ঞান নাই ; কিন্তু নামের শ্রবণ, মনন সম্বন্ধে চিত্তবৃত্তি সম্পূর্ণরূপে সজাগ। নিজের আত্মীয়স্বজনকে চিনিতে পারিতেছেন না, তাঁহাদের কথাও কানে শুনিতে পান না কিন্তু ভক্ত বা নামাশ্রিত ব্যক্তিকে দর্শন মাত্র তাঁহাকে চিনিতেছেন এবং তাঁহার কথা শুনিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন। তাঁহার মুখে শ্রীভগবানের নাম শুনিয়া দিব্যানন্দে তাঁহার দেহে পুলকের স্পন্দন জাগিতেছে, চিত্তে পরম প্রশান্তি তিনি অনুভব করিতেছেন। কলিকাতার রামকান্ত বসু স্ট্রীটে অশীতিপর এক বৃদ্ধা থাকিতেন। তিনি মৃত্যুকালে আমাকে দেখিবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। আমার নিকট তাঁহার আত্মীয়গণ এই ইচ্ছা প্রকাশ করিলে আমি তাঁহাকে দেখিতে যাই। তাঁহার কথা তখন বন্ধ হইয়া গিয়াছে। দর্শনের শক্তিও নাই। শ্রবণও অশক্ত হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু আমি যাইবামাত্র তিনি আমাকে চিনিতে পারিলেন। আদরের সঙ্গে আমার হাতখানা ধরিয়া ফেলিলেন। বারংবার আমার মুখের দিকে তাকাইতে থাকিলেন এবং কানে হাত দিয়া আমাকে নাম শুনাইতে বলিলেন। আমি নাম শুনাইতে লাগিলাম। বৃদ্ধার দুই চোখ দিয়া আনন্দাশ্রু বিগলিত হইয়া পড়িতে লাগিল। মনে হইল তিনি পরম শান্তি অনুভব করিতেছেন। তাঁহার যাঁহারা অত্যন্ত প্রিয়—তাঁহারা তাঁহাকে সম্বোধন করিতেছিলেন, কিন্তু তাঁহাদের দিকে তাঁহার দৃষ্টি ছিল না। তিনি তাঁহাদের কাহারও কথা যে শুনিতে পাইয়াছিলেন ইহা মনে হইল না। এমন আরও ঘটনা আমি প্রত্যক্ষ করিয়াছি। বস্তুতঃ উপাধির বিচার কিংবা অধিকারীর যোগ্যতার অপেক্ষা এক্ষেত্রে নাই। মৃত্যুমুখে নামের সম্বন্ধে ভগবদনুস্মৃতি এমন ভাবে ছন্দায়িত হইয়া থাকে। অধিকারের আপেক্ষিকতা

থাকিলে আমাকে দেখিয়া উক্ত মুমূর্ষু মহিলার চিত্তে ভগবৎ-স্মৃতি উদ্দীপিত হইত না। কারণ নামে রতি আমাদের জন্মে নাই। এই প্রেম সম্বন্ধে সর্ব্বাবস্থার মধ্যে সর্ব্বচিত্তে এমন উজ্জীবন সামর্থ্যই কলিযুগে নামের বিশিষ্টতা। অন্যান্য যুগেও নামের মাহাত্ম্য বিদ্যমান ছিল, কিন্তু সর্ব্বজীবকে প্রেমদানের সামর্থ্যে নামে বীর্য্য বা মাধুর্য্য ছিল না। কলিযুগে শ্রীমন্মহাপ্রভু অবতীর্ণ হইয়া নামের সাহায্যে অযাচিত ভাবে প্রেম বিতরণ করিয়াছেন। স্বয়ং নামী নিজ নাম আস্বাদন করিয়া তাহার রস-সংবেদন সর্ব্বত্র উদ্দীপিত করিয়াছেন। নামের সঙ্গে নামীর অঙ্গাঙ্গীভাবে নিত্য সম্বন্ধে প্রমূর্ত্ত এই গৌরাঙ্গ-লীলা। অঙ্গের সম্বন্ধে অঙ্গীর এই অনঙ্গ-দীপন-রঙ্গে এই লীলারস সর্ব্বাত্মস্নপন। যে কোন ভাবে নামের সম্পর্কে গেলেই নামীকে এ যুগে পাওয়া যায়। এ যুগে নামের সঙ্গে নামীর এমনই সকলের চিত্তকে আকর্ষণ করিবার উপযোগী কারুণ্যের খেলায় তাঁহার বদান্য মহিমায় অপরিচ্ছিন্ন সম্মূর্ত্তিতে পরিস্ফূর্ত্তি এবং তৎসম্পর্কিত বীর্য্য-সংস্পর্শে জীবের পরম প্রয়োজনের পরিপূর্ত্তি ঘটে। প্রকৃতপ্রস্তাবে গুরূপদিষ্ট পথে নামরসাকৃষ্ট হইবার সৌভাগ্য যিনি জীবনে লাভ করিয়াছেন, নামের প্রেম-বীর্য্যের সংবেদনে ভগবানই তাঁহার বশীভূত হইয়া পড়েন। মৃত্যুকালে তিনি অবশ হন না। তাঁহার প্রতীয়মান অবশ অবস্থা স্মৃতিমূলে শ্রুতিপথে ভগবৎ-লীলারস-স্পর্শের জন্য গভীর আকূতি বা সর্ব্বতোভাবে ভগবচ্চরণে আত্মনিবেদনের জন্য সংবেদনই সূচিত করে। প্রকৃতপ্রস্তাবে ভগবানকেই নামরসাকৃষ্ট এমন ভক্তের বশে অবশভাবে আসিয়া পড়িতে হয় এবং সর্ব্বৈশ্বর্য্যবিনির্ম্মুক্তসৌলভ্যে মুমূর্ষু জীবের কাছে তাঁহাকে ধরা দিতে হয়। অবশ অবস্থায় আস্বাদিত নামে শ্রীভগবানের ভক্তবশে অঘোঘনাশে প্রেমভক্তির বিলাস-লীলা এইভাবে জয়যুক্ত হইয়া থাকে।

পরিশিষ্ট

দুই দিনের অভিজ্ঞতা*

১৩৫৬ সনের ৫ই আষাঢ় আমাব জীবনের বড়ই একটি সৌভাগ্যের দিন। এইদিন অপরাহ্নকালে ট্রামের নীচে পড়িয়া আমার ডান পা খানা কাটা যায়। পা কাটা যাওয়ার এই ব্যাপারকে আমি কেন সৌভাগ্যের বিষয় বলিতেছি, এ সম্বন্ধে হয়ত অনেকের মনে প্রশ্ন উঠিবে; কারণ ট্রামের নীচে পড়িয়া পা কাটা গিয়াছে, ইহা আমার পক্ষে বীরত্বের বিষয় কিছুই নয়, কিম্বা তাহা গর্ব্ব করিবাব বিষয়ও নহে, কারণ আমার পা কাটা যাওয়াতে কাহারও পক্ষে কোন কল্যাণ সাধিত হইয়াছে বলিয়া আমি মনে করি না। যদি পরের জন্য কোন কাজ করিতে গিয়া আমার পা খানা এইভাবে কাটা যাইত, তবে অবশ্য নৈতিক দিক হইতে নিজের মাহাত্ম্য বৃদ্ধি করিবার জন্য ঐভাবে পা কাটা পডা আমার পক্ষে সৌভাগ্যের বিষয়, এই কথা বলিলে হয়ত কিছুটা মানাইত। কিন্তু এই দুর্দ্দৈবকে আমি সৌভাগ্যের বিষয় বলিতেছি অন্য দিক হইতে। এই ঘটনার পর নানাভাবে অনুগ্রহ এবং অনুকম্পার ধারা আমার জীবনকে অভিষিক্ত করিয়াছে। আমার মত একজন সামান্য লোকে যে এত অনুগ্রহ এবং অনুকম্পা লাভ করিতে পারে এটা আমার ধারণার অতীত ছিল। প্রকৃতপক্ষে ঐদিবস আহত অবস্থায় মেডিকেল কলেজের প্রিন্স অব ওয়েল্‌স্ হাসপাতালে নীত হইবার পর সে স্থানটি আমাব পক্ষে পুণ্যক্ষেত্রে পরিণত হয়। বাংলা দেশের কত কৃতী সন্তান, সাধক, ভক্ত, সাংবাদিক এবং সাহিত্যিক যাঁহারা সমাজের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া আছেন, তাঁহারা আমাকে দর্শন দান করিয়া কৃতার্থ করিয়াছেন। জননীগণের স্নেহ হইতেও আমি বঞ্চিত হই নাই। মায়েরা কেহ কেহ গিয়া আমার দুর্দ্দশা দেখিয়া অশ্রুবর্ষণ করিয়াছেন। আমি সামান্য ব্যক্তি। ট্রামের নীচে কাটা পড়িয়া আমার প্রাণ গেলেও কাহারও কিছু আসিয়া যাইত না। তবুও আমার মত একজন অকৃতজ্ঞ, অভাজনের প্রতি

* 'শ্রীহৃদর্শন' পত্রিকায ১৩৫৬ সালেব কার্ত্তিক এবং ফাল্গুন সংখ্যায প্রকাশিত হইয়াছিল।

এই যে সহৃদয়তা প্রগাঢ় এবং প্রাণময় এই যে অনুকম্পা ইহা ভগবানের আশীর্ব্বাদ বলিয়া আমি মনে করিতেছি এবং ইঁহাদের প্রত্যেককে আমি নরনারায়ণজ্ঞানে বন্দনা করিতেছি। আমি কর্ম্মফলে বিশ্বাসী। জানি, জীবনে অনেক পাপ করিয়াছি। শুধু তাহাই নয়, প্রকৃতপক্ষে এমন কোন দুষ্কর্ম নাই যাহা আমার দ্বারা কৃত হয় নাই। বস্তুতঃ আজ আমি সেই পাপের ফলই ভোগ করিতেছি—এই আমার বিশ্বাস। কিন্তু হৃদয়বত্তা বিচারের অপেক্ষা করে না। আমার দুঃখ দেখিয়া যাঁহারা বিচলিত হইয়াছেন তাঁহারাও তাহা করেন নাই। কিন্তু নিজের কথা বলিতে গেলে আমাকে ইহাই বলিতে হইতেছে যে আমার এই ভাবে পা কাটা যাওয়াতে আমার কোন ক্ষতি হয় নাই বরং আমি বিশেষ ভাবেই লাভবান হইয়াছি। আমার প্রথম লাভ আমার প্রতি মহানুভব ব্যক্তিদের এবং জননীগণের অপরিসীম অনুকম্পা। আমি জীবনে তাহা বিস্মৃত হইতে পারিব না। এই রকম অনুগ্রহ ও অনুকম্পা আমার সম্বল স্বরূপ হইয়া থাকিবে এবং সত্য কথা বলিতে কি, এত বড় সম্বল আমি জীবনে কোন দিন সংগ্রহ করিতে পারি নাই। কিন্তু ইহাই সব কথা নয়। আব একটি কথা এই যে, এই দুর্য্যোগের ভিতর দিয়া আমি এই সত্য উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইয়াছি যে, প্রকৃত ভয় মরণের মধ্যে নাই। প্রকৃতপক্ষে জীবনের যেখানে হিসাব ভয়ের প্রভাব সেখানেই। মৃত্যুর এই অমৃতময় মাধুরী আমার জীবনে এ দুর্দ্দৈবের ভিতর দিয়া দীপ্ত হইয়া উঠিয়াছে। সঙ্কটের সূর্য্যকিরণে শ্রীভগবানের অপূর্ব্ব প্রেমের প্রভাব কুহকের মত আমার জীবনকে স্পর্শ করিয়া গিয়াছে।

বলা বাহুল্য, আমি spiritualist নই। মৃত্যুর পারে গিয়া ভ্রাতা, ভগ্নী বন্ধুদের সহিত মিলনকে যাঁহারা পুরুষার্থ বলিয়া অভিহিত করিতে চান, আমি তাঁহাদের মত সমর্থন করিতে পারি না। আমার বিশ্বাস এই যে, যদি সকলকে আপনার করিয়া না পাওয়া যায় তবে শুধু আত্মীয়স্বজনকে মৃত্যুর পরে পাইলেই জীব আনন্দময় তাঁহার প্রকৃত সত্তায় প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। ভাই, বন্ধু, আত্মীয়-স্বজন, ইহাদিগকে পাইলে মনের পরিপূর্ণ সঙ্গতি লাভ করা সম্ভব নয়, কারণ ইহারা সকলেই অনিত্য দেহধারী জীব। বস্তুতঃ নিত্য সত্য স্বরূপ যিনি, তাঁহাকে পাইলেই মাতা, পিতা, ভাই, বন্ধু সকলকে পাওয়া হয়। তাঁহাকে না পাইলে কোন পাওয়াই পাওয়া নয়, কোন লাভই একান্ত

লাভ নহে ; সবই লোকসানের ব্যাপার। ভাগবতে নারদ ঋষি হর্য্যশ্বদিগকে যে কথা কয়েকটি বলিয়াছেন, বাল্যকাল হইতে সেই উক্তি আমার অন্তরে গাঁথা রহিয়াছে। যদি ভগবান্‌কেই না পাওয়া গেল, তবে জীবনে কি লাভ?

"এক এবশ্বেরস্তর্য্যো ভগবান্ স্বাশ্রয়ঃ পরঃ।
তমদৃষ্টা অভবম্ পুংসঃ কিমসৎ কর্ম্মভির্ভবেৎ॥'

ভগবানই একমাত্র আপনার। তিনি ছাড়া জীবের অন্য কোন আশ্রয় নাই। যাহাতে তাঁহাকে পাওয়া যায় না এমন অসৎকর্ম্ম করিয়া কি লাভ?

কিন্তু ভগবানকে এইভাবে আপনার একান্ত করিয়া ভাবনা করা নানা দিকের আকর্ষণ ছাড়িয়া তাঁহাকে লাভ করিবার জন্য সাধনা কিম্বা সেজন্য বেদনা বোধ কবা সকলের পক্ষে সম্ভবপর নয়। সুতরাং আশ্রয়হীন এবং অসহায়ত্ব তাহাদের থাকিবেই। বিচারের দ্বারা কিম্বা বুদ্ধির কসরৎ খাটাইয়া এই অসহায়ত্ব জয় করা সম্ভব নয়। ভাগবতে দেখিতে পাই, চিত্রকেতুর মাহাত্ম্য বর্ণনা প্রসঙ্গে ভগবান্ শঙ্কর বলিয়াছেন :—

"নারায়ণপবাঃ সর্ব্বে ন কুতশ্চ ন বিভ্যতি।
স্বর্গাপবর্গনরকেম্বপি তুল্যার্থদর্শিনঃ॥
দেহিনাং দেহসংযোগাদ্দ্বন্দ্বানীশ্বরলীলয়া।
সুখং দুঃখং মৃতির্জন্ম শাপোহনুগ্রহ এব চ॥
অবিবেককৃতঃ পুংসো হ্যর্থভেদ ইবাত্মনি।
গুণদোষ-বিকল্পশ্চ ভিদেব স্রজিবৎ কৃতঃ॥
বাসুদেবে ভগবতি ভক্তিমুদ্বহতাং নৃণাম্।
জ্ঞান-বৈরাগ্য-বীর্য্যানাং ন হি কশ্চিদ্ব্যপাশ্রয়ঃ।

অর্থাৎ হরিভক্তিপরায়ণ, স্বর্গ, মুক্তি এবং নরক সবই তাঁহাদের পক্ষে সমান। তাঁহারা কিছুতেই ভীত হন না। অবিবেকবশতই সুখ, দুঃখ, জন্ম, মৃত্যু, শাপ, অনুগ্রহ, দেহদ্বারা জীবকে এগুলি ভোগ করিতে হয়। অজ্ঞানতাই ইহার কারণ। ভগবানের প্রতি যাঁহারা ভক্তিসম্পন্ন তাঁহারা আপনা হইতেই জ্ঞান, বৈরাগ্য লাভ করিয়া থাকেন। সে সকল ব্যক্তির পক্ষে অন্য কিছুর জন্য অপেক্ষা করিতে হয় না। কিন্তু বিষ্ণুভক্তি সুদুর্লভা। শ্রীভগবান গীতায় বলিয়াছে,—"বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি স মহাত্মা

সুদুর্লভঃ।” সত্যই আমার মত সাধন-ভজনহীন বদ্ধজীব বিষ্ণুভক্তির কথা মুখেও উচ্চারণ করিতে পারে না। কিন্তু আমার এই দুর্দৈব হইতে বুঝিলাম, ভগবান শুধু সাধকেরই নহেন, সর্ব্বভূতেরই তিনি প্রিয় এবং সকলের প্রতিই তিনি অনুকম্পাপরায়ণ। শাস্ত্র বলিয়াছেন—“সর্ব্বভূতপ্রিয়ো হরিঃ”। যে নিতান্ত পাপী এবং সংসারের সর্ব্ববিধ তাপে তাপী, দয়াময় শ্রীভগবানের অনুকম্পা লাভে সেও বঞ্চিত হয় না। প্রেমময়ের কল্যাণ হস্ত পাপী তাপী সকলকেই কোলে তুলিয়া লইবার জন্য সম্প্রসারিত রহিয়াছে। তাঁহার দয়ার অন্ত নাই।

ব্যাপারটাকে খুলিয়া বলিতেছি। গত আষাঢ়ের ৫ই তারিখ অপরাহ্নকালে আমি আফিসে যাইবার জন্য বাসা হইতে বাহির হই। আকাশ ঈষৎ মেঘাচ্ছন্ন ছিল। বহিঃ-প্রকৃতির সেই গাম্ভীর্য্যের ছন্দ সূর্য্যের স্তিমিত আলোকে আমার মনে গোপন চিন্তার কণাগুলিকে ঘনাইয়া তুলিতেছিল। অজামিলের প্রতি ভগবানের পরম অনুগ্রহের কথা ঐদিন সকালে ভাগবত লইয়া পড়িয়াছিলাম। তাহারই একটা অনুধ্যান আমার মন-বুদ্ধিকে যেন আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছিল। শ্রীভগবানের করুণার কথা স্মরণ করিয়া মাঝে মাঝে আমি নিজেরই অজানায় যেন কি জন্য অশ্রুবর্ষণ করিতেছিলাম। আফিসের কাছে ট্রাম আসিয়া থামিলে নামিবার জন্য যেমনি পা বাড়াইলাম অমনি ট্রামের নীচে আমার ডান পা পড়িয়া গেল। ইহার পরে যাহা ঘটিল, আমি নিজের বুদ্ধিতে যতদূর বুঝিয়াছি তাহাই বলিবার চেষ্টা করিব। ইহার মধ্যে তত্ত্ব প্রকাশের কোন প্রয়াস আমার নাই এবং সেরূপ দার্শনিকতা এবং বিদ্যা বুদ্ধিরও আমার অভাব। আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের চৌকাঠ মাড়াই নাই। আধুনিক মনোবিকলন বিদ্যা বুঝিবার মত বুদ্ধির সামর্থ্য এবং তীক্ষ্ণতাও আমি লাভ করি নাই।

ট্রামের নীচে পড়িয়া গেলেও আমি যে ট্রামের নীচে পড়িয়াছি ইহা বুঝিয়া উঠিতে পারি নাই। কতকটা সময় পরে বুঝিয়াছি। ডাঃ লিভিংষ্টোন্ সিংহের মুখে পড়িয়াছিলেন। তিনি সেই কাহিনী বর্ণনা করিতে গিয়া লিখিয়াছেন; এ সময় তাঁহার অবস্থা কতকটা মোহাবিষ্টের মত হইয়া পড়ে। এইজন্য তিনি সজ্ঞানে যন্ত্রণা অনুভব করিতে পারেন নাই। ডাঃ লিভিংষ্টোন্ ভগবদ্ভক্ত পুরুষ ছিলেন। আফ্রিকার গভীর অরণ্যে নর-নারায়ণের সেবায়

তিনি জীবন দান করেন। তাঁহার অবস্থা উপলব্ধি করিবার সামর্থ্য আমার নাই। তবে আমি এতটুকুই বলিতে পারি যে, অজ্ঞান অবস্থা বলিতে যাহা বুঝায় কিম্বা ক্লোরোফর্ম প্রভৃতি প্রয়োগে যে মানসিক অবস্থা সৃষ্ট হয় আমার তা হয় নাই। আমার সম্পূর্ণ জ্ঞান ছিল। ট্রামের নীচে পড়িয়া যাইবামাত্র আনন্দের একটা ছন্দ যেন আমার দেহ ও মনে নাড়া দিয়া উঠিল। আচম্বিতে চারিদিকে একটা আলোড়ন আমি উপলব্ধি করিলাম। একটা জ্যোতির ঝিলিক চারিদিক উজ্জ্বল করিয়া তুলিল। কেহ কেহ ছুটিয়া আসিতেছে, এইরূপ পদধ্বনি আমি শুনিতে পাইলাম। দ্রুততা এবং ব্যস্ততার এমন প্রতিবেশের মধ্যে আমাকে রক্ষা করিবার জন্য ব্যগ্রভাবে কতকগুলি শক্তির ক্রিয়া হইতেছে, বেশই মনে হইল। কিন্তু এই রক্ষা-চেষ্টার সুস্পষ্ট স্বরূপ কিম্বা লীলা আমি বুঝিতে পারি নাই। তবে যেন শুনিতে পাইলাম দূর হইতে এইরূপ ধ্বনি আসিতেছে—যাও, যাও, ছুটিয়া যাও, কে বলিতেছে এ কথা, কাহাকে বলিতেছে, বুঝিলাম না। ঐ ধ্বনি কানের কাছে আসিয়া 'ভয় নাই', 'ভয় নাই', এরূপ অভিব্যক্তিতে পরিণত হইল। আমার প্রাণধারার গতি বাহির হইতে মোড ঘুরিয়া ভিতরের দিকে চলিয়া গেল। শুনিলাম, সহস্র কণ্ঠে হরিনাম হইতেছে। মেঘের গম্ভীর মন্ত্রে ছন্দোময় সেই ধ্বনি। সে ধ্বনির গমকে ঠমকে উচ্ছল জলদল কল্লোলের স্পর্শ-পুলকে আমার অন্তর ভরিয়া গেল। উঠিল আবর্ত্ত, সেই আবর্ত্তে চিত্তবৃত্তির উদ্দাম নৃত্য অনুভব করিলাম। লহরে লহরে অজস্র ধারার অমোঘবীর্য্যে অসম্ভূত মাধুর্য্যে করুণা-প্রবাহ-সঞ্চারে দেহ, মন, প্রাণকে পরিব্যাপ্ত করিয়া অনির্ব্বচনীয় প্রগাঢ় প্রিয়ত্বে আনন্দরসোজ্জ্বল উদ্দীপ্তি আমাকে অভিভূত করিয়া ফেলিল। সর্ব্বাত্মভাবের অপরিচ্ছিন্ন এবং অপ্রতিরুদ্ধ-সংবেগ-সমুচ্ছ্বসিত রসের উল্লাসে আমি আবিষ্ট হইয়া পড়িলাম। যে দিকে তাকাই বাজিতেছে মধুর সুর, মধুর হইতে মধুর, তাহা হইতে অতি সুমধুর। রাস্তা ঘাটে লোকজনের আর সে চেহারা নাই। চারিদিকে জগৎ অন্য, যাহাদিগকে দেখিতেছি, যাহা দেখিতেছি তাহাও অন্য। প্রথমটা বাহিরের দিকে নিজের দৃষ্টি যায় নাই। বাহ্য বিষয় বিস্মৃত হইয়া পড়িয়াছিলাম। দৃষ্টি শুধু ভিতরের দিকে নিবদ্ধ ছিল। পূর্ব্বে যে জ্যোতি ঝিকরাইয়া পড়িতে দেখিয়াছিলাম, দেখিলাম বিদ্যুৎ-বলয় তরঙ্গে তরল

উজ্জ্বল জ্যোৎস্নাধারায় বিচ্ছুরিত এবং বিকশিত হইয়া তাহা দিগন্তে পরিব্যাপ্ত হইয়াছে। জ্যোতির সেই তরঙ্গ-তটে মুনিগণ, ঋষিগণ করজোড়ে বন্দনা করিতেছেন। তাঁহাদের সকলের মুখেই জয়, জয়, এই ধ্বনি। ইহাদের সকলের অঙ্গই জ্যোতির্ময়। দেখিতে না দেখিতে এই জ্যোতির বিলাসে অপর একটি মূর্ত্তি প্রকাশ পাইল। সেই মূর্ত্তি বালগোপাল মূর্ত্তি। আমি কথায় শুধু বাহিরের কিছুটাই বলিতেছি, ভাষায় ভাবের ব্যঞ্জনাকে ব্যক্ত করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। দেখিলাম, জ্যোতিব তরঙ্গ-শীর্ষে এই বালগোপাল মূর্ত্তি হাসিতেছে, দুলিতেছে। তাঁহার চরণের ভঙ্গিতে ভঙ্গিতে লীলার তরঙ্গ ব্যাপ্ত হইয়া পড়িতেছে। আমার মনকে আসিয়া সেই তরঙ্গ স্পর্শ করিতেছে। দেহ এবং মনে এত আনন্দ হইতেছে যে, আমি সে আনন্দ ধরিয়া রাখিতে পারিতেছি না। কিন্তু এইখানেই লীলার শেষ নয়। ঐ জ্যোতিস্তরঙ্গে আরও এক নূতন কম্পন উঠিল। চারিদিকে মধুর গন্ধের ঘ্রাণ পাইলাম। যুগল লীলা-বিলাসের রূপ-সাগরে আমি ডুবিয়া গেলাম। আনন্দের হিল্লোলে আমার দেহমন দোলাইতে লাগিল। এইরূপ অবস্থায় শরীরের যন্ত্রণা যে বিস্মৃত হইব, ইহা বিচিত্র নয়।

কিন্তু লীলার এই মাধুর্য্য দীর্ঘ সময় স্থায়ী হয় নাই। তবে দুই তিন দিন পর্যন্ত ইহার প্রভাব আমার মনের উপরে কাজ কবিয়াছে। ভঙ্গীটি সব সময় আমার চোখের সামনে খেলিয়াছে, এবং ইহার বিচিত্র বর্ণ-বিলাস দেহ ও মনের উপর যতই বিস্তার লাভ করে, ততই আমি যেন অভিভূত হইয়া পড়ি। লীলার প্রত্যক্ষ সংস্পর্শ হইতে আমার মনের গতি ক্রমে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িতে থাকে; তবে সে ছবি একেবারে নিভিয়া যায় নাই।

এইবার দ্বিতীয় দিনের কথা। আমি দেখিলাম কয়েকজন চিকিৎসক আমাকে ঘিরিয়া রহিয়াছেন। তাঁহারা ব্রস্তভাবে কেহ আমার পায়ের ব্যাণ্ডেজ কাটিয়া ফেলিয়া সেখানে পরীক্ষা করিলেন, কেহ আমার নাসিকার বাহিরে হাত দিয়া বায়ুর গতির কি অবস্থা দেখিলেন, কেহ কানের চামড়া হাত দিয়া সম্ভবতঃ উষ্ণতা অনুভব করিতে চেষ্টা করিলেন। সকলের মুখেই উদ্বেগের ছায়া পড়িয়াছে। সকলের মুখ মলিন এবং বিবর্ণ। এই সব চিকিৎসকদের মধ্যে কয়েকজনকে আমি পূর্ব্বে দেখি নাই। সম্ভবতঃ

তাহাদিগকে সংবাদ দিয়া আনা হইয়াছিল। আমার নাকে অক্সিজেনের নলটি আমি পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম, চিকিৎসকদের মধ্যে একজনকে নিকটে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, এটি কি? তিনি বলিলেন, আমরা আপনাকে একটু সাজাইয়া দিয়াছি। আমি মৃদু হাস্য সহকারে বলিলাম, এখনই কেন? সাজাইবার সময় এখনো তো আসে নাই।

একজন চিকিৎসক আমার মুখের কাছে মাথা নোয়াইয়া মৃদুস্বরে আমাকে বলিলেন, বঙ্কিমবাবু, আপনার স্ত্রী আর ছেলেমেয়েরা আসিয়াছেন। আপনি কেমন আছেন ইহাদিগকে বলুন। আমি তাকাইলাম, কিন্তু তাহাদের কাহাকেও দেখিতে পাইলাম না। পরম আনন্দের মাধুর্য্যোজ্জ্বল প্রতিবেশে ঘনিষ্ঠভাবে প্রীতিময় ছন্দের অনুভূতিতে আমার চিত্তবৃত্তি নিমগ্ন হইয়া যাইতেছিল। বাহিরের সব ব্যাপার ছবির মতন অস্পষ্ট বোধ হইতেছিল। প্রকৃতপক্ষে একটা মূর্ত্তি অন্তররসে মাখামাখি হইয়া আমার দৃষ্টিপথ জুড়িয়া হেলিতেছিল, দুলিতেছিল, খেলিতেছিল। যাহা কিছু আমি দেখিতেছিলাম, সেই মূর্ত্তির ফাঁকে ফাঁকে তাহার ভাবে মাখামাখি হইয়াই সেগুলি আমার অনুভূতিতে জাগিতেছিল। আমি আমার আত্মীয়স্বজন কাহাকেও তখন দেখিতে পাই নাই সম্ভবতঃ কৃপারসে চিত্ত নিষিক্ত হওয়ার ফলে অহং-মমতার বন্ধন হইতে মনের মুক্ত অবস্থার ক্রমস্বরূপে আমার এইরূপ উপলব্ধি হয়। বাহিরের এই সব অবস্থা দেখিয়া আমি বরং অনেকটা কৌতুকবোধ করিয়াছি; অভযন্তের যে মাধুরী আমি অন্তরে উপলব্ধি করিয়াছিলাম দেহসম্পর্কিত চেতনায় কয়েক দিন পরে তাহা স্তিমিত হইয়া পড়ে। কিন্তু এই ঝাঁকুনিতে আবার তাহার ঔজ্জ্বল্য ফুটিয়া উঠিল। অনুকম্পার একান্ত স্পর্শ আমার মৃত্যুভয় ভুলাইয়া দিল। আমি জীবনের সনাতনত্ব উপলব্ধি করিয়া সম্পূর্ণ স্বস্তি এবং স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করিতেছিলাম।

হাসপাতাল হইতে ঘরে ফিরিয়া আসিলে, অনুকম্পার সেই অপূর্ব্ব প্রভাব আমার মনে আর তেমন উজ্জ্বল নাই। কিন্তু যাহা উপলব্ধি করিয়াছি, মনের মূল হইতে তাহা মুছিয়া ফেলিতেও পারিতেছি না। কৃপার সঞ্চার বোধ হয় আমার অহঙ্কারের স্পর্শে সরিয়া চলিয়া গিয়াছে। কিন্তু দয়াময় শ্রীভগবানের কৃপা যে সকল সময় আমার মতন অভাজনের উপরও রহিয়াছে

এ বিচার এখনও চলিতেছে এবং তাহা আমার মনকে বিনিশ্চিত করিতে চেষ্টা করিতেছে।

আমার ন্যায় সামান্য ব্যক্তির দৈন্যময় জীবনে এ লাভ কম লাভ নয়, এ সম্বল চিরদিনের সম্বল। অনুকম্পার এই স্মৃতি আমার ন্যায় গতিহীনের একমাত্র গতি। সুতরাং আমার পা কাটা যাওয়াতে ক্ষতি অপেক্ষা লাভই অধিক হইয়াছে। আমাকে এ কথা বলিতে হইতেছে। বস্তুতঃ আমার পা'খানা কাটা না গেলেও বা কি হইত? শরীর আমার বহুদিন হইতেই রুগ্ন। জরায় আমি জীর্ণ এবং সাতান্ন বৎসর এই বয়সে বায়ুরোগে অবসন্ন। আমার পা থাকা সত্ত্বেও জরাজীর্ণ দেহ লইয়া আমি স্বচ্ছন্দে চলাফেরা করিতে পারিতাম না। দুই পা চলিতেই বুক কাঁপিয়াছে, হৃদয় অবসন্ন হইয়াছে এবং মুহুর্মুহু মৃত্যু ভয়ে আমি ভীত হইয়াছি। এই অবস্থায় বাহিরের এই ক্ষতির পরিবর্ত্তে আমি চিরদিনের যে সঙ্গতি লাভ করিলাম তাহার কি তুলনা আছে? প্রকৃতপক্ষে আমার কোন ক্ষতি হয় নাই। আমি আমার এ দুর্দ্দৈবে ভগবানের কৃপাকে উপলব্ধি করিতে পারিয়াছি। বিপদের মধ্যে তাঁহার দানের পরম প্রভাব আমি প্রত্যক্ষ করিয়াছি। আজ আমি সেই কৃপার দিকেই শুধু তাকাইয়া আছি। আমার ভরসা এই আছে যে, বিপদের সময়ে যিনি তাঁহার অভয়ত্বের ঐশ্বর্য্যের মাধুর্য্যে অযাচিতভাবে আমাকে রক্ষা করিয়াছেন, ভবিষ্যতে মহাবিপদের মুখেও তিনি আমাকে কোলে তুলিয়া লইবেন। জীবনের শেষ কয়টা দিন আমি যেন শুধু তাঁহার দিকেই তাকাইয়া থাকিতে পারি।

বিপ্লবী বৈষ্ণব*

বঙ্কিমচন্দ্রের জন্মের পূর্ব্ব হইতেই তাঁহার জীবনীর সূচনা দেখিতে পাওয়া যায় একটি স্বপ্নের মধ্য দিয়া। বঙ্কিমচন্দ্রের জননী পুত্র কামনায় বিভিন্ন দেবমন্দিরে গিয়া মানত করেন। যখন তিনি অন্তঃস্বত্ত্বা তখন একদিন এক আশ্চর্য্য স্বপ্ন দেখেন। স্বপ্নের সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই যে "কতকগুলি বৈষ্ণব যেন বর্ষার ভরা নদীতে নৌকায় আরোহণ করিয়া তাঁহাদের বাড়ির প্রাঙ্গণে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহাকে লইয়া কোন একটি মন্দিরে পূজার জন্য গেলেন। শাক্ত ও বৈষ্ণবে চির বিরোধ ইহা অবশ্য সকলেই জানেন, তাই বঙ্কিম-জননী যখন দেখিলেন যে মন্দিরে বিগ্রহের সিংহাসনে কালীমূর্ত্তি রহিয়াছেন তখন তিনি একটু আশ্চর্য্যই হইলেন। কিন্তু দেখিতে দেখিতে সেই মূর্ত্তি যেন পরিবর্ত্তিত হইয়া রাধাকৃষ্ণের যুগল মূর্ত্তিতে পরিণত হইল।"

স্বপ্নতত্ত্ববিদেরা বলেন, স্বপ্নের ভিতর দিয়াই মনের অবচেতন স্তরের চিন্তাধারার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। অতএব এই স্বপ্নের ব্যাখ্যা এই যে, বঙ্কিম-জননীর মনের গভীর স্তরে কালী ও রাধাকৃষ্ণের একত্ব গূঢ়ভাবে মুদ্রিত হইয়াছিল, যদিও তিনি জানিতেন না।

এইরূপ আরও অনেক স্বপ্নের কথা এই গ্রন্থে আছে এবং প্রত্যেক স্বপ্নের সহিত বঙ্কিমচন্দ্রের ভবিষ্যৎ জীবন জড়িত। এমনকি তিনি যে ট্রাম হইতে পড়িয়া গিয়া গুরুতর আঘাত পাইবেন তাহাও তিনি অনেক দিন আগেই স্বপ্নে দেখিয়াছিলেন।

অত্যন্ত দারিদ্র্যের মধ্যে তাঁহার জীবনের আরম্ভ। তাঁহার তিনবার দারপরিগ্রহ করিতে হয়, কেননা প্রথম দুই স্ত্রী খুব অল্প দিনই জীবিত ছিলেন। মাত্র পনেরো বৎসর বয়সে তাঁহার প্রথম বিবাহ হয়। সেই সময় পূর্ব্ববঙ্গে জাতীয় আন্দোলন আরম্ভ হয়। জনসেবা, শিক্ষা বিস্তার প্রভৃতি

* শ্রীসরলাবালা সরকার লিখিত 'দেশ' ৩১শে জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৪ সংখ্যা হইতে উদ্ধৃত।

লইয়াই যদিও এই আন্দোলন আরম্ভ হয়, কিন্তু তাহারই ভিতর প্রচ্ছন্নভাবে ছিল বৈপ্লবিক আন্দোলনের উৎস। যশোহর জেলায় নীল-কর বিদ্রোহ অবলম্বন করিয়া এই বৈপ্লবিক আন্দোলন যখন প্রবল আকার ধারণ করে, তখন স্বামী কেশবানন্দ ছিলেন সেই আন্দোলনের অন্যতম নেতা। এই গ্রন্থে তাঁহার সম্বন্ধেও পাঠকগণ কিছু কিছু জানিতে পারিবেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের পিতা ডাকঘরে অল্প মাহিনায় কাজ করিতেন। তাঁহার মৃত্যুর পর পরিবারের এক বেলা অন্ন জোটাও কঠিন হইল, বঙ্কিমচন্দ্র এই সময় মাগুরা হাইস্কুলে ১৫৲ টাকা মাহিনায় একটি কাজে ভর্ত্তি হন। তাহার পর স্বর্গীয় ঐতিহাসিক রামপ্রাণ গুপ্ত মহাশয় তাঁহার নিজের গ্রামের স্কুলে ২০৲ টাকা মাহিনায় শিক্ষকতার কার্য্যে বঙ্কিমচন্দ্রকে নিযুক্ত করেন। ইহার পর রেলী ব্রাদার্সের পাটের কাজেও তিনি ভর্ত্তি হইয়াছিলেন; কিন্তু সে কাজে দুর্নীতির প্রাবল্য দেখিয়া তাঁহাকে বাধ্য হইয়া জীবনের উপায় স্বরূপ সেই কাজটি ছাড়িয়া দিতে হইয়াছিল। ইহার পরে তিনি কলিকাতায় আসিয়া বেঙ্গলী অফিসে কুড়িটাকা মাহিনার একটি কপি হোল্ডারের কাজ পান। সংবাদপত্রের সঙ্গে ইহাই তাঁহার প্রথম সংযোগ। তাহার পর কিভাবে তিনি শ্রেষ্ঠ সাংবাদিকের শ্রেণীতে উন্নীত হন এই পুস্তকে পাঠক তাহার পরিচয় পাইবেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের জীবনে অপূর্ব্ব ভগবদ্‌ভক্তি ও সেই সঙ্গে তেজস্বিতার সমন্বয় এতই সুস্পষ্ট যে তাহাতে আশ্চর্য্য বোধ হয়। সর্ব্বশ্রেণীর যেখানে যত মহাপুরুষ আছেন সকলের উপরই তাঁহার অসীম শ্রদ্ধা ও আত্মিক যোগ ছিল। প্রভু জগদ্বন্ধু ও বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী এই দুই মহাপুরুষই তাঁহার জীবনে জীবন্তরূপে প্রতিভাত হইয়াছেন। বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রেমধর্ম্ম, কিন্তু বিপ্লব-বাদ ও বৈষ্ণবতায় তিনি কোন প্রভেদ বোধ করেন নাই। বিপ্লবীরা দেশপ্রেমেই সর্ব্বস্বত্যাগীর খ্যাতি ছাড়িয়া অখ্যাতিই মাথায় লইয়াছে, কৃষ্ণপ্রেমে উন্মাদিনী ব্রজবালারাও কি আর্যপথ ছাড়িয়া কলঙ্কের পথেই পদক্ষেপ করেন নাই?

প্রকৃত সোনাকে কষ্টি-পাথরে কষিয়া নিতে হয়। প্রকৃত ভগবদ্ভক্তি ও প্রকৃত দেশাত্মিকাবোধেরও পরীক্ষা আছে। বঙ্কিমচন্দ্র যখন ট্রামে চাপা পড়েন, সেই সময় তিনি সেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

তিনি যখন রক্তাক্ত কলেবরে অর্ধ-অজ্ঞান অবস্থায় ফুটপাথে উঠিবার চেষ্টা করিতেছেন, তখন এক হিন্দুস্থানী ভুজাওয়ালী তাঁহার সেই অবস্থা দেখিয়া কাঁদিয়া উঠিয়াছিল এবং সেই অবস্থাতেই তিনি তাহাকে "রোয়ো মৎ মাই, সব কুচ্ কা মালিক ভগবান্জী" বলিয়া সান্ত্বনা দিয়াছিলেন। এই যে একজন মৃত্যু-পথযাত্রী আহতের অবস্থাতেও অপরের প্রতি সান্ত্বনাদান ইহা যে সম্ভব হইতে পারে অনেকেই হয়তো ধারণাও করিতে পারিবেন না, কিন্তু তাঁহার নিজের এ সম্বন্ধের উক্তিতে বোঝা যায় তিনি সে সময় এমন এক অনুভূতিতে বিভাবিত হইয়াছিলেন যে দেহের সম্বন্ধে, কোন চেতনা বা বেদনাবোধই ছিল না। কেবল সেই সময়ই নয়, হাসপাতালে যে দুই মাস জীবন-মৃত্যুর সন্ধিতে তাঁহাকে অবস্থান করিতে হইয়াছিল সেই সময়ে তাঁহার প্রসন্নতা যেন সমগ্র চিকিৎসালয়কেই আনন্দনিকেতন করিয়া রাখিয়াছিল। বহু চিকিৎসক এই ব্যাপার দেখিয়া মুগ্ধ ও বিস্মিত হইয়াছিলেন।

বঙ্কিম সেন কি অন্তর্য্যামী

শ্রীরাধারমন চৌধুরী, সম্পাদক, প্রবর্ত্তক

দিন কয়েক আগের কথা। হিন্দুস্থান ষ্টাণ্ডার্ড'-এর প্রসিদ্ধ সাংবাদিক ও সাহিত্যিক শ্রীমনীন্দ্র নারায়ণ রায় সঙ্ঘগুরুর 'জীবনবাদ' বুঝিবার জন্য তাঁর 'বেদান্ত দর্শন' বইখানি লইয়া গেলেন। মনোযোগের সঙ্গে প্রতিটি লাইন পড়িলেন, বিচার করিলেন। ক'দিন পরে আসিয়া মন্তব্য করিলেন, 'একটা আভাস পাইলাম, কিন্তু ঠিক ধরিতে পারিলাম না।' যেমন শাস্ত্রের গহন অরণ্য হইতে আত্মাকে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না, তেমনি সঙ্ঘগুরুর অর্দ্ধশত গ্রন্থ পড়িয়াও তাঁর সত্যকার স্বরূপটিকে আবিষ্কার করা চলে না। আত্মার আলোতেই আত্মাকে দেখা যায়, সূর্য্যের আলোই সূর্য্যকে প্রকাশ করে। শ্রদ্ধাভক্তির প্রদীপ জ্বালাইয়া আরতি করা চলে, কিন্তু স্বপ্রকাশ সত্তা নিজেই প্রকাশিত না হইলে বুদ্ধি বিচারে তাহাকে আবিষ্কার করা যায় না। সুতরাং নিরুপায় হইয়া শূন্য মনে কম্বলটি টানিয়া শুইয়া পড়িলাম।

গাঢ় ঘুমের ঘোরে স্বপ্ন দেখিলাম: একটা অন্তহীন মহাকাশ। বিশুদ্ধ চিদ্‌ভূমি হইতে যেন একটা অব্যক্ত আলোর বিন্দু কাঁপিতে কাঁপিতে ব্যক্ত হইয়া উঠিতেছে। স্পষ্ট হইতে স্পষ্টতর হইয়া বিন্দুটি ক্রমশঃ ব্যাপকরূপে বিস্তৃত হইতে লাগিল। সারা আকাশ জুড়িয়া একটা অপরিচ্ছিন্ন আলোর কম্পন। আলোময় আকাশ। আলো ঘনীভূত হইয়া চোখের সামনে একটা দিব্য-কান্তি সমূর্ত্তি ভাসিয়া উঠিল। পরিচিত মূর্ত্তি—ক্রুশবিদ্ধ ক্রাইষ্ট। অনিমেষে চাহিয়া আছি। কিন্তু নিমেষ পড়িতে না পড়িতেই মূর্ত্তি দ্রুত স্পন্দিত হইতে লাগিল। কিন্তু কোথায় ক্রাইষ্ট! আস্কন্ধ বিস্তৃত কেশ আর শ্মশ্রুশোভিত সঙ্ঘগুরুর সস্মিত বদনমণ্ডল। জোড়করে প্রণাম করিতে যাইব এমন সময় ভোর চারিটার উপাসনার ঘণ্টা বাজিল।

সুখস্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল। কিছুই বুঝিলাম না। রহস্য আরও জমাইয়া আসিল। খৃষ্ট আর সঙ্ঘগুরুর মধ্যে কি সম্পর্ক থাকিতে পারে?

প্রায় দু'হাজার বছর বিস্তৃত কালের ব্যবধান উভয়ের আবির্ভাবের মধ্যে। দু'জনেরই প্রকট হইবার মাসটি অবশ্য পৌষ মাস—একাদশ দিনের মাত্র তফাৎ। অপ্রকটের বারটিও এক—শুক্রবার। যীশুর প্রতি সঙ্ঘগুরুর অন্তহীন অনুরক্তি দেখিয়াছি। তাঁর কক্ষে শয্যার শিয়রেই ক্রুশবিদ্ধ যীশুর ছবি বরাবর সযত্নে রক্ষিত। প্রায়ই একদৃষ্টে তিনি খৃষ্টের দিকে চাহিয়া থাকিতেন। কতবার কথাপ্রসঙ্গে আক্ষেপ করিয়াছেন, 'খৃষ্টের মতই ভগবানের অবতরণের জন্য রক্তমোক্ষণ করিয়া যাইবেন।' কিন্তু এ সবই তো বহিরাশ্রয়ী চিন্তা—আন্তর ইঙ্গিতটি কি ?

সারাটি দিনই এই ভাবনায় অভিভূত রহিলাম। সন্ধ্যায় গেলাম পরম ভাগবত ভক্তি-ভাগীরথী শ্রীবঙ্কিম সেনের নিকট। সত্যই ভক্তির ভাগীরথী এই মানুষটি। তত্ত্ববিগ্রহও বটে। অব্যক্ত যে ভক্তের হৃদয়ে ব্যক্ত হয় তা তাঁর শ্রদ্ধা-সান্নিধ্যে সুস্পষ্ট অনুভূত হয়। শ্রীসেনের কক্ষে তাঁরই শিষ্যা জনৈকা মা ও মেয়ে মাত্র ছিলেন। সসম্ভ্রমে তাঁরা সরিয়া বসিলেন। আমি নীরবেই শয্যাপার্শ্বে উপবেশন করিলাম। তিনি কাত হইয়া বালিশে হেলান দিয়াছিলেন। উঠিয়া বসিলেন। বসিয়াই ভগবৎপ্রসঙ্গ সুরু করিলেন। আমার দিক থেকে কোন প্রশ্ন নাই। না আছে কোন জিজ্ঞাসা ও উত্তর। তাঁর অবিরাম বচন-নির্ঝরে নীরবেই অবগাহন করিলাম। অশ্রান্ত এই বাগ্-বৈভবের চিন্ময় প্রভাব অনুভাব্য, শ্রাব্য, কিন্তু প্রকাশের ভাষা নাই।

সোয়া ন'টা বাজে। দেওয়ালে টাঙ্গানো ঘড়ির দিকে চাহিলাম। শ্রীসেন বিরাম দিলেন। জ্ঞাতব্যের উত্তর আমার মিলিয়াছে। খৃষ্ট জীবনের উপর নূতন আলোকপাত। পরিতৃপ্ত হইয়াছি।

প্রসন্ন মনে প্রণাম করিয়া উঠিলাম।

সারাটি পথ শ্রীসেনের বক্তব্যের মর্ম্ম মনকে ভাবময় অভিভূতিতে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিল। থাকিয়াথাকিয়া তাঁর বাক্যের ঝঙ্কার অন্তরাকাশে শ্রুত হইল : অনুগ্রহ—আগ্রহ—বিগ্রহ। সাধুসঙ্গে অনুগ্রহ মিলে। আগ্রহ জন্মে অনুগ্রহে। আগ্রহের ঘনীভূতভাবে বিগ্রহ দর্শন। প্রত্যক্ষ চাই, অনুমান নয়। ঈশ্বর তুরীয় চৈতন্যস্বরূপ। তাঁকে মূর্ত্ত ও বিগ্রহান্বিত করে পাওয়া যায় সম্বন্ধের ছাঁচে—নরদেহে পুরুষোত্তমের বিদ্যমানতা বোধ করিয়া। প্রত্যক্ষ অনুভব পঞ্চেন্দ্রিয়ের ছন্দে-ছন্দে। ইন্দ্রিয় নাই তো অনুভূতি কোথায় ?

স্বপ্নে দেবদর্শন তো কল্পনার আবরণে। জাগ্রত-ইন্দ্রিয়ের ছন্দে দর্শনই তো প্রত্যক্ষ দর্শন। স্ব-প্রকাশের প্রকাশ-উদ্দীপনার কাছে সমর্পণ। আর কোন করণীয় নাই। এই প্রকাশ-ছন্দ বৈচিত্র্যের পর্য্যায়ক্রমেই দেবতাবাদ। এই নিয়ে ভারতে কত তর্কাতর্কি, অধিকারী অনধিকারীর কথা। এই সৃষ্টিতে ভগবানের সর্ব্বাতিশায়ী অস্তিত্ববোধ চাই—একবারে স্থূলে যেমনটি হইয়াছিল যীশুখৃষ্টের। খৃষ্টের রক্তদানের মধ্যে ছিল এই প্রত্যক্ষ অনুভব—একবারে স্ব-প্রকাশের কম্পনকে সোজা নামাইয়া আনা ক্ষিতিতত্ত্বে। খৃষ্ট আর ভগবান—মাঝখানে আর কিছু নাই। কোন দেবদেবী নয়। বস্তুতঃ খৃষ্ট আর খৃষ্টের রক্ত-মাংস ছিল স্থূলে ভগবানের অবতরণের চিন্ময়ী কম্পন। খৃষ্টজন্মের প্রায় দেড হাজার বছর পরে, বাংলায় শ্রীচৈতন্যে ভগবানের এই পরিপূর্ণ অনবচ্ছিন্ন অবতরণ ঘটে আরও রসাল, আরও মাধুর্য্যমণ্ডিত হইয়া। বাংলায় অব্যক্তের অভিব্যক্ত হইবার ক্রম ধারারই প্রবাহ চলিয়াছে এই সেদিনের অরবিন্দ-মতিলালের মাধ্যমেও।

আলো পাইলাম। সমাধানও মিলিল। একবার মনে হইল, ভক্তি-ভারতী অন্তর্য্যামী নাকি ?

স্বপ্রকাশের অভিব্যক্তি জডভাবাপন্ন ক্ষিতিতত্ত্বে। ভক্তি-ভারতীর এই একটি ইঙ্গিতেই সঙ্ঘগুরুর স্বরূপ আমার কাছে স্পষ্ট হইয়া উঠিল। বিজ্ঞানময়, মনোময়, প্রাণময়, শুধু নয়, অন্নময় কোষের চিন্ময় উজ্জীবনে এই মর্ত্ত্যেই ভাগবত জীবনের সম্ভাবনার হুঙ্কার সঙ্ঘগুরু দিয়াছিলেন। তাঁর চাওয়া ছিল মুক্তি-মোক্ষ নয়, লয়-সমাধিও নহে, পরন্তু জীবন—ভাগবত জীবন। সংসারের ত্রিতাপ-জ্বালা, মৃত্যুকে পরিহার করার কথা কখনও তাঁর মনে উদয় হয় নাই। সংগ্রামময় সংসার ছাড়িয়া তিনি অরণ্য-কন্দরে সাধন করিতে যান নাই, কাহাকেও যাইতে বলেন নাই। সম্বন্ধের জগতে যেখানে যাহা যেমনটি আছে সেখানে তাহা তেমনটি রাখিয়াই তিনি বিচিত্র রূপে-রসে ভগবানকে আস্বাদ করিতে চাহিয়াছেন ভাগবত হইয়া ও ভাগবত করিয়া। এই ভাগবত জীবন, চিন্ময় তনু সিদ্ধ করার জন্য তিনি বারবার এই মর-মর্ত্ত্যে জন্মগ্রহণের প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন।

তিনি কতবার বলিয়াছেন, সর্ব্বেন্দ্রিয় সর্ব্বভাবে কায়মনোবাক্যে সাক্ষাৎ সচ্চিদানন্দময় ভগবানে অনন্যাশ্রয়ই দিব্য-জীবনের পাদপীঠ। প্রাকৃত বস্তুকে

অপ্রাকৃত বস্তুত্বের প্রকট যেখানে সেখানে ভগবানেরই অবতরণ, ভগবানই সেখানে সাধক আবার শক্তিরূপে ক্রিয়াশীলা। প্রকট আচার্য্য-রূপের মধ্যেই স্বরূপের উপলব্ধি, গুরুতে প্রিয়ত্ববোধের গাঢ়তায় ভাগবত জীবনের আস্বাদ এই দেহে আর অনিরুদ্ধ চিত্তবৃত্তিতেই। শ্রীগুরুই সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ভগবৎ-মাধুর্য্যের উদ্দীপক। পথ আত্মসমর্পণ—করুণাঘন শ্রীগুরুর অনন্যশরণ।

শ্রীসেনের এই একটি আলোক ইশারা সঙ্ঘগুরুর বিচিত্র জীবন ও সাধনা যেন সুপরিস্ফুট করিয়া তুলিল। সেই আলোকেই যেন দেখিতে পাইলাম সঙ্ঘগুরুর স্বরূপসত্তা আর আবির্ভাব-তাৎপর্য্য। এই বিশ্ব-ভুবন-সৃষ্টির দুই প্রান্তের একদিকে রূপ আর একদিকে অরূপ, মাঝখানে রূপ-অরূপের মিলনকেন্দ্র "নরবপু তাঁহার স্বরূপ।" বুঝিলাম এই-ই সেই। ওঁ তৎ সৎ।*

* 'প্রবর্তক' পৌষ '৬৭ সংখ্যায় 'আলোকের আলোক ইশারা' হইতে উদ্ধৃত।

'ভক্তের ভগবান'

ভক্তমহিমা কীর্ত্তনে স্বয়ং ভগবান্ পর্য্যন্ত পঞ্চমুখ। ভক্তের মাহাত্ম্য বর্ণনা করিয়া শেষ করা যায় না। ভক্তের অন্তরঙ্গ অনুভূতির আস্বাদন পাওয়ার জন্য পূর্ণকাম স্বয়ং ভগবান্ পর্য্যন্ত ব্যাকুল-চঞ্চল। এই লোভ সংবরণের ক্ষমতা স্বয়ং ভগবানেরও নাই! ভক্ত-ঋণ স্বয়ং ভগবানও পরিশোধ করিতে অক্ষম। ভক্তসঙ্গ বা ভক্ত-কৃপা ব্যতীত পরমেশ্বরের কৃপা লাভ হয় না। অথবা ভগবান্ ভক্তের মধ্যে ধরা পড়িয়া গিয়াছেন। ভক্তের হৃদয় ভগবানের বৈঠকখানা। এইখানেই ভগবানকে পাওয়া সুলভ। নতুবা অব্যক্তের দর্শন অন্যত্র অসম্ভব। অক্রোধ পরমানন্দ ভূরিদাতা পরম দয়াল নিত্যানন্দের আশ্রয়েই শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপা লাভ করা যায়। ইহাই যথার্থ ক্রম। এই ক্রম উল্লঙ্ঘন করিয়া ভগবৎ কৃপা লাভ অসম্ভব। ভক্তকে অনাদর করিয়া আজ পর্য্যন্ত কেহই ভগবদনুকম্পার অধিকারী হইতে পারেন নাই।

পরম প্রেমাস্পদ ভক্তিভারতী শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্র সেনের সঙ্গলাভ করিয়া আমি ধন্য হইয়াছি। তিনি একজন তেজস্বী বৈষ্ণব—পরম ভক্ত। ভক্তের ভিতর দিয়া ভগবানের সংস্পর্শজনিত অনির্ব্বচনীয় আনন্দ লাভ করা যায়। তাঁহার শ্রীমুখে ভগবন্মাহাত্ম্য শ্রবণে নিজের অজ্ঞাতসারে চিত্ত ভগবদভিমুখী হইয়া যায়। এঁদের মত ভাগবত মহাজনের নিকটই বস্তুর যথার্থ নির্দ্দেশ পাওয়া যায়। 'ভক্তমালের ভক্তচরিত' গ্রন্থখানা পাঠ করিয়া 'নিবেদনে' তিনি যে সন্দেশ বিতরণ করিয়াছেন, তাহা অপূর্ব্ব আস্বাদনযুক্ত। যত পড়ি আনন্দ ততই বৰ্দ্ধিত হয়। মহাশয় ব্যক্তিদের সঙ্গলাভ অব্যর্থ। ভাগবত মহাজনের সঙ্গ ফলে বিমুখীচিত্ত ঈশ্বরের দিকে ধাবিত হয়। এই জাতীয় ভক্তসঙ্গ লাভ ক্রমশঃই বর্ত্তমানে দুর্ল্লভ হইয়া উঠিতেছে। জগৎ অসার, ব্যর্থ যদি ভগবৎ-ভক্ত-সঙ্গ লাভ করিতে না পারে। তবে ইহাও ঠিক, পরমেশ্বরের কৃপায় জগৎ কখনো ভক্ত-শূন্য হয় না। ভক্তের বিনাশ নাই,

ইহা স্বয়ং ভগবানেরই শ্রীমুখের উক্তি। একটু আগ্রহ থাকিলেই ভক্ত সঙ্গ লাভ করা যায়। সঙ্গ দুর্লভ বটে ; কিন্তু একেবারে দুষ্প্রাপ্যও নহে। জগৎকে বাঁচাইতে সক্ষম একমাত্র ধন্বন্তরী—ভক্ত !*

লহ প্রণাম

জয়তু বঙ্কিম চন্দ্র
হে বঙ্ক বিহারী
লোক মাঝে অলৌকিক
তোমারে নেহারি ॥
জয়ন্তি আজিকে তব
হে অজ
শুভক্ষণে ধরি শিরে
চরণ রজ ॥
ভোগ মাঝে সমাসীন
হে ত্যাগী
হে ধীর হে বীর
হে বৈরাগী ॥
ভক্তির ভাগীরথী
বহিছে চিতে
এসেছ তৃষিত জনে
তাহারে দিতে ॥

* শ্রীশ্রীস্বামী সত্যানন্দ সরস্বতী রচিত 'ভক্তমালের ভক্ত-চরিত' ১ম খণ্ড হইতে উদ্ধৃত।

পরিশিষ্ট

অমৃতের মহাবাণী
যেতেছ ঘোষিয়া
মৃত হ'ল সঞ্জীবিত
মরমে পশিয়া ॥
নিরাশ লভিল আশা
ভয়ার্ত্ত অভয়
হে গুরু! চরণে যারে
দিয়েছ আশ্রয় ॥
আজি পদে ভিক্ষা মোর
এ মহা দিনে
কর কৃপা, দেহ ভক্তি
অধমা হীনে ॥
উপচার নাহি কিছু
লহ পূজা মোর
ভক্তি প্রণতি প্রীতি
শুধু আঁখি লোর ॥

কৃপাকণা প্রার্থিনী শান্তিলতা দত্ত

He picked up the cut off part and laughed over it, in which he saw the hand of God."

প্রবর্ত্তক বলেন—"বঙ্কিমচন্দ্রের জীবনের অসাধারণত্ব আত্ম-গোপনতায়, সিদ্ধি অসঙ্গ নিরহঙ্কার সাধনায়, এবং মহিমা মুদ্রাদোষ-দুষ্ট ক্রুর প্রকাশ ভঙ্গিমায়।"
